https://www.path-2-happiness.com/bn

بنغالي

প্রকাশনায়
স্পেস চ্যানেল ফাউন্ডেশন

الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness

শান্তির সংলাপ

খালিদ আবুল ফুতুহ



অনুবাদ
আব্দুল্লাহ আল মামুন
বি,এ (অনার্স) (ফাস্ট ক্লাস থার্ড) আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়,
এম, এ (থিসিসসহ) (এক্সিলেন্ট) কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।

فضاء القنوات
SPACE CHANNELS

আল-ফুতুহ তথ্য কেন্দ্র

الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness
শান্তির সংলাপ
খালিদ আবুল ফুতুহ

প্রকাশনায়ঃ

স্পেস চ্যানেল ফাউন্ডেশন আল-ফুতুহ তথ্য কেন্দ্র

শান্তির সংলাপ

খালিদ আবুল ফুতুহ

অনুবাদ

আব্দুল্লাহ আল মামুন

বি,এ (অনার্স) (ফাস্ট ক্লাস থার্ড) আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এ (থিসিসসহ)
(এক্সিলেন্ট) কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।

প্রকাশনায় স্পেস চ্যানেল ফাউন্ডেশন



ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর বংশধর, সাহাবা ও অনুসারীদের উপর। পরকথা.........

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধ্যান-ধারনা ও মতবাদের জোয়ার চলছে, যা মানুষকে জীবন সম্পর্কে বড় বড় অনেকগুলো প্রশ্নের জবাবের প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। মানুষ অস্থিরতা হতে উত্তরণের পথ খুঁজছে। আর সে লক্ষ্যে সঠিক পথ প্রদর্শকের দিকে তারা তাকিয়ে আছে। এমনিভাবে,বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। এ হিসেবে মুসলমানদের উপরে তাদের ধর্মের প্রতি রয়েছে শরয়ী কর্তব্য এবং মানবজাতির প্রতি রয়েছে তাদের মানবিক দায়িত্ব। তাদের কর্তব্য হলো, অস্থিরতায় নিপতিত মানুষদের নিকট তাদের প্রচলিত পদ্ধতি ও ভাষায় আল্লাহ্‌র বানী পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূলগন এভাবেই তাদের জাতির নিকট আল্লাহ্‌র বানী পৌঁছিয়েছেন।

আর কুরআনুল কারীম সঠিক যুক্তিতর্ক ও জ্ঞান সহকারে সংলাপ ও বিতর্কের প্রতি উৎসাহিত করেছে। আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিতর্কে উত্তম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ " আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন,যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে,যারা সঠিক পথে আছে"। (সুরা নাহলঃ ১২৫)

আর এ ব্যাপারে বিশেষ করে আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রে

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না,কিন্তু উত্তম পন্থায়;তবে তাদের সাথে নয়,যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল,আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে,তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ"। (সুরা আনকাবুতঃ ৪৬)

সকল নবী ও রাসূলগন আল্লাহ তাআলার এ হুকুম যথাযথভাবে পালন করেছেন। যেমন নূহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "তারা বলল-হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি তর্ক করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন,যে সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন,যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন"। (সুরা হুদঃ ৩২)

কোরআন আমাদের সামনে কাফির-মুশরিকদের সাথে সংলাপ ও বিতর্কের অনেকগুলো দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। বরং কোন প্রকার বিকৃতি ছাড়াই তাদের কোরআন বিরোধী যুক্তিগুলো তুলে ধরে তার সন্তোষজনক উত্তরও দেয়া হয়েছে। এটা এ কারণেই যে,ইসলাম যেমনিভাবে ঈমানের পথে আহবান করে তেমনি ভাবে সাথে সাথে পরিবর্তন ও সংস্কারের পথে ও আহবান করে। আর সে জন্য চিন্তাধারার পরিবর্তন আবশ্যক। সন্তোষজনকভাবে বিশ্বাস সৃষ্টি ব্যতীত সে পরিবর্তন সম্ভব নয়; সংলাপ ও বিতর্ক যার অন্যতম বড় মাধ্যম।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীনী ভাই ডঃ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেম আমাকে একটি কিতাব প্রণয়নের জন্য গুরুত্ব সহকারে অনুরোধ করলেন যাতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়,যেগুলো নিয়ে অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে। আর সেটা যেন হয় সংলাপ আকারে। আবার যেন এগুলোকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করা হয়। আমি তখন এই বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং কার্যকর করার উপযোগী মনে করলাম।

শুরুতে এর গুরুত্ব বুঝতে পারলেও এর কাঠিন্যতার ব্যাপারে আমার ধারণা ছিলনা। এর কাঠিন্যতার কারণ হলো,এ কাজের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্তের প্রতি আমাকে খেয়াল রাখতে হয়েছে, যেমনঃ

- এ সংলাপের মাধ্যমে অন্যদের সাথে সাথে মুসলমানদের উপকৃত হওয়ার বিষয়টির ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে;যেন তারা তাদের চিন্তাধারার উন্নতি এবং ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিতর্কে সক্ষম হওয়ার জন্য ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞানকে সহজে শানিত ও সমৃদ্ধ করতে পারে।

- এমনিভাবে আমি বিষয়গুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু মাপকাঠি নির্ধারণ করেছি;যেমন,বিষয়গুলো যেন ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কিত হয় অথবা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভে বাঁধাদানকারী বিভিন্ন আরোপিত অভিযোগ সম্পর্কিত হয়।

- আমি বিষয়গুলোকে ২৯টি পর্বে বিভক্ত করেছি। প্রতিটি পর্বেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে তাতে ঐ বিষয়টা পূর্নাঙ্গরূপে তুলে ধরা হয়েছে যেন তা বোঝার জন্য পাঠক বা দর্শক অন্য পর্বের মুখাপেক্ষী না হয়।

- আর এ পর্বগুলোকে ধারাবাহিক ভিডিও আকারে প্রকাশ করা হবে বলে আমি সব পর্বকে সমান আকারে নির্ধারণ করেছি। বরং সব পর্বের শব্দ সংখ্যা ও সমান রেখেছি। আর প্রত্যেকটা পর্বের আকার এমন করা হয়েছে যাতে এর মাঝে একটি বিষয়কে মোটামুটি সামগ্রিক আকারে উপস্থাপন করা যায়। তাই উক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়কে শামিল করা কঠিন হয়ে পড়ে;তখন আমি তার মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণগুলোকে নির্বাচন করি।

- আর আমি এগুলোকে বর্ণনামূলক নিবন্ধের মত না লিখে সংলাপ আকারে বর্ণনা করেছি;যেন বিষয়গুলো শুষ্ক,কঠিন গবেষণাধর্মী হওয়া সত্বেও এতে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার ছোঁয়া থাকে। তবে সে ছোঁয়া কিন্তু আবার গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটকের পর্যায়ে পৌঁছেনি।

আমি চেষ্টা করেছি যেন সংলাপের প্রমাণাদি এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো সম্বোধিত শ্রেণীর জ্ঞান ও সংস্কৃতির উপযোগী হয় এবং বক্তব্য যেন তাদের স্তর অনুযায়ী হয়।

তবে বেশী কঠিন ছিল,অপর অমুসলিম ব্যক্তির চরিত্র রূপায়ন করা এবং তার বক্তব্য ও যুক্তি তার জ্ঞানুপযোগী করে পেশ করা। আর এ কাঠিন্যের কারণ হলো,আমি উক্ত চরিত্রের জীবনাচরণের সাথে সরাসরি পরিচিত নই।

অন্যদিকে, এ সংলাপগুলো দাওয়াতী উদ্দেশ্যে হওয়ার কারণে সংলাপ শৈলীতে এর প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য।

আমি উপরোক্ত মাপকাঠিগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখার চেষ্টা করেছি, তবে আমি বলবনা যে, আমি সর্বক্ষেত্রে তা ঠিক রাখতে পেরেছি। অতএব, ব্যতিক্রম পাওয়া গেলে সে ত্রূটির জন্য আমি পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রণিধানযোগ্য যে,এ সংলাপগুলো ইসলামের পূর্নাঙ্গ রূপরেখার জন্য এবং শত্রুদের সকল সংশয় অপনোদনের নিমিত্তে যথেষ্ট নয়। তবে আমি মনে করি,এগুলো অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধাসমূহ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট,যদি এর সাথে অন্যসব বাঁধা অপসারিত হয়ে থাকে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে,প্রায় বারোটি সংলাপ লিখার পরে আমি এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারি যে,উস্তাদ তাওফিক রেফায়ী'র 'সিদ্ধান্ত তোমার' শিরোনামে এ ধরনের একটি বই রয়েছে। আমি যে লিখা শুরু করেছি তার সাথে ঐ বই এর তুলনা করার জন্য আমার আশে পাশের লাইব্রেরীগুলোতে সে বই খুঁজে দেখি তার কপি শেষ হয়ে গেছে, আর অনেক বছর যাবত তার পুনঃমুদ্রণও হয়নি। এমনকি ইন্টারনেটে খুঁজেও তা পাইনি। তবে একটা ব্লগসাইটে তার পরিচিতি পেয়েছি। এর মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি যে,কিছু বিষয়ে আমাদের দুজনের লিখার মিল থাকলেও আমার লিখায় এমন কিছু বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে,যা আমার জানামতে তার লিখায় শামিল হয়নি; যদিও দুটি লিখার চিন্তাধারা অনেকটা কাছাকাছি। অন্যদিকে,তার লিখাটা বেশী বৈশিষ্টমন্ডিত হওয়ার কারণ হলো,লিখাটি উস্তাদ তাওফিক ও তার স্ত্রীর সাথে পাশ্চাত্যের কিছু লোকের বাস্তব সংলাপের ফসল। পরবর্তীতে ডঃ আব্দুল্লাহর সাথে পরামর্শক্রমে আমি আমার শুরু করা সংলাপগুলোর লিখা পূর্ণ করার দৃঢ় ইচ্ছা করি। এভাবেই ছিল পুরো ব্যাপারটি।

আমি আমার এ সংলাপগুলোতে বেশকিছু উৎস ও ইন্টারনেটের অনেকগুলো ওয়েব পেইজের সহযোগিতা নিয়েছি। সেগুলো হতে আমি কিছু উদ্ধৃতি অংশ বিশেষ এনেছি,আবার কিছু কিঞ্চিত পরিবর্তন করে পেশ করেছি। তবে আমি পাদটিকা উল্লেখ করিনি,কারণ তা সংলাপ শৈলীর সাথে খাপ খায়না। যেহেতু,পাদটীকা পাঠকের মনযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমি এর পরিবর্তে বই এর শেষে বিস্তারিতভাবে রেফারেন্স ও তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছি। তবে ইন্টারনেটের ওয়েব লিঙ্ক উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে বলব...... এ সংলাপগুলোতে তিনটি চরিত্র এসেছে। এর মধ্যে দুটি চরিত্র হলো মূল। সংলাপের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তারা ছিল। তাদের একজন হলোঃ বৃটেন প্রবাসী মুসলিম লেখক ও সাংবাদিক রাশেদ। আর অন্যজন হলোঃ শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ইংরেজ নাগরিক মাইকেল। তারা দুজন একটা সামাজিক পেইজে সংলাপে অংশ নিতে গিয়ে পরস্পর পরিচিত হয়। অতঃপর তারা মুখোমুখি আলোচনার জন্য লন্ডনের একটি কফিশপে মিলিত হওয়ার জন্য পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে তাদের দুজনের প্যারিস ভ্রমণকালে তাদের সাথে যুক্ত হয়,জার্মানিতে অধ্যয়নরত প্রকৌশল বিভাগের ছাত্র, ভারতীয় নাগরিক রাজীব।

আসুন,এখন রাশেদ ও মাইকেলের প্রথম সংলাপটা দেখি। আশা করছি,প্রতিটা সংলাপেই আপনারা নতুন আমেজ খুঁজে পাবেন।

খালিদ আবুল ফুতুহ

khaled@alfotoh.com

কফিহাউসের আড্ডা



কফিহাউসের আড্ডা

রাশেদ তার বন্ধু মাইকেলের সাথে পুর্বনির্ধারিত সময়মত কফিহাউসে মিলিত হল, বসতে বসতে মাইকেল রাশেদকে বলতেশুরু করলঃ

আজ রাতে আমি তোমাকে একটি বিষয়ে সম্পর্কে বলব, আমার ধারণা তুমি আমার সাথে একমত হবে।

রাশেদঃ বন্ধু, একটু সবুর কর, আগে তোমার সম্মানে পানীয় অর্ডার দেই।

মাইকেলঃ তাড়াহুড়ার জন্য দুঃখিত, তুমি ঠিক বলেছ।

মাইকেল ওয়েটারকে ডাকল। ওয়েটার তাদের দিকে এগিয়ে এসে রাশেদকে কি নিবে বলে জিজ্ঞেস করল।

রাশেদঃ চা

ওয়েটার (আশ্চর্যন্বিত হয়ে): শুধু চা?!

রাশেদঃ লেবু দিয়ে চা।

ওয়েটার (আরো আশ্চর্য হয়ে): লেবু চা?!!

মাইকেল (হেঁসে হেঁসে): হ্যাঁ, উনি মুসলিম, মদ পান করেননা। বন্ধুর সাথে মিল রেখে আমিও লেবু চা খাব।

ওয়েটার তাদের অর্ডার আনতে চলে গেল। রাশেদ তোতলামো গলায় বললঃ মদ না খাওয়ায় আশ্চর্যের কি আছে?!

মাইকেলঃবন্ধু! আমাদের দেশে মদ খাওয়া পানি পানের মতই, এখানে অনেক ধরনের ও স্বাদের মদ আছে। তুমি অর্ডারে মদ না চাওয়ায় ওয়েটার আশ্চর্য হয়েছে। বাচ্চারা ছাড় কেউ এমন করেনা, স্যরি, তুমি মনে কিছু করনা।

রাশেদঃ কিন্তু এটা আশ্চর্যের বিষয়!

মাইকেলঃ এতে আশ্চর্যের কি দেখলে? এটা আমাদের এখানে নতুন কিছুনা, এটা শুধু আমাদের দেশেই না, বরং সমগ্র পশ্চিমা দেশে একইরকম।

রাশেদঃ এটাই বিস্ময়ের কারণ...।

মাইকেলঃ কিভাবে?!

রাশেদঃ কেননা তোমরা অধিকাংশ লোকই খৃস্টান ধর্মের অনুসারী, তোমরা পবিত্র কিতাবে বিশ্বাস কর, অথচ তাওরাতে আছে, মদ পানে অনেক ক্ষতি রয়েছে। মদ পানের ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছেঃ "তোমরা পেটুক ও মদ্যপ ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করোনা, (হিতোপদেশ ২৩/২০)।

মদ পানে উন্মাদ হতে নিষেধ করেছেন, প্রভু বলেনঃ

" ঐ সব লোকদের জন্য অভিশাপ যারা খুব ভোরে জেগে মদের পানে ছুটেএবং অন্ধকারে মদের জন্য আগুন ধরায়" । (যিশাইর ভাববাদী বাণীঃ ৫/১১)

ইঞ্জিলে বর্ণিত, (লেবীয় পুস্তক) (১০/৯)তে এসেছেঃ "প্রভু হারুন আঃ কে বললঃ "মদ ও নেশা জাতীয় কিছু তুমি ও তোমার সন্তানেরা পান করবেনা, যদি কর তবে তোমরা মারা যাবে। এটা চিরন্তন ফরজ তোমাদের পরবর্তী সম্প্রদায়ের জন্য"।

'বুক অব জাজ' (বিচারককর্তৃগণের বিবরণী ১৩:১৪) এ এসেছেঃ "প্রভুর দূত মানোহকে ডেকে বললেনঃ "যে সব জিনিস দ্রাক্ষালতায় জন্মায়, সে সব খেয়োনা এবং কোন মদ বা নেশাকর পানীয় পান করোনা"।

আরো অনেক বাণীতে মদ পানকারীর নিন্দা করা হয়েছে, নেশাকারীদের সাথে মিশতে নিষেধ করা হয়েছে, এমনকি তাদের দিকে তাকাতেও নিন্দা করা হয়েছে।

মাইকেলঃ থাম হে রাশেদ, তুমি মনে করোনা যে শুধু তুমিই পবিত্র গ্রন্থ জান, আমাদের অনেক ধর্মজাযকেরা মদ খাওয়াকে বৈধ মনে করেন। এমনকি কেউ কেউ তাওরাত থেকে উল্লেখ করেন যে, কিছু আম্বিয়াকিরামগণ মদ খেয়েছেন এমনকি নেশাগ্রস্থও হয়েছেন। আমি ধর্মজাযকদের কারো কারো বলতে শুনেছি যে, মাতাল হওয়া শুধু হারাম,। ইঞ্জিলে আছেঃ ঈসা আঃ মদ খেয়েছেন।

"লূকলিখিত সুসমাচার" (৭/৩৩-৩৪) এ আছেঃ "যেহেতু বাপ্তিস্মদাতা যোহন (ইউহান্না) এসে, রুটি খাননি এবং মদ পান করেননি , তাই তোমরা বল ওকে ভূতে বা শয়তানে পেয়েছে। আর মানব পুত্র এসে খেলেন এবং মদ পান করলেন,তখন তোমরা বল, দেখ! ও পেটুক, মদ্যপায়ী..."।

রাশেদঃ হে বন্ধু! তুমি যা উল্লেখ করলে তা আমাদেরকে এমন দুটি মারাত্মক সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেয় ,পশ্চিমা মানুষ ও সমাজের উপর যার ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছেঃ

প্রথমতঃ আমি দুঃখিত যে বলতে বাধ্য হচ্ছিঃ এ কথা প্রমানিত যে, তোমাদের বর্তমান পবিত্র গ্রন্থে নিজেদের বানানো অনেক বিষয় সম্পৃক্ত হয়েছে এবং শয়তানী হাতে বিভিন্ন বিকৃতি ঘটেছে, ফলে এতে অনেক ধর্মবিশ্বাসই পরস্পর বিরোধপূর্ণ। যেমনঃ মদ হারাম ও হালাল হওয়া, ঈসা আঃ কে ইহা পানে সম্পৃক্ত করা আবার ইহা থেকে তিনি মুক্ত হওয়া। "লূকলিখিত সুসমাচারে" (গোস্পেল অব লুক) (১:১৫) বর্ণিত আছেঃ জিব্রাইলের (আঃ) জবানে ঈসা (আঃ) এর গুনাবলী এভাবে বলা হয়েছেঃ "তিনি প্রভুর কাছে অনেক মহান ব্যক্তি হবেন, মদ ও নেশাজাতীয় কিছু পান করবেননা"... এখানে বৈপরিত্য স্পষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ তোমাদের ধর্মজাযকেরা পবিত্র কিতাবকে কুক্ষিগত করেছেন, কেউ কেউ দাবি করেনঃ তিনি (ঈসা আঃ) স্বয়ং খোদা হয়ে এগুলো বলেছেন, আবার কেউ কেউ বলেনঃ তিনি হালাল হারাম করার ক্ষমতা রাখেন। আর তোমরা এদের অনুসরণ করছ।

মাইকেলঃ তুমি যথার্থই বলেছ, এজন্য আমি তোমাকে খোলাখুলি বলছিঃ আমাদের অনেকেই পবিত্র কিতাবের উপর ঈমান রাখেনা, তাঁরা ধর্মজাযকদেরকেও মান্য করেনা। আমাদের সমাজে রেনেসাঁর যুগ হতে বড় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এজন্য কার্যতঃ আমাদের বিশ্বাস শুধুমাত্র বিবেক ও পার্থিব বিজ্ঞানের উপর। অতএব, এসো পবিত্র গন্থ ও দ্বীনের আলোচনা বাদ দিয়ে আমরা বিবেক ও বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলি।

রাশেদঃ তবে প্রথমে আমার কথা শুনঃধর্মের সাথে তোমাদের এ বিরোধ শুরু হয়েছে তখনই যখন তোমরা গির্জার দ্বারা বিভিন্নভাবে অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়েছ ও গির্জা বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেছে। বিশেষ করে মধ্যযুগে। আর দুঃখজনক ব্যাপার হলো, তোমরা গির্জাকেই পূর্ন ধর্ম ভেবেছিলে। আর মনে করেছিলে, ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধপূর্ণ এবং ধর্মের স্থান হলো শুধু উপাসনালয়ে। অন্যদিকে, ইসলামে আমরা এ সমস্যার সম্মুখিন হইনা, বরং আমাদের ধর্ম বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। আর আমাদের উলামাদের কাছে গোপন কোন ধর্মীয় বিষয়কুক্ষিগত নাই।

যাই হোক, এবার তুমি যেভাবে বললে তুষ্ট হবে আমি তোমাকে সেভাবেই বলছি, উপরন্ত এগুলো আমাদের ধর্মের বিরোধী নয়, আমি তা তোমাকে প্রমাণ করে দিব।

মাইকেলঃ ঠিক আছে, বল।

রাশেদঃ তুমি বলেছ, তুমি এখন শুধুমাত্র বিবেক ও জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস কর; আমি শুরুতে তোমাকে জিজ্ঞেস করিঃ বিবেকের যখন এত গুরুত্ব, তখন মদ কি এ বিবেক বা জ্ঞানকে সংরক্ষণ করে নাকি দূর করে দেয়?

মাইকেলঃ এটা একটা ফাঁদ, এটা কোন প্রশ্ন নয়।

রাশেদঃ আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তাকে সব সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করেছেন। তাকে বিবেক দান করেছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানসপন্ন নয় তার উপর ইসলামী শরিয়তের বিধিবিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ তায়া'লা এ মহা নেয়ামতকে সব ধরণের অনিষ্টতা থেকে হিফাজত করতে আদেশ দিয়েছেন। বরং এর হিফাজত করা ইসলামের পাঁচটি জরুরী জিনিসের অন্তর্ভূক্ত। এজন্যই ইসলাম মদ, নেশা বা নেশা জাতীয় যা কিছু বিবেককে আচ্ছন্ন করে দেয় এমন সব কিছু পান করা ও এসবের লেনদেন করাকে হারাম করেছে।

মাইকেলঃ তুমি যে পাঁচটি জরুরী বিষয়ের সম্পর্কে উল্লেখ করেছ তা কি?

রাশেদঃ এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা মূল বিষয় থেকে দূরে চলে যাব। মোটকথা, এগুলো হলোঃ দ্বীন, জীবন, জ্ঞান, সম্মান ও সম্পদ।

মাইকেলঃ চমৎকার, তোমার কথা পূর্ণ কর।

রাশেদঃ এটা সবাই জানে যে, অ্যালকোহল (মদের মধ্যে যার প্রাধান্য থাকে)পেট ও অন্ত্রনালীর মধ্যে দ্রুত শোষিত হয়ে রক্তের মাঝে দ্রুত পৌঁছে যায়। অতঃপর সহজেই শরীরের সমস্ত গঠনতন্ত্রকে বিগড়ে দেয় ও মূল স্নায়ুতন্ত্রের কোষগুলোকে বিকল করে দেয়।

অ্যালকোহল যদি সামান্য পরিমান(প্রায় ০.০৩%) ও হয় তবুও নিউরোন কোষে প্রভাব ফেলে। ফলে স্নায়বিক প্রবাহকে ধীরগতি করে দেয়। যার ফলে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। এজন্যই পবিত্র কোরআন মদকে পরিপূর্ণভাবে হারাম করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ (হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও)। (সুরা মায়েদাঃ ৯০)

মাইকেলঃ কিন্তু আমরা দেখি মদে কিছু উপকারও রয়েছে, যেমনঃ আরোগ্য লাভের অনুভূতি, উষ্ণ অনুভব, বিশেষ করে আমাদের ঠান্ডার দেশে।

রাশেদঃ মদের যে কিছু উপকার আছে তা কোরআন অস্বীকার করেনি, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ (তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও,এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়)। (সুরা আল বাকারাঃ ২১৯)। কেননা এর ক্ষতির দিক উপকারের চেয়ে অনেক বেশি, এজন্যই কোরআন এটাকে হারাম করেছে। এবার আস, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে, যা তোমরা বিশ্বাস করঃ

মাদক সেবনে একদিকে যেমন রয়েছেঃ মানবাচরনের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব, মানসিক ও সামাজিক নানাবিধ সমস্যা,মাতলামির কারনে সঙ্ঘটিত বিভিন্ন মারাত্মক অপরাধ,আর্থিক ক্ষতি এবং অন্যকে কষ্ট দেয়ার মত মারাত্মক কুফলসমূহ; তেমনভাবে বিজ্ঞান প্রমান করে যে, মাদকাসক্তি নিন্মোক্ত শারীরিক ক্ষতিগুলো করে থাকেঃ

১- পুরো শরীরের গ্রন্থীতে প্রভাব ফেলে দেহে এব হৃদয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে।

২- জননতন্ত্রে রক্ত জমাট করে দেয়।।

৩- পাকস্থলী এবং গ্রহণীতে সংক্রমন এবং পরিপাকযন্ত্রে আলচার সৃষ্টি করে।

৪- মুখ, গলদেশ, পাকস্থলী, পাকস্থলী অন্ত্র, স্নায়ু এবং অন্তঃস্রাবী গ্রন্থীতে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটায়।

৫- লিভারে সংক্রমন ও ছিন্নতা সৃষ্টি করে লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধির সৃষ্টি করে।

৬- এছাড়া মদ পানে শ্বাসতন্ত্রের অনেক সমস্যা হয়, যা এখানে আলোচনা করে শেষ করা যাবেনা।

আর মদের কারনে যে উষ্ণতার কথা তোমরা বল তা ত্বকের মধ্যে মাদকীয় রক্তের প্রভাবেহয়। অর্থাৎ মদ রক্তধমনীতে প্রশস্ততা সৃষ্টি করে ফলে সমস্ত দেহ হতে উষ্ণ রক্ত ত্বকের নিচে চলে আসে। তখন মদ্যপায়ী মিথ্যা উষ্ণতা অনুভব করে, তাঁর ত্বক লালবর্ন ধারন করে।এতে দেহের সকল উষ্ণ রক্ত ত্বকের নিচে চলে আসার কারনে শরীর তা আভ্যন্তরীন উষ্ণতা হারায়; যা জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

মদ পান ছাড়াও অনেক পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমে শরীর উষ্ণ করা যায়। আর এটা উল্লেখ্য যে, শীত প্রধান দেশে বসবাসরত মুসলমানেরা মদ পান করে শরীর উষ্ণ করেনা।

মাইকেলঃ কিন্তু দেখ হে বন্ধু, তোমার উল্লেখিত এসব ক্ষতি হয় মাতলামির পর্যায়ে পৌঁছলে। এজন্য আমি মনে করি সামান্য একটু পান করলে কোন সমস্যা নেই।

রাশেদঃ সমস্যা হল, মদ পানকারী প্রথমে সামান্য একটুই পান করে, অতঃপর সে চাঙ্গামেজাজ ও উষ্ণতা অনুভব করে আরো পান করতে চায়। এভাবে শরীরে যতই অ্যালকোহলের মাত্রা বাড়ে, ততই এর চাহিদা আরো বাড়তে থাকে... এমনি ভাবে চলতে থাকে।

শোন, আমি তোমাকে বলছিঃঅ্যালকোহল জাতীয় বস্তুর নেশার ক্ষতি সম্পর্কে নিউজিল্যান্ডের একটা মেডিকেল গবেষনার সারাংশ হলোঃ অ্যালকোহল যত কম হোক না কেন বা মাঝারি মাপের হোক- এর ক্ষতিকর দিক যেকোন উপায়ে এর উপকারের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ এর বিপরীতে পশ্চাত্যের লোকেরা দাবি করে যে , প্রতিদিন এক গ্লাস মদপান হৃদরোগ হতে রক্ষা করতে পারে। নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মহামারী বিজ্ঞানের প্রফেসর ডক্টর রড জ্যাকসন “দি লান্সেট” ম্যাগাজিনে প্রবন্ধে লিখেনঃ “সামান্য বা মাঝারিধরনের মদপানের মাধ্যমে হৃদরোগ হতে বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন এবং তার তুলনায় এর ক্ষতির পরিমান অনেক বেশী।

এখানে হাদিসের বৈজ্ঞানিক বিষ্ময় লক্ষ্য করা যায়। রাসুল সাঃ

বলেছেনঃ “সব ধরনের নেশা হারাম, যা নেশা সৃষ্টি করে তা সামান্য বা সবই হারাম”।

মাইকেলঃ উফফ্, আমাদের সংলাপ শুধুই উষ্ণইহয়নি, বরং অত্যুষ্ণ হয়েছে।মনে হচ্ছে, এখন সংলাপ শেষে এক গ্লাস ঠান্ডা লেবুর জুস পান করা প্রয়োজন।

রাশেদ(হেসে): চা ছাড়া লেবু?! কিন্তু তুমি এখনো সে বিষয়টির অবতারনা করনি যে বিষয়ে আমি তোমার সাথে একমত হব বলে তুমি মনে করছ।

মাইকেলঃ তাহলে এটাই আমাদের পরবর্তী সাক্ষাতের বিষয়বস্তু হবে।

রাশেদঃ ইনশাআল্লাহ

একজন পুরুষের জন্য একজন স্ত্রী কি যথেষ্ট?



একজন পুরুষের জন্য একজন স্ত্রী কি যথেষ্ট?

রাশেদ তাদের পূর্বনির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে মাইকেলকে সেখানে আগে থেকেই টেবিলে বসা পেল। দেখল, সে ইতোমধ্যে তার জন্য পানীয় নিয়ে নিয়েছে। রাশেদ তাকে অভিবাদন জানিয়ে স্বস্থানে বসল।

মাইকেলঃ আমি তোমার পছন্দের পানীয় লেবু-চানিয়েছি.. এভাবেই আমি অনুমান করলাম যে তুমি তোমার পছন্দের পানীয়ই সব সময় পান কর।

রাশেদঃ ভালো ধারনা। যদিও আমি এ পানীয় পছন্দ করি। তবে মাঝে মাঝে রুচির পরিবর্তন ও করি। আমি মনে করি এটা মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস।

মাইকেলঃ আমিও তোমার সাথে একমত। আস,এ বিষয় বাদ দিয়ে আমরা নতুন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। দুঃখিত!! তোমার জন্য কি অন্য কোন পানীয়ের অর্ডার দিব?

রাশেদঃ না, না, ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে আলোচনার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে আছ।

মাইকেলঃ আসলে ব্যাপারটা এরকম নয়; যাতে আমাদের সময়টা অন্য আলোচনায় ব্যয় না হয়ে যায় যেভাবে সেদিন হয়েছিল।

রাশেদঃ তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক।

মাইকেলঃ বিগত সাক্ষাতে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমার ধারনা,তুমি সে বিষয়ে আমার সাথে একমত হবে। যদিও আমি জানি যে,তোমার সমাজে এর বিপরীতমুখী ধারণা প্রচলিত আছে।

রাশেদঃ খুব সুন্দর। আমি মতবিরোধ পছন্দ করিনা। তোমার সাথে আমার আলোচনা গুলো দুজনের যৌথ তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। কমপক্ষে আমরা যেন সঠিকটা জানতে পারি। তাহলে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাও?

মাইকেলঃ সংক্ষেপে বিষয়টি হলো, আমি মনে করি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উভয়দিক থেকেই একক হওয়া উচিত। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আমার দৃষ্টিতে,ইসলাম যে একাধিক বিয়ের অনুমতি দিয়েছে তা নারীর প্রতি একধরনের জুলুম। তুমি কি আমার সাথে এ বিষয়ে একমত?

রাশেদঃ তুমি কোন নারীর কথা বলছ?

মাইকেলঃ (আশ্চর্য হয়ে) নারী! স্ত্রী... এ সম্পর্কের ক্ষেত্রেঅন্য কোন নারী আছে নাকি?

রাশেদঃ ইতিপূর্বে আমরা একমত হয়েছিলাম যে, সঠিক গবেষণা করতে হলে কোন বিষয়ের সব দিকগুলোই আলোচনায় আসতে হয়, সব দিক বিবেচনা করে সেটা দেখতে হয়।

মাইকেলঃ উত্তম কথা, তবে আমাদের এ বিষয়ে সেটা কিভাবে?

রাশেদঃ সেটা হলো, যখন আমরা নারীর স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করব তখন পূর্ন নারী জাতি তথা সকল নারীদের কথা বিবেচনা করব। বরং পুরা সমাজের কথা এবং পুরুষদের প্রয়োজনের কথাও বিবেচনা করব। পুরুষ ও নারীর পার্থক্যগূলোও বিবেচনায় থাকতে হবে।

মাইকেল কথার মাঝে)ঃ হাঁ, এখানেই আমরা নারীর প্রতি জুলুমের মূল উৎসে পোঁছে গেছি। আমি বলতে চাই নারী পুরুষের মাঝে এ পার্থক্য তোমাদের সমাজে বিরাজমান। এ পার্থক্যগুলো প্রাচ্য সমাজের পুরুষগন নারীদেরকে ব্যবহার ও ভোগের জন্য করেছিল। এটা কি ধরনের পার্থক্য? কেন নারীরা পুরুষদের মত একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবেনা? এটা কি এ সমাজের পুরুষদের যৌনলালসার প্রমাণ নয়?

রাশেদঃ হে বন্ধু একটু থাম, তুমি আমাকে এমনসব প্রশ্নবানে জর্জরিত করছ যে, এককথায় এগুলোর উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। আমরা এর সবগুলোই একে একে আলোচনা করব।এখন আমাকে একটা একটা করে বিশ্লেষন করার সুযোগ দাও। যে বিষয়টি তোমার ক্রোধের উদ্রেক করেছে প্রথমে তা দিয়েই শুরু করতে চাই। তুমি কি আমার সাথে একমত নয় যে, নারী পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য রয়েছে?

মাইকেলঃ কিসের পার্থক্য ?

রাশেদঃ প্রথমতঃ নারী ও পুরুষের শারীরিক গঠনের দিক থেকে জৈবিক পার্থক্য।

মাইকেলঃ হ্যাঁ, জৈবিক পার্থক্য তো আছে। তবে আমাদের আলোচনার সাথে এর সম্পর্ক কি?

রাশেদঃ আমি তোমাকে ধর্মের দিক বিবেচনায় বলবনা; কেননা ধর্মে যা বলে তাতো কোন সন্দেহ সংশয় ছাড়াই মেনে নেয়া জরুরি। তাই আমি তোমাকে জ্ঞান- বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলব, যা তুমি ইতিপূর্বে বলেছ যে তুমি এসব বিশ্বাস কর। শুন হে দোস্ত.....

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, ভালবাসার পরিমান (রসায়ন) নারীদের থেকে পুরুষেরা আলাদা। এ কারনে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ কথায় উপনীত হয়েছে যে, নারী পুরুষের ভালবাসার অনুভূতির অনেক পার্থক্য রয়েছে। ফলে বিজ্ঞানীগন আশ্চর্যজনক ফলাফলে উপনীত হয়েছেন যে, পুরুষের জিনসমূহ একাধিক ভালবাসার দিকে ঝুঁকে, পক্ষান্তরে নারীর জিনসমূহ স্থায়ী ও একটিমাত্র ভালবাসার দিকে ঝুঁকে থাকে। ফলাফলে আধুনিক বিজ্ঞান একথা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, একজন পুরুষ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য ছাড়াই একাধিক নারীকে ভালবাসতে পারে। সি,এন, এন এর ওয়েবসাইটে মার্কিন ইউটা ভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক লিজা ডায়মন্ড

বলেছেনঃ জীব বিজ্ঞানে অনেক দলিল প্রমান রয়েছে যে, যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষদের একাধিকের প্রতি যে চাহিদা, তা তাদের শারীরিক গঠনগত চাহিদার দাবি। বৃটেনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক ২০০৭ সালে তাদের এক গবেষণায়

বলেছেনঃ নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদ। তাদের অধিক মনোযোগ তাদের শরীর ও সন্তানের দিকে হয়ে থাকে। এটা তাদের এয়ালোষ্টোযেন হরমোনের কারনে হয়ে থাকে যা তাদেরকে বাচ্চা লালন-পালনের সাথে বেশি সম্পৃক্ত করে।

আরেকটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুরুষের মস্তিষ্ক নারীর মস্তিষ্কের প্রায় দ্বিগুন বড়। সম্ভবত পুরুষ এবং মহিলার মস্তিষ্কের মধ্যে বৃহত্তম পার্থক্য হল যে পুরুষদের কামেচ্ছা শক্তি নারীদের চেয়ে আড়াইভাগ বেশি।

সুতরাং হে বন্ধু তুমি কি মনে কর যে নারী পুরুষের এসব শারীরিক পার্থক্য বাস্তবে কোন প্রভাব ফেলেনা!?

মাইকেলঃ যদি এসব তথ্য সত্য হয় তবে অবশ্যই এতে প্রভাব ফেলবে।

রাশেদঃ অতএব বোঝা গেল, তুমি যেটাকে পুরুষদের যৌনলালসা বা একাধিক নারীর সাথে সম্পর্ক বলছ, তার সাথে ইসলাম বা প্রাচ্য সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আশা করছি, তুমি সরলপ্রাণে এর স্পষ্ট উত্তর দিবে। তোমার এমন কতজন বন্ধু বা পরিচিতজন আছে, একাধিক নারীর সাথে যাদের সম্পর্ক নেই? আমি তোমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলছিনা।

মাইকেলঃ এমনকি যদি তুমি আমার কথাও জিজ্ঞেস করতে; এটা আমাদের সমাজে ব্যাপক ও সাধারন প্রচলিত ব্যাপার... তবে এটা তো আর বিয়ে নয়।

রাশেদঃ তাহলে আমাদের সমাজে যা আছে তা তোমাদের সমাজেও আছে, তবে একটা বড় পার্থক্য আছে যা আমি এখন উল্লেখ করব।

এছাড়াও আমি আরো যোগ করব যে, ইসলাম একাধিক বিবাহের প্রচলন করেনি। প্রাচীন অনেক সভ্যতায় একাধিক বিবাহের কথা প্রসিদ্ধ আছে। তবে তাদের কাছে আসমানী ধর্মগুলোর মতো একাধিক বিবাহের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা ছিলনা। মধ্যযুগ পর্যন্ত ইহুদি ধর্মে বহুবিবাহ বৈধ ছিল, পরে পাদ্রী “গারশুম এশকেনাজি” (৯৬০-১০৪০) এ আইন বাতিল করেন। আর খৃষ্টানদের চার্যগুলো সপ্তদশ শতাব্দিতে বহুবিবাহ আইন নিষেধ করেন। তবে এখনও কোন কোন চার্যের নিকট এটি বৈধ, যেমনঃ মরমান্স সম্প্রদায় । তাদের কাছে বহুবিবাহ এখনও বৈধ।

মাইকেলঃ তাহলে এসব বহুবিবাহ প্রথা সনাতন যুগে ছিল। এখন তো মানুষ উন্নত হয়েছে, সভ্য হয়েছে!

রাশেদঃ মানবসভ্যতার অগ্রগতি মানুষের স্বভাবজাত প্রক্রিয়া ও তাদের প্রয়োজনের বিপরীতমুখী হতে পারেনা। ফলে এটা যুক্তিসংগত নয় যে, আদিম যুগে মানুষ পশুর মাংশ খেত, ভেড়ার পশমের পোশাক পরত তাই তারা অসভ্য ও হিংস্র ছিল। তবে আমরা এটা বলতে পারি যে, মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতি মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে হচ্ছে এবং জীবনযাপনকে আরো সহজ ও গতিময় করে তুলছে। আর এসব নিয়েই ইসলামের আগমন।

মাইকেলঃ কিভাবে?

রাশেদঃ তুমি বলেছ যে, তোমাদের প্রাচ্য সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বাহিরেও প্রেম ও যৌন সম্পর্ক রয়েছে। আর এটাই নারীর প্রতি সবচেয়ে বড় জুলুম ও সমাজের জন্য বিশৃংখলা।এ সম্পর্কে আত্মিক প্রশান্তি মিলেনা, কারো অধিকার সাব্যস্ত হয়না এবং সামাজিকতাও সৃষ্টি হয়না।

অন্যদিকে,পুরাতন যুগে যখন কোন সীমারেখা ছাড়াই বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল তখন ইসলাম এসে নারীর উপর ইনসাফ করেছে, তাদের প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদরকে স্বামীর বৈধ জীবনসংগী করেছে। আর এ সামাজিক ভিত তথা পরিবারের সফলতার গ্যারান্টি স্বরূপ স্বামীর উপর কতিপয় নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান আরোপ করে দিয়েছে।

ফলে ইসলাম সব নারীর স্বার্থকে রক্ষা করেছে। পুরুষের যৌনতার সংযতা ও যথেচ্ছারিতার মাঝে সমতা এনেছে। আর এসব করেছে সামাজিক একটা ভিত্তি তথা পরিবারের আওতায়; তোমাদের সমাজে যে ভিত্তি ভেঙ্গে পড়েছে।

মাইকেলঃ কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, নারী-পুরুষের জন্মের হার প্রায়ই কাছাকাছি, ফলে যদি আমরা বহু বিবাহের প্রথা বাস্তবায়ন করি তবে কিছু পরুষ স্ত্রী ছাড়া থাকবে, যাতে একটা ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হবে।

রাশেদঃ পরিসংখ্যান যদি এটা বলে থাকে তবে ইহা একথাও বলে যে, নারীর গড় বয়স পুরুষের গড় বয়সের চেয়ে বেশি। পশ্চিমা সমাজে পুরুষেরা গড়ে নারীর চেয়ে সাত বছর কম বেচে থাকে। এ পার্থক্য গত কয়েক শতাব্দি ধরে বেড়ে চলছে। উদাহরন স্বরুপ বলা যায় যেঃ ১৯০০ সালে জার্মানিতে নারীর গড় আয়ু ৮০ বছর, অন্যদিকে পুরুষের গড় আয়ু ৭০ বছর।

আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ক্রোজার বলেনঃ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পুরুষেরা নারীরদের তুলনায় কম আয়ু পেয়ে থাকেন ...... তিনি আরো যোগ করেন যে, এ পার্থক্যের কারন হল নারী- পুরুষের হরমোনগত পার্থক্য। পুরুষের হরমোন জিনের মধ্যে এমন সক্রিয়তা সৃষ্টি করে যা হৃদরোগ ও রক্তচাপ ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধির কারন হয়ে থাকে।

আমি এখানে আরো কিছু যোগ করতে চাই, তাহলোঃ বিভিন্ন দেশে যে বিশৃঙ্খলা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংঘর্ষ- মারামারির কারনে মানুষ নিহত হচ্ছে এছাড়া এক্সিডেন্ট ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগেবিশ্বে যেসব হাজার হাজার মানুষ নিহত হচ্ছে, তার অধিকাংশই পুরুষ।

অর্থাৎ সমাজে নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি। এটা বাস্তবতা, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে। এর সাথে আরো যোগ করতে চাই তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা নারীদের সংখ্যা।

এখন নারীদেরকে কি অবিবাহিত রেখে মানসিক, সামাজিক ও চারিত্রিক সমস্যার মাঝে ছেড়ে দেয়া হবে? নাকি তাদেরকে গোপনে তাদের অধিকার ও স্বভাবজাত যৌন পরিতৃপ্তির মিটানোর জন্য বিশৃংখলভাবে ছেড়ে দেয়া হবে, ফলে এর খারাপ প্রভাব তার ও সমাজের উপর পড়বে। নাকি তাদের জন্য উত্তম হবে সামাজিক সুন্দর একটি নিয়ম প্রনয়ন, যা সুষ্ঠ নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজন মিটাবে; যেসব নীতিমালা তাদের শক্তি সামর্থ ও মানবিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। আর এসব সম্পন্ন হবে ন্যায় ও ইনসাফের আলোকে, কোনপ্রকার জলুম ব্যাতিরেকে এবং কারো উপর কোন চাপ সৃষ্টি ছাড়া?

ফ্রান্সের সমাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর ডক্টর যোসেফ লুবুন এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ “প্রাচ্যদেশে (তিনি ইসলামকে বুঝিয়েছেন) যে বহুবিবাহ প্রথা চালু আছে এটা একটা সুন্দর নিয়ম। এতে সে জাতির মাঝে চারিত্রিক অবকাঠামো উন্নতি হয়, পারিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়, নারীরা সম্মান ও সুখী হয়, যা আমরা ইউরোপীয় দেশগুলোতে দেখিনা”.........।

আমাকে এককাপ লেবুর জুস ও চা খেতে অনুমতি দাও।

রক্তঝরা গোলাপ



রক্তঝরা গোলাপ

রাশেদ এসে টেবিলে বসেই ব্যাগ হতে ল্যাপটপ বের করে তা চালু করতে করতে মাইকেলকে বললঃ

আজ আমি তোমাকে একটা দুর্লভ ভিডিও ক্লিপ দেখাব, এটা মাত্র আধা মিনিটের ভিডিওক্লিপ, তবে সাধারন ভিডিও নয়। কেননা ইহা আমাদেরকে ইতিহাসের শত বছরে পিছনে নিয়ে যাবে, ইহা একটি দৃশ্যমান ডকুমেন্ট।

রাশেদ ও মাইকেল গুরুত্বসহকারে ল্যাপটপের কাছে তাদের মাথা ঝুঁকিয়েপর্দায় চোখ রাখল।

মাইকেলঃ ওহ,কি চমৎকার! কী যে ভালো লাগছে, আমি আমার দেশ বৃটেনের শত বছর আগের জীবনযাত্রা দেখছি। আমি রাস্তায় পথিকের প্রফুল্লতা দেখছি..., এ শিশুটির আনন্দ দেখছি... তখন জীবন ছিল স্বয়ংক্রিয় ,স্বভাবজাতপূর্ণ ও স্বাভাবিক... এ জীবন কতইনা আত্মার নিকটবর্তী ছিল।

রাশেদঃ আমি ভিডিওটা আবার চালু করব যাতে তুমি অন্য একটা বিষয় লক্ষ্য করতে পার।

রাশেদ ভিডিও ক্লিপটি আবার চালু করে মাইকেলকে বলতে লাগলঃ

দেখ.. একজন নারী ..দুইজন ..পাঁচজন.. ছয়জন নারী... আমার সাথে লক্ষ্য কর... তাদের সকলের ক্যাপে আবৃত মাথা ও দু'হাত ব্যতিত আর কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। তাদের পোশাক গুলো ঢিলেঢালা, শরীরের কিছু বুঝা যাচ্ছেনা।

মাইকেলঃ ঠিকই!

রাশেদঃ তাহলে এখন কি হচ্ছে?

মাইকেলঃ কোথায়?

রাশেদঃ তোমাদের সমাজে..

মাইকেলঃ তুমি কি উলঙ্গতা ও অশ্লীলতাকে বুঝাতে চেয়েছ?!

রাশেদঃ ঠিকই ধরেছ। তবে আমি এটাও বলব যে, এটা সাধারনত নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংসের মধ্যে শামিল।

মাইকেলঃ এগুলো ব্যক্তি স্বাধীনতা। আমরা বর্তমানে এমন সমাজে আছি যেখানে স্বাধীনতাকে মহাপবিত্র মনে করা হয়। এখানে প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে সে তার নিজের মত করে জীবনকে চালাবে।

রাশেদঃ আমি অবশ্যই একথা বুঝি। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের আলাদা এক বা একাধিক বৈঠক হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হলো,সমাজে এসব নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের উপর সকলে সামাজিকভাবে একমত, প্রত্যেকের পছন্দ যেন একই ভিত্তির উপর কেন্দ্রীভূত।

মাইকেলঃ তুমি জান যে, এখানে সামাজিক সংস্কৃতি বলে একটা কথা আছে। এ সংস্কৃতিতে সমাজে মানুষ বড় হ এবং কোন ভিত্তি বা সামাজিক কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন আচরনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এসব সংস্কৃতির কারনেই মানুষের পছন্দের মাঝে কখনো কখনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

রাশেদঃ খুবই সুন্দর কথা। এ ব্যাপারটা নিয়ে যখন আমরা এর সঠিক হওয়া বা ভুল হওয়ার বিষয় যাচাই করি তখন দেখতে পাই যে, তোমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থও শালীনতার প্রতি এবং প্রকাশ্য সাজসজ্জা না করার প্রতি আহ্বান করে। । "করিন্থীয় বাণী" তে পৌলের পত্রে (২/৯) উল্লেখ আছে যে, আমি আরো চাই যে, নারীরা উপযুক্ত শালীন পোষাকে, লজ্জা ও বিনয় সহকারে বের হবে। তবে পায়ে চুড়ি বা খলখল, সোনা ও মূল্যবান জিনিসের গহনা পরিধান করবেনা।(১০) বরং নারী বের হবে এমনভাবে যেন বোঝা যায় যে,তারা আল্লাহর ভয়ভীতিতে ও সৎকাজ করে জীবন অতিবাহিত করে।

মাইকেলঃ হে দোস্ত! ইহা গীর্জার নারীদের ব্যাপারে ঠিক আছে। আর গীর্জার বাইরে আমাদের যে জীবন রয়েছে সে ব্যাপারে আমি তোমাকে ইতিপূর্বে বলেছি যে, আমরা নবজাগরণের যুগ থেকেই দ্বীনকে জীবন থেকে আলাদা করেই জীবন যাপন করছি।

রাশেদঃ কিন্তু হে বন্ধু! এ ভিডিও ক্লিপটিতে আমরা শালীন পোষাকে নারীদেরকে রাস্তায় দেখেছি, গীর্জায় নয়। আর এটি হচ্ছে তোমরা যাকে নবজাগরণের যুগ বল তার কয়েক শতাব্দী পরের দৃশ্য। আর যদি আমি তোমাদের নৈতিক মুল্যবোধ থেকে ধর্ম বের হয়ে যাবার কথা স্বীকার করে নেই তাহলে আমি তোমাকে প্রশ্ন করিঃ কি এমন বিষয় ঘটেছে? কি কারনে তোমাদের নারীরা এসব অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনার দিকে ধাবিত হয়েছে?

মাইকেলঃ অশ্লীলতা তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু আমি তো সব স্বাভাবিক দেখছি। রাখ, ভিডিও ক্লিপে একটা বিষয়ে আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষন করছি; সেটা হলোঃ এটা শীতকালে রেকর্ড করা হয়েছে, অথবা কোন এক শৈতপ্রবাহ দিনে। পুরুষ ও শিশুদের পোশাক ও এর রঙ দেখে এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব, এসব শালীনতা ঠান্ডা আবহাওয়ার কারনে হতে পারে। যদিও এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায়না যা আমরা সবাই জানি যে, সে যুগে নারীরা নিজেদেরকে অনেকটা ঢেকে রাখত। আর পরবর্তীতে কি ঘটেছে, সেটার সাধারন উত্তর হলোঃ সমাজের উন্নতির ফলে নৈতিক মূল্যবোধ ও নীতিবোধের পরিবর্তন ঘটেছে।

রাশেদঃ এটা ভিন্ন একটি অধ্যায়, যা নিয়ে আমরা অন্য একদিন আলোচনা করতে পারি। এটা তুলনামূকল চারিত্রিক ব্যাপার। আমরা যদি বিজ্ঞানের অগ্রগতি, উপকরণ ও উপায় ইত্যাদি সঠিকভাবে বুঝি তবে দেখব চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো বাস্তবায়নে এসব যুগে ভিন্নতা এসেছে, অর্থাৎ এসব গুনাবলী সব সময়ই ঠিক ছিল, শুধু সময়ের ভিন্নতার কারনে বাস্তবায়নে কিছুটা ভিন্নতা এসেছে।

মাইকেলঃ পরে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু রাশেদ তুমি দয়া করে কি বলবে যে, তোমরা নারীর শারীরিক দিকটাকে কেন এত গুরুত্ব দাও?! এ বিষয়টা নিয়ে তোমরা এত ব্যস্ত কেন?!

রাশেদঃ ইসলাম নারী পুরুষকে একজন মানুষ হিসেবে দেখে। আর দেহ, আত্মা ও জ্ঞানের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি। এ তিনের কোন একটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কেননা মানুষের মাঝে শুধু শারিরীক উপাদানই বিদ্যমান নয়, তার রয়েছে জৈবিক উপাদানও। এ জ্ঞানসম্পন্ন এ প্রাণীটিকে মনুষ্যত্বের পর্যায়ে পৌঁছতে হলে তাকে কতিপয় নৈতিক মূল্যবোধ, আত্মিক উন্নতি, সামাজিক নিয়ম-কানুন ইত্যাদির পরিপূর্ণতা পেতে হয়।

তোমরা যখন থেকে মনে করলে যে, তোমরা নবজাগরণ লাভ করেছ, আর গীর্জা তথা ধর্মকে তোমাদের জীবন হতে পৃথক করে ফেলেছ তখন থেকে তোমরা চাচ্ছ, যেন গীর্জা তার আধ্যাত্মিকতা নিয়ে থাকে, আর ধর্মীয় গন্ডির বাহিরে স্বীয় জ্ঞানকে ব্যবহার করে তোমরা তোমাদের শরীর নিয়ে যা খুশী তা-ই কর। আর এজন্য বস্তুবাদী সভ্যতার শয়তানগুলো ধর্ম ও নৈতিকতার বাহিরে পাশবিক যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। তাদের এসব পাশবিক ইচ্ছা পূরণের জন্য নারীদেরকে বিভিন্নভাবে নানা উপায়ে দেহ প্রদর্শনীতে উৎসাহিত করেছে, আর একে তারা অধিকার ও স্বাধীনতা নাম দিয়েছে।

মাইকেলঃ কিন্তু আমরা এসব উলঙ্গপনা সকাল-সন্ধ্যায়ই দেখি, এতে তো আমাদের মাঝে তেমন কোন লালসার সৃষ্টি হয়না; যাকে তুমি পাশবিকতা বলেছ।

রাশেদঃ তুমি কি মনে কর এটা একটা ভালগুণ বা উত্তম চরিত্র? মানুষ উলঙ্গতা ও উত্তেজক দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হলে খুব সহজে যৌন চাহিদাহীনতায় আক্রান্ত হয়। এতে আরো বড় ক্ষতি সাধিত হয়, ফলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির ভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকে, যা তাকে ধীরে ধীরে সমকামীতার দিকে নিয়ে যায়।

মাইকেলঃ পরিণাম তোমার কাছে অনেক ধরনের, কিছু পরিনাম কাছের, আর কিছু অনেক দূরের।

রাশেদঃ হ্যাঁ, এসব অশ্লীলতার ফলে অনেক বড় অপরাধ সংঘটিত হয়। কারণ কেউ যদি শারীরিক, অথবা সামাজিক ,বা শিক্ষাগত কারনে যৌন চাহিদাহীনতার পর্যায়ে না ও পৌঁছে তবে সে অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনার সমস্যায় ভুগবে, এর ফলে ধর্ষণ বেড়ে যাবে। ধর্ষনের পরিসংখ্যানে এমনই দেখা যায়। রাখো,আমি এ ব্যাপারে সামান্য কিছু উদাহরন দিচ্ছিঃ

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে,এক বছরে ফ্রান্সে (৪৪১২)টি ধর্ষণ হয়েছে, অর্থাৎ প্রায় প্রতি দু'ঘন্টায় একটি করে ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে।

বৃটেনে লন্ডন পুলিশ নারীদেরকে পুরুষের আক্রমন থেকে আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করা এবং বিভিন্ন ফলপ্রসু পদক্ষেপ নেয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়ার জন্য একটি বিশেষ অভিযান গড়ে তুলে। এ অভিযানের ব্যবস্থা তখনই নেয়া হয় যখন দেখা যায় যে, এক বছরে লন্ডনের রাস্তা-ঘাটে নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষনের অপরাধ ১১% পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আমেরিকার জাতীয় দুর্ঘটনা রকেন্দ্রে পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, আমেরিকাতে যুবতী নারী ধর্ষনের মাত্রা প্রতি মিনিটে (১.৩) জন । এ সেন্টার আরো উল্লেখ করেন যে, প্রতি আটজন যুবতী নারীর মধ্যে একজন ধর্ষনের শিকার হয়। এ পরিসংখ্যান ১৯৯১ সালের।

আর বর্তমানে ২০০৯ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ১৪ বছর বয়সী প্রতি তিনজন মেয়ের মধ্যে একজন মেয়ে ধর্ষনের শিকার হয়। বর্তমানে আমেরিকাতে বছরে অর্ধ মিলিয়ন ধর্ষন মামলা হয়ে থাকে। আর (৬১%) মেয়ে ১২ বছর বয়সের আগেই তাদের কুমারীত্ব হারায়।

এক্ষেত্রে আরেক ধরনের অপরাধ আছে, যা গোপনীয় অপরাধ। যেমনঃ কর্মস্থলে নারীরা মালিক ও উর্ধ্বতম কর্মকর্তা দ্বারা ইভটিজিং বা যৌননির্যাতনের শিকার হন। সাধারনত চাকুরী হারাবার ভয়ে, অন্য কোন লোভে বা প্রমানের অভাবে এ সব অপরাধ রেকর্ড করা হয়না।

তাই স্বভাবতঃ এ সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা নয়। কেননা "নারী ধর্ষন প্রতিরোধ সংস্থা" মনে করেন যে, এক্ষেত্রে ৩৫টি ঘটনার মধ্যে মাত্র একটি ঘটনা নারীরা প্রকাশ করে।

মাইকেলঃ কিন্তু ধর্ষনের মত সমস্যা এমন একটা জটিল সমস্যা;যার অনেকগুলো কারন রয়েছে, যেমনঃ আত্মিক, শিক্ষাগত, সামাজিক এমনকি অর্থনৈতিক কারনও রয়েছে।

রাশেদঃ এটা ঠিক, কিন্তু একথা আমরা অস্বীকার করতে পারবনা যে, বড় কারনগুলোর মধ্যে অন্যতম হল,শারীরিক যৌনতাকে উস্কে দেয়া এমন কী যদি তা প্রদর্শনীর মাধ্যমেও হয়।লক্ষ্যনীয় ব্যাপার এই যে, আমেরিকার একটি গবেষনায় দেখা যায়, শীতকালে সেখানে ধর্ষনের হার গরমকালের তুলনায় কম। এটা হয়ত এ কারনে যে, শীতকালে নারী শরীর ভালকরে ঢেকে রাখে বা শীতকালে লোকজন কম বের হয় ফলে মেলামেশা কম হয়। দু'য়ের যে কারনেই হোক শীতে ধর্ষনের পরিমান কমে যায়।

মাইকেলঃ কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় যে, নারীরাই তো তাদের ইচ্ছেমত শরীর খুলে রাখে, আর এটাকে আমরা ব্যক্তি স্বাধীনতা বলি, যা আমরা তাদেরকে নিষেধ করতে পারিনা।

রাশেদঃ প্রকাশ্যে এটা এ রকমই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবতা হল, পাশ্চাত্য সমাজের অধিপতিরা বিশেষ করে পুরুষেরা তাদেরকে উলঙ্গপনার সংস্কৃতিতে ও উগ্র সাজে অভ্যস্থ করেছে, আর এ জন্য সব ধরনের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে, সব ধরনের যৌন উত্তেজনাকর মাধ্যম সৃষ্টি করেছে, যাতে তারা নারীদেরকে কোন প্রতিকূলতা ছাড়াই ভোগ করতে পারে। বরং তারা নারীর স্ত্রীত্বের প্রতি অবিচার করে আইন-কানুন তৈরি করেছে। কেননা পাশ্চাত্যেরপাশ্চাত্যের মানব রচিত আইনগুলো ধর্ষিতা নারীকে করুনা বা দয়া করার চেয়ে ধর্ষনকারী পুরুষকে বেশি করুনা করে থাকে, যা তাদেরকে আরো বেশি করে ধর্ষনের প্রতি উৎসাহিত করে। বরং কিছু কিছু পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য সমাজে ধর্ষনের ঘটনাকে আইনী কোন অপরাধ হিসাবে না ধরে নৈতিক অবক্ষয় বলে গণ্য করা হয়।

এর বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছিঃ ফিনল্যান্ডে- যা উন্নত বিশ্বের একটি দেশ যারা নারীর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়- একলোক বাসস্ট্যান্ডে বিকলাঙ্গদের টয়লেটে জোরপূর্বক একজন নারীকে ধর্ষন করে। প্রথমে সে তার মাথা দেয়ালের সাথে আঘাত করে ও হাত পিছনে বেঁধে ফেলে। প্রসিকিউশনের মতে এটা কোন ধর্ষন ছিলনা, কেননা সেখানে যে জবরদস্তি হয়েছে তা খুব হালকা ছিল!!! মহিলাটিকে জোর পূর্বক ধর্ষনের কারনে লোকটিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে ও তাকে সাত মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে!!

হে বন্ধু! দেখ কোন সমাজ বেশি নিরাপদ ও নৈতিকতামুখী? আজকের সমাজ নাকি শতাব্দীকাল আগের সমাজ? ভিডিওটা আবার একটু দেখেবে নাকি?!

মাইকেলঃ ঠিক আছে রাশেদ, কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিকোণে এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি?

রাশেদঃ এ ব্যাপারটা বলতে গেলে আরো একটি আলাদা আলোচনার দরকার, বরং অনেকগুলো বৈঠকের প্রয়োজন।

নৈতিকতার পর্দা



নৈতিকতার পর্দা

রাশেদ ও মাইকেল তাদের পূর্ব নির্ধারিত সময়মত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য রেলগাড়ির ষ্টেশনে মিলিত হল। রেলগাড়ি রওয়ানা হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য তারা বসার সিট খুঁজছিল।

মাইকেলঃ আমি মনে করি নারীর পোশাক নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা করার সময় হবে, তুমি প্রথমেই হিজাব বা পর্দা নিয়ে বলবে...তাই না?!

রাশেদঃ অনেক মানুষই মনে করে থাকেন যে, পর্দা হলো শুধুমাত্র একটা চাদর এবং মাথা ঢেকে রাখা, তাদের অনেকেই জানেন না যে, পর্দা হল একটি স্বকীয় চিন্তা, সামাজিক নিয়ম নীতি... আমাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি এ দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করতে হবে।

মাইকেলঃ আমার মনে হয় তুমি বিষয়টি জটিল করে তুলছ। বেশি গুরুত্ব দিয়েছ, যা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়!

রাশেদঃ আমরা মানুষকে তাদের শরীর ঢেকে রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম দেখে থাকি। প্রত্যেকে মনে করেন যে, তার সীমানাই উন্নতি ও সভ্যতা। আবার অনেকে মনে করেন যে, অন্যজন খুব অনগ্রসর ও মৌলবাদী। আবার এদের দেখে অন্যরা মনে করেন যে, তারা ভ্রান্ত ও বিভ্রাটগ্রস্থ। প্রত্যেক দলের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নিজস্ব মুল্যবোধ ও চিন্তাধারা অনুযায়ী হয়ে থাকে। এজন্যই আমাদেরকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে একমত হতে হবে যা শরীর ঢাকার ক্ষেত্রে পোশাকের সাধারন গুনাবলী নির্ধারণ করে দিবে।

বিষয়টি আমি তোমাকে যেভাবে বলছি যে, এটা ব্যাপক। এজন্য এসো,আগে আমরা কতিপয় মৌলিক ভিত্তির উপর একমত হই, এতে হয়তো আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত কাছাকাছি হবে।

মাইকেলঃ ঠিক আছে।

রাশেদঃ আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমরা একমত যে, মানুষের আসল গঠনপ্রনালী, বাস্তবতা ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে না জেনে মানব জীবনের কোন সমস্যার সমাধান বের করা যায় না।

মাইকেলঃ অবশ্যই।

রাশেদঃ আমি আরো মনে করি বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি ও ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, মানুষের জ্ঞান সীমিত। মানুষ কাল যা জানতনা আজ তা জানতে পারে, কাল সে যা সঠিক মনে করেছিল আজ তাই পুনঃসংশোধন করে। এমনিভাবে আগামী কাল সে আবিষ্কার করবে যে, সে আজ অজ্ঞ ছিল বা কমপক্ষে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ছিল। আর একথাটাই মহাগ্রন্থ আল কোরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ **আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে"।** (সুরা বনী ইসরাঈলঃ ৮৫)

মাইকেলঃ আমি তোমার সাথে একমত, তবে এ সবের সাথে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক কি?

রাশেদঃ বন্ধু একটু ধৈর্য ধর, এখনো আমি কথা পূর্ণ করিনি... যখন আমরা এ কথায় একমত হলাম, তখন স্বভাবত আমরা আরেকটি কথা স্বীকার করব যে, এমন অনেক বিষয় আছে যার মাঝে সূক্ষ্ম, গোপনীয় ও অনেক দিক থাকে যার গভীরে আমরা পৌঁছতে পারিনা। এটা শুধু মাত্র আমাদের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি, ঝোঁক ও পরিবেশের প্রভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকি। কারণ, এগুলোর প্রভাব হতে দূরে থাকা কঠিন। আর এ ধরনের বিষয়ে যখন আমরা এসব কিছুর প্রভাব নিয়ে সমাধান করতে যাই তখন সেটা হয় অসম্পুর্ণ বা;, বরং কখনো কখনো সঠিক সমাধানের বিপরীতটাও হতে পারে।

মাইকেলঃ এটা যুক্তিসম্মত ফলাফল। কিন্তু অন্য দিক থেকে জ্ঞানের (আ'কল) ব্যবহার করে কোন চিন্তা গবেষণা, তথ্য, গভীর অনুসন্ধান, ভুল ও সঠিক বুঝা ইত্যাদি করা ছাড়াতো আমাদের কোন উপায়ও নেই। কোন এক সময় হয়তো মানুষ এর মূল তত্ব অনুধাবন করে সঠিক সমাধান দিতে পারবে- একথা ভেবে সমাধান ছাড়া রেখে দেয়ার চেয়ে এটা তো উত্তম।

রাশেদঃ তাহলে তুমি আমার সাথে স্বীকার কর যে, এ সব সমাধানে অতি বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকে, কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে অপারগ এবং আমাদের সামনে এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

মাইকেলঃ হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।

রাশেদঃ কিন্তু আমাদের কাছে এসব এড়াতে অন্য ভাল পথ রয়েছে!

মাইকেলঃ "আমাদের কাছে" বলতে কি বুঝাতে চাও? কি সমাধান আছে?

রাশেদঃ আমি এর দ্বারা মুসলমানদেরকে বুঝেয়েছি, আমাদের কাছে মানবজাতির উত্তরণের ভাল সমাধান আছে। এক কথায় এ সমাধান হল যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের সব ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। যেমন **আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "যিনি সৃষ্টি করেছেন,তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্নজ্ঞানী,সম্যক জ্ঞাত"।** (সুরা মুলকঃ ১৪)।

তিনি একমাত্র স্রষ্টা যিনি মানুষের সব গুনাবলী, প্রয়োজন, কল্যান ও অকল্যান ইত্যাদি জানেন। আর তিনি মানবজাতির সব ধরনের চাহিদা, আবেগ অনুভূতি, আকর্ষণ ইত্যাদি থেকে পবিত্র। এজন্যই একমাত্র তিনিই মানবজাতির কল্যানে ন্যায় ও বিজ্ঞভাবে একটি জীবনবিধান দিতে সক্ষম। আর একথাটিই পবিত্র আল কোরআনে স্পষ্টভাবে বলে হয়েছে...

মাইকেলঃ (কথার মাঝে)ঃ তোমার কথাগুলো সুবিন্যস্ত হে রাশেদ! তবে তুমি ভুলে যেওনা যে, আমি তোমার ধর্মে বিশ্বাস করিনা, ফলে আমি যা বিশ্বাস করিনা তা আমার উপর চাপিয়ে দিওনা.. বরং আমরা যে ব্যাপারগুলোতে একমত হয়েছি সেগুলো নিয়েআলোচনা কর...

রাশেদঃ যদিও এ বিধানটি প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে স্থায়ীভাবে স্বীকৃত আছে এবং আমি মনে করি এ বিশ্বাসটা প্রত্যেক মানুষেরই থাকা উচিত; তবুও তুমি যেভাবে চাও আমরা সেভাবেই আলোচনা চালিয়ে যাতে পারি, এতে আমার কোন বাধা নেই। তবে সেটা হতে হবে আমাদের উভয়ের পরিতুষ্টির আলোকে তথা সামাজিক নিয়ম নীতির সীমারেখায়। আর আমি ইতিপূর্বেউল্লেখ করেছি যে, পর্দা হল সে সামাজিক নিয়মের একটি অংশ।

মাইকেলঃ কোন অসুবিধে নেই।

রাশেদঃ আমি গত আলোচনায় বলেছিলাম যে, আমরা মানুষের দৈহিক ও প্রানীসুলভ স্বভাবেরবিষয়টিকে ভুলে যেতে পারিনা। পুরুষেরা স্বভাবতই নারীর প্রতি আকর্ষিত হয়। প্রথমতঃ নারীর দেহ তাকে আকর্ষন করে। ফলে খোলামেলা পোশাক তাকে উত্তেজিত করে, ধর্ষন, ইভটিজিং ইত্যাদির প্রতি উৎসাহিত করে।

মাইকেলঃ কিন্তু আমি মনে করি এধরনের চিন্তাভাবনা নারী-পুরুষের জন্য এক ধরনের অপমান । নারীর দৈহিক দিকটাতে মননিবেশ করা আর তার জ্ঞান গরিমা, সংস্কৃতি, নীতি নৈতিকতাকে ভুলে যাওয়া এটা নারীর প্রতি পুরুষের তুচ্ছজ্ঞান ও অবমাননা মাত্র। আরো এধরনের চিন্তা করা যে, নারীরা তেমন কিছু জানেনা, তারা নিজেদেরকে হেফাযত করতে সক্ষম নয়। আর পুরুষের জন্য অপমানজনক হল, তার ক্ষেত্রে এভাবে চিন্তা করা যেন সে এমন একটা হিংস্র বাঘ, শিকারকে যৌন আক্রমন করাই যার একমাত্র লক্ষ্য।

রাশেদঃ হে বন্ধু তুমি কি মনে কর, যখন কোন নারীআয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে সুন্দর করে সাজে, উগ্র পোশাক পরে তখন সে এসব করে পুরুষের উঁচু জ্ঞান ও মহান চরিত্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য? নাকি তারাপুরুষের উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য না হলেও কমপক্ষে পুরুষের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য এসব করে থাকে। তুমি কি মনে কর যে, কোন সুসজ্জিতা সুন্দরী নারীকে প্রথম নজরে দেখা মাত্র কোন পুরুষ তার জ্ঞান-গরিমা, উন্নত সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে?!

আমরা সকলেই জানি, কামভাব, উত্তেজনা, নিজেকে দমন ইত্যাদির বিচারে মানুষের মাঝে অনেক শ্রেণী রয়েছে। আবার সম্মান, মর্যাদা, উন্নত চরিত্র ও আদবের ক্ষেত্রেও তারা বিভিন্ন শ্রেণীর। পর্দা দ্বারা বোঝা যায় যে, পর্দাশীলা নারী চরিত্রবতী, সে তাকে ইভটিজিং করার জন্য পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষন করে তাদেরকে উত্তেজিত করতে চায়না। আর দুর্বলচিত্ত ও দুশ্চরিত্রদেরকে তার থেকে ফেরানোর জন্য এটা কার্যকরী।পবিত্র আল কোরআন স্পষ্টভাবে ঘোষনা করেছে যে, পর্দা হল নারীকে পাপিষ্ঠদের থেকে রক্ষার মাধ্যম।

মাইকেলঃ কিন্তু কিছু কিছু বোরকা পড়া মেয়েদের আচরন দেখা যায় সচ্চরিত্র বিরোধী। এতে বুঝা যায় যে, ব্যাপারটা শুধু হিজাব পরার সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা ও সুন্দর আখলাক ও শিক্ষা দেয়া উচিত।

রাশেদঃ তোমার কথা কিছুটা সত্য। একথা কেউ বলেনা যে, একজন নারী এক টুকরা চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখলেই সে একজন সুচরিত্রা নারী হবেন, কিন্তু এটার অর্থ এও নয় যে হিজাব পরবেনা। যেমনঃ কোন লোক ডাক্তারের বেশ ধরল, বা কোন ডাক্তার ভুল করল, অথবা এ পেশাকে অপব্যবহার করল, এতে কিন্তু এ ডাক্তারী পেশাকে দোষারোপ করা যাবেনা। বরং যে ব্যক্তি ভুল করেছে তাকে সংশোধণ করতে হবে। অতএব, এ ডাক্তার, পর্দাকারী বা অন্য কেউ সর্বোপরি একজন মানুষ, তার রয়েছে মানবিক দুর্বলতা।

অন্যদিকে, ইসলাম অপকর্ম ও খারাপ কাজ থেকে হিফাযতের জন্য যখন হিজাবের বিধান প্রবর্তন করেছে, সাথে সাথে আবার উত্তম চরিত্র ও সুচিন্তার ব্যবস্থাও করেছে, যাতে একজন মানুষ সম্মানের চরম শিখরে উঠতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, একজন সম্মানিতা নারী হিজাব পরিহিতা হন, পক্ষান্তরে সব হিজাব পরিহিতা সম্মানীতা নাও হতে পারেন।

মাইকেলঃ কিন্তু এসবের দ্বারা কি একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তথা নারীর শরীরকে খারাপকাজের মূল ভাবা হয়না? আমাদেরকে কি এই শরীর ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত?!

রাশেদঃ নারীর শরীর খারাপের মূলহিসাবে ইসলাম নারীদেরকে পর্দা করেতে আদেশ করেনি। বরং পুরুষের বিশেষ করে কিছু দুর্বল চিত্ত ও খারাপ লোকের স্বভাবজাত যৌন অনুভূতির উদ্রেক যেন না হয় সেজন্য পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব নারীকে ইভটিজিং ওধর্ষন হতে এবং পুরুষকে যৌন উত্তেজনাও যিনার উৎসাহ থেকে বাঁচার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে ইসলামী শরীয়া খুব গুরুত্বের সাথে মানুষের আবেগ অনুভূতি ও যৌন উত্তেজনাকে ব্যবহারের ব্যবস্থা রেখেছে একমাত্র বিবাহের মাধ্যমে;, যাতে সমাজের ভিত্তি মজবুত হয়।

মাইকেলঃ কিন্তু হে রাশেদ, নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ থেকে রক্ষার জন্য যদি পর্দার বিধান চালু করা হয়, তাহলে কেন পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুরুষদেরকে পর্দা করতে বলা হবেনা? পুরুষের প্রতি নারীর কি যৌন উত্তেজনা নেই?!

রাশেদঃ (হেসে হেসে) ভাবার মত প্রশ্ন..... প্রকৃত পক্ষে ইসলাম পুরুষের পোশাকের সীমা নির্ধারন করে দিয়েছে, যা নারীর চেয়ে হালকা । উভয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো স্পষ্ট হলে এর হিকমত বুঝা যাবে। আমেরিকাতে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নায়ুবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডঃ বিনইয়ামিন হাইডেন তার একটি গবেষণায় প্রকাশ করেন,যা জার্মানীতে (Berliner Morgen Post) বার্লিন মর্ডান পোষ্টে প্রকাশিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ পুরুষ নারীকে দেখে যৌন তৃপ্তি উপভোগ করে থাকে, কেননা পুরুষের মস্তিস্কে এমন কিছু স্নায়ু আছে যার সে ফলে সুন্দরী নারীর প্রতি নজর দিয়ে উপভোগ করে। পক্ষান্তরে নারীরা সুঠাম পুরুষের দিকে খুব কমই দৃষ্টি দেয়।

এ গবেষনায় সে সব কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয় যেসবের ফলে পুরুষ স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা সুন্দরী, আকর্ষনীয় নারীকে উপভোগ করে। আর নারীর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকে।আর এতে স্পষ্ট হয় যে,নারী -পুরুষের এ পার্থক্যের কারণ হলো মস্তিষ্ক। কেননা পুরুষের মস্তিষ্কের কিছু স্নায়ু সুন্দরী নারী দেখলে সবল হয়ে উঠে, এতে সে প্রশান্তি ও মজা উপভোগ করে। কিন্তু নারীর গঠন এর ব্যতিক্রম, এজন্য আকর্ষনীয় পুরুষ দেখলে তার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়না।

এ গবেষণার আরো কিছু ফলাফল হলঃ নারীর মাঝে যে বিষয়টা সর্বপ্রথম পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষন করে তা হল চেহারা। অন্যদিকে নারীরা নির্দীষ্ট কোন অঙ্গের প্রতি মনোনিবেশ না করে পূর্ন অবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ নারীর চেয়ে পুরুষেরা আক্রমনে অধিক সাহসী ও অগ্রগামী। কেননা একটি গবেষনায় দেখা গেছে পুরুষেরা নারীর তুলনায় পাঁচগুণ বেশি অপরাধ করে থাকে। তাই নারী যখন যৌন উত্তেজনার দরজা বন্ধ করে রাখবে, এবং প্রথম পদক্ষেপ না নিবে তখন পুরুষেরা সেদিকে এগিয়ে যেতে পারবেনা ও নারীর উপর সীমালংগন ও করবেনা।

মাইকেলঃ (তাড়াহুড়া করে)ঃ আমার মনে হয় রেল চলে এসেছে, চল আমরা যাই।

নারী হল রানী



নারী হল রানী

রেল কিছুক্ষন চলার পর রাশেদ ও মাইকেল দু'বন্ধু সময় কাটানোর জন্য আবার কথা শুরু করল....

মাইকেলঃ আমরা আজ নারীর অধিকার সম্পর্কিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছি, তাহলোঃ একাধিক বিবাহ ও হিজাব বা পর্দা। এ বিষয়ে আরো আলোচনা করলে কেমন হয়?

রাশেদঃ ভাল প্রস্তাব, এতে আমরা এ বিষয়েপুরোপুরি আলোচনা শেষ করতে পারব।

মাইকেলঃ এ বিষয়ে আমার বিবেকে যা প্রথমেই নাড়া দিয়ে উঠে সেটা হল নারীর ভূমিক; মুসলমানেরা কেন পুরুষের মত নারীদেরকেও জীবনের সব কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করায়না?

রাশেদঃ হে বন্ধু আমরা যখন বলেছি যে, মানুষের মাঝে সামগ্রীক ও জৈবিক দু'টি উপাদান রয়েছে, এর অর্থ এ নয় যে, এ সব বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ফলাফল ইত্যাদি অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মাঝেও পাওয়া যায়। এখানে অনেক বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। আমরা দেখি মানুষের মাঝে যৌন উত্তেজনা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তারা জানোয়ারের থেকে যৌন কাজে অনেক দুর্বল।

আর যখন আমরা লক্ষ্য করি যে নারীরা যৌন আকর্ষনের সাথে সাথে লজ্জা, ঢেকে রাখা ও নিজেকে আড়ালে রাখা ইত্যাদি স্বভাব দ্বারা গঠিত তখন এসব থেকে এটা বুঝা যায় যে,, যৌন উত্তেজনা ও আকর্ষন সৃষ্টির মূল লক্ষ্য হল স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী করা। যা শুধু শারীরিক যৌন কাজের জন্য নয়। এটাকেই পবিত্র কোরআন কখনো (সাকান) প্রশান্তি, কখনো (মাওদ্দা ও রাহমাহ) ভালবাসা ও রহমত ইত্যাদি রুপে আখ্যায়িত করেছে। এটা মনস্তাত্বিক দিক থেকে...ব আশা করি আমার কথা তোমার কাছে স্পষ্ট।

মাইকেলঃ মোটামুটি স্পষ্ট।

রাশেদঃ আর জীবতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলব, গবেষনায় দেখা গেছে যে, নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষ হতে ব্যতিক্রম। বহির্গত গঠন থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ ধরন ও গঠন, শরীরের অনু পরমানু ও কোষ ইত্যাদি। নারীর শরীরের কোষগুলো নারীত্ব স্বভবমন্ডিত, তার শরীরের গঠন, ও তার পেশীবহুল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরুষের থেকে আলাদা। নারীর শরীরের গঠন প্রনালী সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের জন্য উপযোগী করে বানানো হয়েছে। অর্থাৎ মার্তৃত্বের সব ধরনের উপাদান দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারা হায়েজের সম্মুখীন হন, প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে, বরং তাদের মানসিকতা , মেজাজ ও চিন্তার মধ্যেও প্রভাব ফেলে। এছাড়াও তাদের গর্ভধারণ, নেফাস ও সন্তানদের দুদ্ধপান করানোর কথা না হয় না-ই উল্লেখ করলাম।

বরং নারীর হরমোন ও মানষিকতা পুরুষের থেকে আলাদা। পুরুষের অগ্রগামীতা ও কঠোরতার বিপরীতে নারীর রয়েছে লজ্জাশীলতা ও কোমলতা।

অন্য দিকে, মানব সন্তান লালিত-পালিত হওয়ার জন্য জন্য কয়েক বছর পর্যন্ত বাবা-মায়ের প্রয়োজন যা অন্যান্য প্রাণীর জন্য দরকার হয়না। কেননা মানব সন্তান ধীরে ধীরে বড় হয়, ও আস্তে আস্তে নিজে চলা শিখে। তাই নারী-পুরুষের সম্পর্ক শুধু উভয়ে যৌনতৃপ্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ না হয়ে জীবনে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এজন্যই অন্য সব প্রাণীর তুলনায় মানুষকে সন্তানের প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালবাসা দান করা হয়েছে।

মাইকেলঃ এরপরে?

রাশেদঃ এসব থেকে সংক্ষেপে এটাই বোঝা যায় যে,, পরিবার হল মানব সমাজের স্বভাবগত সামাজিক কাঠামো। এ কাঠামো বা ইউনিটে আমরা প্রত্যেকের ভূমিকাস্পষ্ট করে নিতে পারি; এমন ভূমিকা যা পরিবারের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি তথা প্রশান্তি,ভালোবাসা ও দয়া এবং প্রত্যেকের সামর্থের সাথে উপযুক্ত ও মানানসই হয়।,

মাইকেলঃ তুমি যা বুঝাতে চেয়েছ তা আমি বুঝেছি। তাহলে নারীর ভূমিকা হল ভালবাসার শক্তিকে প্রসার করা, পরিবারে আত্মিক প্রশান্তি বাস্তবায়ন করা ও স্বামী-সন্তানের দেখাশুনা করা।

রাশেদঃ ঠিক ধরেছ, আর পুরুষের ভূমিকা হল, পারিবারিক জীবনের সব ধরনের প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগান দেয়া এবং কঠিন ও কষ্টকর পরিস্থিতিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া।

মাইকেলঃ কিন্তু এ দৃষ্টিতে তো আমরা সমাজের অর্ধেকসৃজনশক্তি হারাব।

রাশেদঃ বরং তার উল্টো। এ দৃষ্টিকোন দ্বারা আমরা সমাজের সবার দ্বারা পূর্ন লাভবান হব।, তবে প্রত্যেকের দ্বারা তার স্ব-স্ব কর্মক্ষত্রে ও পরিবেশে। নারীরা যখন তাদের স্বভাবজাত কাজগুলো ফেলে কর্মক্ষত্রে পুরুষের সাথে ভীড় করে, তখন তার কাযে কৃতকার্য হতে পারেনা, এটা তার পরিবার ও স্বামীর অধিকারেও মন্দ প্রভাব ফেলে, ফলে সমাজের সর্বস্তরে তার মন্দ প্রভাবটি পড়ে। নারীরা বহুবার বাহিরের কাজ ওঘরের কাজ এবং সন্তান পালন ইত্যাদির মাঝে সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। কেননা তখন তাকে একজন শান্ত স্ত্রী, ভালবাসায় পূর্ণ মা আবার কর্মঠ নারী হতে হয়, এতোগুলো কাজ একজনের দ্বারা কিভাবে সম্ভব? ফলে দেখা যায় যে, তার স্থানে অন্য একজনকে সে কাজ করতে হয়। কিন্তু অন্যজন তার মত বিশ্বস্ততার সাথে যথোপযুক্তভাবে তা করতে পারেনা।

আরো সংযোগ করলে বলতে পারি যে, নারীরা ঘরের বাহিরে পুরুষের সাথে কর্মক্ষেত্রে ভীড় করার ফলে তারা ইভটিজিং, ধর্ষণ, বিভিন্ন অপরাধ ও অপমানের সম্মুখীন হয়।

মাইকেলঃ আমরা যখন নারীর পারিবারিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলাম তখন এটা আমাদেরকে অন্য একটি বিষয়ের কথা স্মরন করিয়ে দেয়।আর আমার মনে হয় সে ব্যাপারে পুরুষকে নারীর উপর আলাদা বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে। সে বিষয়টি হলঃ নারীর উপর পুরুষের অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব।

রাশেদঃ অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব দ্বারা পুরুষকে নারীর উপর আলাদা বৈশিষ্ট দেয়া হয়নি। বরং এটা একটা সামাজিক সংস্থার নিয়ম কানুন মাত্র, যাকে আমরা পরিবার বলি। যে কোন সংস্থায় প্রত্যেকে সদস্যের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে যা সদস্যদের যোগ্যতা, দক্ষতা হিসেবে বন্টন করা হয়ে থাকে। তাই যোগ্যতা অধিক হওয়ার ফলে পরিচালক হিসাবরক্ষক বা অন্য কোন কর্মচারীর চেয়ে উত্তম সম্মানিত ব্যক্তি নয়, বরং তিনি শুধু একজন পরিচালক মাত্র।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা এটা দেখতে পাই। যেমনঃ কোন সংস্থা বা কোম্পানি তাদের কোম্পানি পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম-কানুন করে থাকেন, যা কিছু করণীয় ও কিছু বর্জনীয়। অফিসিয়াল সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য যেমনঃ নির্দিষ্ট পোশাক পরিধানের নিয়ম, নিরাপত্তা-জনিত নিয়ম মানা, কখনো শারীরিক কসরত বাধ্যতা করা হয়, অথবা অফিস থেকে বিনা অনুমতিতে বের হওয়া নিষেধ করা হয়, বা অন্য কারো সাথে কাজ ছাড়া অন্য কাজ করতে মানা করা হয়। বরং কোন কোন কোম্পানিতে দেখা যায় কাজ ছেড়ে দেয়ার পর ও কর্মচারীর উপর কিছু শর্ত আরোপিত থাকে। এসব শর্তাবলী সকলের কাছেই পরিচিত, কেউই এটা অস্বীকার করতে পারেনা। কেউ একথাও বলেনা যে, এ সব শর্তাবলী মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে ও কর্মচারীকে জোরপুর্বক বাধ্য হয়ে কাজ করতে হয়। সবাই জানে এ সব স্পষ্ট নিয়ম-কানুন, যা সকলের নিকটই পরিচিত। এমনিভাবে এমন কোন সফল কোম্পানি পাওয়া যাবেনা যেখানে কোন দক্ষ পরিচালক নেই যার কিছু উপযুক্ত ক্ষমতা,দায়িত্ব-কর্তব্য ও জবাবদিহীতা থাকেনা।

এভাবে, পারিবারিক সংস্থাটির সফলতার জন্যও নিয়ম-কানুন আবশ্যক যা সকলে মেনে চলবে। এ সব নিয়মের মাঝে কিছু থাকবে করণীয় আবার কিছু বর্জনীয়। সেখানে একজন নেতা বা পরিচালকেরদরকার, যার কাছে দায়িত্বের উপযুক্ত কিছু ক্ষমতা থাকবে এবংতার থাকবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা। তবে অবশ্যই এসব নিয়ম নীতি বাস্তবায়ন হবে পারিবারিক জীবনের মূলতন্ত্রের উপর,যা আমরা আলোচনা করেছি। আর তা হলো প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, ও দয়া-মায়া।

মাইকেলঃ যদি ব্যপারটা এমনই হয়, তবে পরিচালনার দায়িত্ব পুরুষের কেন? নারী কি পরিবারের পরিচালক হতে পারেনা? এতে কি সে সমান অধিকার হতে বঞ্চিত নয়?

রাশেদঃ সমান অধিকার শব্দটির পরিবর্তে যদি ন্যায়বিচার শব্দ ব্যবহার কর তবে অধিক উত্তম। তবে আমি বলব, অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা বা ন্যায়বিচার হয়ে থাকে। আর আমরা এখানে প্রত্যেকের ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী তার সামাজিক ভুমিকা ও কাজের ব্যাপারে আলোচনা করছি।

পারিবারিক সংস্থার ক্ষেত্রে আমরা বলেছিঃ নারী পুরুষ প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ধরন, গঠন ও যোগ্যতা রয়েছে। এ সব যোগ্যতা ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক কাজের জন্য উপযুক্ত। তোমার একথা মনে রাখতে হবে যে, পুরুষের পরিচালনার কারনে তাকে অনেক কষ্ট ও দায়িত্ব পালন করতে হয়, যা নারীর করতে হয়না। এ হিসেবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তার দায়িত্বের পরিমান সম্মানিত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। এতে বিশেষ দায়িত্বভার তার উপরে বর্তায়; যা পালন করতে গিয়ে অনেক দূরদর্শিতা, ধৈর্যের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া না করার দক্ষতার প্রয়োজন হয়। তবে এর অর্থ এ নয় যে, মহিলাদের মতামত ও তাদের ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষাও করা হবে; বরং তাদের মতামতও গ্রহণ করা হবে।

নারীরা এসব সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়। কেননা, নারীরা হল যেমন রাসুল সাঃ বলেছেনঃ “জ্ঞান ও দ্বীনে অসম্পুর্ণ”।

মাইকেলঃ তারা অসম্পুর্ণ জ্ঞানের অধিকারী?! এ দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে অপমানিত করে। কেননা নারীদের দক্ষতা ও জ্ঞানশক্তি অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রমাণিত হয়েছে, তারা বুদ্ধির পরীক্ষায় পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

রাশেদ (হেসে হেসে)ঃ বন্ধু,আশ্চর্যের বিষয় হল যাদেরই সাথে এ হাদিস নিয়ে আলোচনা করেছি তারা সকলেই তোমার মত করেই বুঝেছে। হে বন্ধু, এখানে আকল দ্বারা শুধু বুদ্ধিমত্তা উদ্দেশ্য নয়, বরং আকল বা জ্ঞান হলঃ নিজেকে সংযত রেখে এবং আবেগকে নিয়ন্ত্রন করে সঙ্কট ও সমালোচনামুখর পরিস্থিতিতে প্রত্যেক বস্তর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য জেনে সে অনুযায়ী হুকুম দেয়ার ক্ষমতা, সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা।

অন্য কথায় বললেঃ আবেগ ও প্রবৃত্তির বিপরীতটা হল আকল বা জ্ঞান। একথা কেউই অস্বীকার করেনা যে, নারীরা প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের চেয়ে বেশি আবেগী এবং আবেগ দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়। এটা তাদের মানুষিক প্রকৃতি। তাদের সামাজিক দায়িত্বগুলোও তাদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া দরকার। এ কারনেই হয়ত তালাকের মাধ্যমে পারিবারিক কাঠামো শেষ করে দেয়ার ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতাকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

মাইকেলঃ আমরা যখন নারীর উপর জুলুম ও অধঃদৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনা করলাম, এখন আমাদেরকে উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা উচিত। নারীরা কেন পুরুষের চেয়ে অর্ধেক মীরাস বা সম্পত্তি পায়?!

রাশেদঃ প্রথমতঃ নারীরা সব অবস্থাতে পুরুষের চেয়ে অর্ধেক সম্পত্তি পায়না।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের সম্মান বা মর্যাদা কাউকে বেশি কম দেয়ার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। ন্যায়ভাবে বলতে গেলে সব অবস্থায় উভয়কে সম্পত্তির সমান ভাগ দেয়া ন্যায়বিচার নয়। কিন্তু অবস্থা ও পরিস্থিতি যখন এক হয় তখনই সমতা আবশ্যক।অর্থাৎ আমাদেরকে নারীর প্রকৃতি, জীবনসংসারে তার ভূমিকা ও দায়িত্ব -কর্তব্য এবং তার কর্তব্যের সাথে অধিকারের সামঞ্জস্যতা ইত্যাদি বিবেচনা করা উচিত।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীরা যা পায় তার সবটা তার নিজেরই থেকে যায়। অন্যদিকে পুরুষেরা উত্তরাধিকার যা পায় তা তার নিজের জন্য, স্ত্রী-সন্তানের জন্য এবং তার অবিবাহিত ভাই-বোন, ও পিতামাতা যদি জীবিত থাকে তাদের সকলের জন্য ব্যয় করে। এ ছাড়াও সে স্ত্রীর জন্য উপহার স্বরূপ মোহর প্রদান করে থাকে, তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব, ব্যয়-ভার, তার সন্তনের যাবতীয় ব্যয়-ভার গ্রহণ করে থাকে। সে তার স্ত্রীকে কাজ করার জন্য জোর করতে পারবেনা, কেননা স্ত্রীর সম্পদের উপর স্বামীর কোন অধিকার নেই। আরো বলতে গেলে, স্ত্রী তার সম্পদ যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে। পশ্চিমা সমাজের বহু নারী এ মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি, যতই তারা নারীর অধিকারের কথা মুখে আওড়ায়।

এ ব্যাপারে কি আর কিছু আলোচনার বাকি আছে?

মাইকেলঃ হ্যাঁ, তালাকের বিষয়টা বাকি আছে, তবে এর আগে আমি মনে করি একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার।

চিড়ধরা ভেঙে ফেলা



চিড়ধরা ভেঙে ফেলা

একটু বিশ্রামের পর দু'বন্ধু আবার তাদের আসনে পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বসল। মাইকেল কথা শুরু করলঃ

আমরা লক্ষ্য করলে দেখি সাধারণভাবে ইসলামী সমাজে তালাক ব্যাপক হারে প্রচলিত আছে, ইসলাম এটাকে বৈধতা দেয়ার কারনে এ সব তালাক হয়ে থাকে।

রাশেদঃ প্রথমতঃ ইসলামই সর্বপ্রথম তালাক প্রথা চালু করেনি, যাতে এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ইসলামের উপর বর্তাবে। ইসলামের পূর্বে এ পৃথিবীতে তালাক প্রথা ব্যাপকহারে চালু ছিল। পুরুষ রাগ হলেই ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে নারীকে বিতাড়িত করে দিত, এতে নারীর কোন অধিকার বা ক্ষতিপূরণ ছিলনা।

যখন গ্রিক সভ্যতা উন্নীত হল তখনো সেখানে কোন নিয়ম-কানুন ও শর্ত ছাড়াই তালাক প্রথা ব্যাপক হারে চালু ছিল। আর ইহুদী ধর্মে তালাক জায়েযএবং এটা শুধুমাত্র পুরুষের অধিকার ও ইচ্ছায় হয়। এমনকি সে কোন কারন ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, যদিও তারা মনে করেন যে, কারন বশতঃ তালাক দেয়া উত্তম। তালাকের ক্ষেত্রে তাদের মধ আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়, তা হলোঃ কোন নারীর তালাক হলে সে তার প্রথম স্বামীর কাছে আর আসতে পারবেনা।

দ্বিতীয়তঃ আসলেই কি তালাক ইসলামী সমাজে ব্যাপক হারে প্রচলিত যাতে আমরা বলতে পারি ইসলাম তালাকের অনুমতি দেয়ার কারনে এসব হচ্ছে? বিশ্বের কিছু পরিসংখ্যানের তুলনা করলে এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১৯৯২ ও ১৯৯৫ সালের হিসেব মতে, আমেরিকাতে গড়ে প্রত্যেক (১০০০) বিবাহের মাঝে বছরে তালাকের পরিমান (৫০২) জন, এর প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারনেই আমেরিকার কর্তৃপক্ষ তালাকের পরিমানের হার প্রকাশ করেনা, যদিও তারা ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিবাহের পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে।

রাশিয়াতে ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (৭৫০) টির তালাক হয়েছে।

সুইডেনে গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (৫৩৯) টির তালাক হয়।

২০০০-২০০৩ সালের পরিসংখ্যান মতে, বৃটেনে গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (৫৩৮) টির তালাক হয়।

২০০০-২০০৩ সালের পরিসংখ্যান মতে, জাপানে গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (৩৬৬) টির তালাক হয়।

এবার যদি আমরা ইসলামী সমাজে দেখি তবে দেখব সবচেয়ে বেশি তালাক হয় কুয়েতে, যা ২০০০-২০০৪ সালের পরিসংখ্যান মতে, কুয়েতে গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (৩৪৭) টির তালাক হয়েছে।

আর অন্যান্য মুসলিম দেশে এর পরিমান অনেক কম। যেমনঃ জর্দানে ২০০০-২০০৪ সালের পরিসংখ্যান মতে, গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (১৮৪) টির তালাক হয়েছে।

ফিলিস্তিনে গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (১৪২) টির তালাক হয়েছে।

মিশরে, ২০০০-২০০৩ সালের পরিসংখ্যান মতে, গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (১৩৪) টির তালাক হয়েছে।

সিরিয়ায়, ২০০০-২০০২ সালের পরিসংখ্যান মতে, গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (৮৪) টির তালাক হয়েছে।

লিবিয়ায়ে, ২০০০-২০০৪ সালের পরিসংখ্যান মতে, গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (৫১) টির তালাক হয়েছে।

ইরানে, ২০০২-২০০৩ সালের পরিসংখ্যান মতে, গড় প্রতি (১০০০) বিবাহের মধ্যে (৯৭) টির তালাক হয়েছে।

তাহলে কি এখনো বলবা যে, তালাক ইসলামী সমাজে ব্যাপকহারে প্রচলিত? আর এর কারন হলো ইসলাম তালাকের বৈধতা দিয়েছে?!

মাইকেলঃ কিন্তু এটাতো ঠিক যে, অন্যান্য ধর্ম ও রীতির তুলনায় ইসলাম খুব সহজে তালাক দেয়ার অনুমতি দিয়েছে।

রাশেদঃ তোমার এ মন্তব্য বিশ্লেষণে অনেক কথার প্রয়োজন আছে, আমাকে যদি অনুমতি দাও তবে বলতে পারি।

মাইকেলঃ শুরু কর।

রাশেদঃ প্রথম বিষয়ঃ ইসলাম খুব সহজে তালাকের অনুমতি দিয়েছে এ বিশ্বাসের ব্যাপারে বলছি, আসমানী কোন আইন বা সামাজিক কোন আইনই তালাককে উৎসাহিত করেনা... তোমার সাথে আমি স্বীকার করব যে, কিছু কিছু লোক এ ব্যাপারটাকে সহজ সরল মনে করে অলসতা করে, যারা ইসলামের শিক্ষাকে বাস্তবায়ন না করে এর অপব্যবহার করে থাকে। এর সাথে সাথে আমাদেরকে একথা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, ইসলাম এ ধরনের অপবাদ থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত। ইসলাম তালাকের ব্যাপারে একটা সীমা নির্ধারন করে দিয়েছে, কতিপয় নিয়ম নীতি প্রনয়ণ করেছে যাতে এর খারাপ প্রভাব কম হয়। সমাজে যা হচ্ছে তা ইসলামের সঠিক রীতি-নীতি পালন না করার কারনে।

মাইকেলঃ তুমি কি অরেকটু বিশ্লেষণ করে বলবে?

রাশেদঃ ইসলামে বিবাহ হল চিরস্থায়ী বন্ধন, কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হারাম। এর অর্থ হলঃ স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক জীবন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে। বিবাহ বন্ধনকে কঠিন অঙ্গিকার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে রয়েছে সম্মানবোধ ও বিচ্ছেদের ভাবনা থেকে বিরত থাকার গ্যারান্টি। এ ছাড়া ইসলামে তালাক জঘন্যতম একটা হালাল কাজ যা খুব প্রয়োজনের সময় বৈধ বলা হয়েছে। যখন নিরুপায় হয়ে যাবে, তখন ইসলাম নির্দেশ দেয় দেয়, পরস্পর ইসলাহ ও

সমঝোতার সর্বাত্তক চেষ্টা করা, উভয় পক্ষ থেকে লোক নিয়োগ করে চেষ্টা অব্যহত রাখা, উভয়ের মাঝে প্রীতি ও সম্মান বজায় রেখে পারিবারিক সম্পর্ক টিকে রাখার সব ধরনের ব্যবস্থা করা।

ইসলাম স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে রেখে দিতে বলেছে, যদি তার স্বামী তার কোন দোষের কারনে অপছন্দ করে, তাহলে তাকে তার অনেক ভাল ভাল গুনের দিকে লক্ষ্য করতে নির্দেশ দিয়েছে, যার কারনে সে তাকে তালাক না দিয়ে বিবাহ টিকিয়ে রাখতে পারে, এতে বৈবাহিক জীবনের পবিত্র সম্পর্ক রক্ষা হবে। হাসি-তামাশাচ্ছলে তালাকের শব্দ ব্যাবহার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এমনিভাবে স্ত্রীর সাথে স্বামীকে তার মন মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে চলতে আদেশ দিয়েছে।

স্বামী- স্ত্রী যখন দু'পক্ষের সমঝোতায় সর্বাত্তক চেষ্টার পরেও তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবেনা তখন তালাককে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করতে আদেশ করেছে, যাতে আবার তারা বৈবাহিক জীবনে ফিরে যেতে পারে। একসাথেই বৈবাহিক জীবনের অবসান করিনি, বরং তিন বার করে তালাকের ব্যবস্থা রেখেছে। স্বামী প্রত্যেকবার তালাকের পরে আবার তার স্ত্রীকে ফিরে আনতে সক্ষম , এমনকি তৃতীয়বারও ফিরে আনার ব্যবস্থা আছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ হতে হবে ও সে তালাক দিলে উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে আসতে পারবে।

মাইকেলঃ এটা প্রথম বিষয়, এর পরেরটা কি?

রাশেদঃ অন্য বিষয়টি হলো যে, তালাকের ব্যাপারে অমুসলিম সমাজে মানুষের মারাত্মক ভুল চিন্তা-ভাবনা। সেখানে সামান্য কারনেই তালাক হতে পারে, যা তুমি জান। যেমনঃ আমেরিকাতে বিচারকার্য ঘটনা বিবরণীতে দেখা গেছে যে, স্ত্রীর কম্পিউটারের আসক্তি, কোন প্রোগ্রাম বা টেলিভিশনে খেলা দেখা ইত্যাদি সামান্য কারনে তালাক হয়ে থাকে। কানাডায় ঘুমের মধ্যে নাক ডাকলে তাৎক্ষনিক তালাক দিয়ে দেয়। ইটালিতে যখন কেউ গৃহের কাজে কাউকে বাধ্য করে তখন তালাক দিয়ে দেয়। বৃটেনে স্বামীর ব্যাপারে একটু অবহেলা ঘটলে- যেমন স্বামীর কোন স্মারক বস্তু হারিয়ে ফেললে- বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

আর জাপানে কোর্ট এমন রায় দিয়েছে যে, যদি একজনের ঘুমের ধরন অন্যজনের পছন্দ না হয় তবে তালাক চাইতে পারবে।

মাইকেলঃ তুমি যা উল্লেখ করেছে তা সবই ঠিক। কিন্ত এসব হলো দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়া ধর্মহীন সমাজের বাস্তব অবস্থা। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মে তালাকের ক্ষেত্রে এমন কিছু শর্তাবলী আরোপ করা হয়েছে যা প্রমাণ করাও দুরুহ ব্যাপার, আর এসব শর্ত ব্যতিত তালাককে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

রাশেদঃ আমি মনে করি এ কঠোরতা মানুষের প্রকৃতির বিরোধীএবং এটা মানুষের জীবনের সাথে উপযোগীও নয়। তোমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যখন দেখবে, যেসব খৃষ্টানলোক ইসলামী দেশে বসবাস করে তারা দু'টো ধর্মের পার্থক্যটা ভালকরে বুঝতে পেরে তাদের কেউ কেউ ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেছে; শুধু এ কারনে যে, যখন তারা দেখেছে সামাজিক জীবনে তারা বিচ্ছেদ হতে পারছেনা, আবার এর কোন সমাধানও তারা তাদের ধর্মে খুঁজে পাচ্ছেনা।

এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম বিবাহের বন্ধনকে চিরস্থায়ীভাবে আবদ্ধ করে, কেননা ইহা এ পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের জীবন বিধান। যাদের রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, মানবিক গুনাবলী, পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা পরিবর্তনশীল। এছাড়াও স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনে কখনো কখনো ভুলও হয়ে থাকে, কেননা এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া জানা যায়না। এ সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখেছে যাতে এসব ভুলের কারনে বড় ধরনের ভুল না হয়, যা কখনো কখনো সামাজিক , মানসিক ও শারীরিক মারক ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়ায়।এজন্য যখন এ সব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে, সব সমাধানের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে, ইসলাম তখন তালাকের বিধানের প্রবর্তন করেছে। এতে প্রমাণিত যে, ইসলাম বাস্তবধর্মী ধর্ম, নারী পুরুষসহ পরিবারের সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করেছে। পরিবারের সব সদস্যদেরকে মতপার্থক্য এবং অনৈক্যের আগুনে না জ্বালিয়ে উত্তম হলো এ সম্পর্ককে ইতি টেনে নতুন করে জীবন শুরু করাই ভালো, যেখানে বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকবে, আর তা হলোঃ ভালবাসা ও রহমতের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা, আর এভাবে একটি সুন্দর পরিবার গঠন করা। তাই ইসলামে তালাক হলো একটি চিকিৎসা, সুষ্ঠ পদ্ধতি, পরিবর্তনের সুযোগ, একটি সফল সুন্দর জীবন গঠনের সুযোগ করে দেয়া।

আমি মনে করি,ইসলাম যে উপরে বর্ণিত নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে তালাকের বিধান প্রবর্তন করেছে, তা ইসলামের উদারতা ও বাস্তবমুখী হওয়ার প্রমাণ।

মাইকেলঃ কিন্তু, ইসলাম তালাককে কেন শুধু পুরুষের অধিকার করেছে? এতে কি নারীর উপর জুলুম করা হয়নি?

রাশেদঃ আমি আবারো বলছি, আমাদেরকে এ বিষয়টা নিয়ে সর্বদিক বিবেচনা করে গভীরভাবে ভাবতে হবে।অর্থাৎ পূর্নাঙ্গ সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ভাবতে হবে। প্রথমতঃ বিবাহ, এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এরপর পরিবারের অর্থ, এর মাঝে সব সদস্যদেরভূমিকা, সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার ইত্যাদির দিকে নিজর দিতে হবে।

এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী আবেগপ্রণ ও অধিক দ্রুত উত্তেজিত ও পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে পুরুষেরা অনেকটা সচেতন ও পরিনাম বিশ্লেষনে বেশি সাবধান, নিজেদের মেজাজ, রাগ ও আবেগ, উত্তেজনা ইত্যাদি দমনে বেশি সক্ষম।

এছাড়া ইসলামে তালাকের কারনে পুরুষেরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যেহেতু তালাকের পর তার ভরন পোষণ ও মোহরের দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর থাকে। এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, পুরুষের এসব অতিরিক্ত দায়-দায়িত্বের কারনে সে নিজেকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখবে, যাতে তালাক না হয়।

এতদসত্বেও ইসলাম তালাককে শুধু পুরুষের অধিকারের মাঝে সীমাবদ্ধ করেনি, বরং নারীর জন্যও বিবাহ বিচ্ছেদের পথ খুলে রেখেছে; যখন সে এর উপযোগী কারণ দেখবে। এটাই হচ্ছে 'খুলা', যা সম্পন্ন হবে সকলের অধিকার সংরক্ষনকারী শরিয়তের কতিপয় বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে।

বন্ধু, তোমাদের দেশের নারীদের অবস্থা সম্পর্কে কি কিছু আলোচনা করব?!

মাইকেলঃ আমার মনে হয় দুপুরের খাবার খাওয়া উচিত।

স্বাধীনতার পর নারী



স্বাধীনতার পর নারী

রাশেদ ও মাইকেল দুপুরের খাবার শেষ করল... রাশেদ চোখ উপরে উঠিয়ে বলা শুরু করলঃ

প্রিয় মাইকেল! তুমি আমার দিকে সমালোচনার অনেকগুলো তীর নিক্ষেপ করেছ, আমাদের সভ্যতাকে একটা অপবাদের খাঁচায় বেঁধে রেখেছ।

মাইকেলঃ আসলে আমি তোমাকে সমালোচনার তীর নিক্ষেপ করিনি, তোমাকে কোন অপবাদও দেইনি হে দোস্ত! এটা শুধুমাত্র আলোচনা-পর্যালোচনা যাতে আমরা সঠিক একটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। আমি মনে করি আমরা এ আলোচনার মাধ্যমে সে লক্ষ্যে অনেক খানি পথ পাড়ি দিয়েছি। সাথে সাথে অনেক কিছু আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি তোমার প্রশস্ত হৃদয় ও সুবিশাল মনের পরিচয় পেয়েছি। আমার আগের কোন কথায় কি তুমি বিরক্ত হয়েছ?

রাশেদঃ না, না, বিরক্ত হইনি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হলো, বিষয়টি পূর্ন স্পষ্ট করার জন্য এর সব দিক নিয়ে আলোচনা করা উচিত। আর পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করতে গেলে আমাদের ও তোমাদের সমাজের নারীদের অবস্থান নিয়ে তুলনা করা দরকার। আমি মনে করি আমার আগের আলোচনা দ্বারা ইসলামী সমাজের নারীদের অবস্থা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। এখন তোমাদের সমাজের নারীদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা বাকি রইল।

মাইকেল (হেসে হেসে)ঃ এই যে আমি সমালোচনার তীর গ্রহণ করতে আমার বুক খুলে দিলাম, আর আমার খাঁচার দরজা খোলা রইল।

রাশেদ (মুচকি হেসে)ঃ কেন আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সাংঘর্ষিক অবস্থানের ঠেলে দিচ্ছি? আমি তো আগেই বলেছি যে,আমাদের মাঝে যা আছে তা হলো, পারস্পরিক সংলাপ ও সহযোগীতার সম্পর্ক;এর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো সঠিক ও বাস্তবতায় উপনীত হওয়া।

মাইকেলঃ তোমার সাথে পূর্নএকমত। তাহলে কোথা থেকে শুরু করব?

রাশেদঃ আমি মনে করি আমাদেরকে সমাজ-সভ্যতার আলোকে নারীর মর্যাদা কি তা নিয়ে আলোচনা প্রথমে শুরু করা যায়।

মাইকেলঃ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত,তাদের সাথে আচরনের ধরণ ইত্যাদি ভিন্ন হয়ে থাকে ব্যক্তির বেড়ে উঠা, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি ভেদে। তাই এ ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদার বিষয়টি কোন কিতাব বা রেফারেন্স বইয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

রাশেদঃ এটা ঠিক, কিন্তু যেসব মৌলিক উৎসসমূহ ব্যাক্তির সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ গঠন করে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাব ফেলে সেসব তো আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। আমি এসব মৌলিক উৎসসমূহ দ্বারা শুধু কিতাব বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসই বুঝাচ্ছিনা। বরং ঐ ধরনের সকল উৎসই উদ্দেশ্য যা ব্যাক্তির চেতনা ও সংস্কৃতি গঠনে প্রভাব ফেলে; তাই এসব কখনো প্রচলিতকাহিনীবা পৌরাণিক কাহিনী হতে পারে, আবার কখনো প্রবাদ ও বিজ্ঞকথা হতে পারে যা চেতনাহীন সমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র চেতনাকে জাগ্রত করে। এ অর্থে উক্ত উৎসসমূহ ব্যাক্তির বেড়ে উঠা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

মাইকেলঃ আমি মনে করি আসমানী কিতাবসমূহে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা অনেকটাই অভিন্ন। এ ক্ষেত্রে তোমাদের কোরআনের সাথে আমাদের পবিত্র গ্রন্থের অনেকটাই মিল আছে। এসব দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে অন্যতম হলোঃ নারীর সৃষ্টির ধরণ, সে পুরুষের থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তার কারনেই মানুষের প্রথম ভুল এবং জান্নাত থেকে বের হওয়া, তার সামাজিক অবস্থান ও দায়-দায়িত্ব।

রাশেদঃ তোমার কথার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি; প্রথম ভুল ও আদম ও হাওয়া আঃ কে জান্নাত থেকে বের করার বিষয়টি তোমাদের কিতাব থেকে আমাদের কিতাবে আলাদাভাবে এসেছে। কোরআন হযরত হাওয়া আঃ কে হযরত আদম আঃ এর জন্য শয়তানের প্ররোচনার জন্য দায়ী করেনি। ফলে জান্নাত থেকে বের হওয়ার জন্য নারীকে দায়ী করা যাবেনা।

আর তোমাদের পবিত্র গ্রন্থে নারীর মর্যাদা ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে,, কন্যা সন্তানের জন্ম মায়েদের অপবিত্রতাকে বৃদ্ধি করে দেয়!

ইঞ্জিলে এসেছেঃ "যখন নারী গর্ভবতী হয় ও পুত্র সন্তান জন্ম দেয় তখন সে সাত দিন অপবিত্র থাকে, যেমনিভাবে মাসিকের দিনগুলোতে সে অপবিত্র থাকে, অতঃপর পবিত্র রক্ত আসতে তেত্রিশ দিন হিসেব করা হবে। আর যদি কন্যা সন্তান জন্ম দেয় তবে সে দুইসপ্তাহ অপবিত্র থাকে, যেমনি ভাবে মাসিকের সময় অপবিত্র থাকে, অতঃপর পবিত্র রক্ত আসতে ছিষট্রি দিন গণনা করতে হবে"।

নারীর সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে খৃষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি হলোঃ নারীরা গীর্যার ভিতরে মুখ খুলতে পারবেনা।

নিউ টেস্টামেন্টে প্রথম করিন্থিয়ান্স বলেছেনঃ গীর্যায় তোমাদের নারীরা যেন চুপ থাকে, কেননা তাদেরকে সেখানে কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়নি, বরং তারা নিচু ও নম্র হয়ে থাকবে যেভাবে ফেরেশতারা থাকে। তবে যদি তারা কিছু শিখতে চায় গৃহে পুরুষদেরকে যেন জিজ্ঞেস করে নেয়, কেননা গীর্যায় নারীদের কথা বলা খুবই জঘন্য কাজ"। এসবের কিছুই কোরআনে নেই।

মাইকেলঃ প্রকৃত পক্ষে আমাদের সমাজে যে উন্নতি ঘটেছে তা বুঝতে হলে তার মধ্যে যে গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির মিশ্রন ঘটেছে সে সংস্কৃতিগুলোকেও বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে প্রটিসট্যান্টদের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব, ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের চিন্তা-ভাবনার ফলাফল, ফান্সের নবজাগরণের প্রভাব, শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজের পরিবর্তন ইত্যাদির দিকে খেয়াল না করলে আমাদের উন্নতি বুঝা যাবেনা।

রাশেদঃ তুমি গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির কথা বলেছ, সে যুগের সভ্যতা ও ইতিহাস দেখলে বুঝবে যে, নারীদের ব্যাপারে তাদের অনেক অধ:পতন রয়েছে।

গ্রিক সভ্যতায় যখন নারী নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখবে যে, সে যুগে নারীরা সব ধরনের স্বাধীনতা, ইচ্ছা ও সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা নারীদের মর্যাদাকে উড়িয়ে দিত, তাদেরকে জন্তু জানোয়ারের মত বেচা-কেনার প্রাণী মনে করত। তাদেরকে বেচা-কেনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করত, আইনীভাবে তাদের পৌত্রিক সম্পত্তির অধিকার ছিলনা। গ্রিক সভ্যতা যখন ধীরে ধীরে উন্নতি হল, তখন নারীদের অবস্থারও মৌলিক ও পরিবর্তন ঘটল, ফলে তারা বিভিন্ন ক্লাবে আসা যাওয়া শুরু করল ও পুরুষের সাথে মেলা মেশার সুযোগ পেল, এতে যেনা ব্যবিচার বেড়ে গেল। পতিতাদের গৃহগুলো তখন রাজনীতি ও সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিনত হল। শিল্প-সাহিত্যের নামে উলঙ্গ নারীদের মূর্তি গ্রহণ করা হত।

সামান্য পার্থক্য ছাড়া রোমান সভ্যতায় নারীর প্রকৃত অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল। তারা নারীকে পুরুষের তুলনায় নীচু মনে করত, তাদের সাথে যথেচ্ছা ব্যবহার করত। রোমান আইনে নারীরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এরপরে নারীদের ব্যাপারে রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। এখনো তাদের এ পরিবর্তন পরিবার, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি আইনে দেখা যায়। এর ফলে অবস্থা পুরো উলটে যায়, ফলে বিবাহের কোন অর্থই তাদের কাছে আর বাকী রইলনা, এবং নারীদেরকে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ও মালিকানায় অধিকার দেয়া হয়েছে।এরপরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এলো যা কোন বৈধ বন্ধন ছাড়াই হতো।

মাইকেলঃ তোমার সাথে আরো যোগ করে বলবঃ ইউরোপ যখন খৃষ্টান ধর্মে প্রবেশ করেছ তখন সমষ্টিগতভাবে গীর্জার দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে গ্রিক ও রোমান সভ্যতার অনেক প্রভাব ঘটেছে।তখন নারীদের ব্যাপারে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত চলমান অবস্থা দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়েছে।

রাশেদঃ হ্যাঁ, যখন খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা রোমান সমাজের নারীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের ফেতনা ফাসাদ, যেনা,ব্যাভিচার ইত্যাদি দেখে দিশেহারা হল এবংসামাজিক ও চারিত্রিক চরম বিপর্যয় দেখল, তখন তারা ভাবল যে, এ সবের জন্য নারীরাই দোষী। তারা ঘোষণা করল যে, নারীরা শয়তানের দরজা, সৌন্দর্যের কারনে তাদেরকে লজ্জিত ও নীচু হয়ে থাকতে হবে, কেননা ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টিতে নারীরা হলো ইবলিসের অস্ত্র। এভাবে নারীদেরকে পশ্চিমারা মধ্যযুগ পর্যন্ত অপমানিত ও অধিকার বঞ্চিত করে রেখেছিল। এমনকি অশ্বচালনা যুগ পর্যন্ত চলল; যখনমনে করা হতো, নারীরা সামাজিক কিছু অধিকার পেয়েছে, তখনো স্বামীর অনুমতি ছাড়া তাদের অর্থনৈতিক কোন অধকার ছিলনা।

মাইকেলঃ কিন্তু বন্ধু, আমাদের আলোচনা কিইতিহাসের দিকে চলে যাচ্ছেনা?! আমরা এখান থেকে সরাসরি বর্তমান যে যুগে বসবাস করি সে যুগের পরিবর্তনের শুরুতে পৌঁছতে পারি, আর তা হলো রেনেসাঁ যুগ, এরপর ফরাসি বিপ্লব ও এর পরের অবস্থা।

রাশেদঃ এটা ইতিহাস নয়, বরং ঘটনার মূল থেকে অনুসন্ধান। আমি লক্ষ্য করছি, বাহ্যিক কিছু ভিন্নতা থাকলেও পশ্চিমা বিশ্বের নারীর বর্তমান অবস্থা ও ইতিহাসের সেসব অবস্থানের সাথে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।

তুমি কি এ সব ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের অধিকারের সাদৃশ্য খুঁজে পাওনা?!

মাইকেলঃ তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?

রাশেদঃ যেমনঃ নারীকে বিনোদন ও উপভোগের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা। পাশ্চাত্য সমাজের নারীরা যখন আইনের মাধ্যমে সব ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার পেল তখন আরেকটা বিষয় তারা আবিষ্কার করতে পারল যে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। যেমনঃ তালিকায় তারা পুরুষের অধিন্যস্ত, কিন্তু তাদের আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকবে। তারা স্বামীর ব্যক্তিত্বের সাথে আবদ্ধ থাকত, তাদের এ সব নিষেধাজ্ঞা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মাত্র সমাধান করা হয়েছে।

মাইকেলঃ কিন্তু অবশেষে নারীরা তাদের অধিকার পেয়েছে, সব ক্ষেত্রে তারা পুরুষের সমান, এমনকি বিভিন্ন চাকুরী ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও।

রাশেদঃ কিন্তু পাশ্চাত্যে এখনো নারীরা জুলুমের স্বীকার ও অধিকার বঞ্চিত,যদিও এসবের কিছু কিছু আইন ও সনদের মাধ্যমে দূর হয়েছে, তবে এখনো ব্যাপক হারে এসব চালু আছে, যদিও জুলুম ও জুলুমের কারন নামে মাত্র পরিবর্তন হয়েছে । এসব আন্দোলনের নামে পুরুষেরা নারীদের দ্বারা সম্পদ অর্জনের ফাঁদ পাতে, আনন্দ ও মজা নেয়ার জন্য আসর জমায়। তাদেরকে পন্য দ্রব্যে পরিণত করে বিভিন্ন স্থানে ক্রেতাদের মনোরঞ্জন করে, বিজ্ঞাপনওয়ালাদের সম্পদ অর্জনের একটা উসিলা বানায়। এটা নারীর জন্য চূড়ান্ত অপমান। এজন্য কয়েকটি দেশে নারীরা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে তাদেরকে ব্যাবহার না করার দাবীতে গর্জে উঠেছে।

সুইডেনের বিচারপতি ব্রিগেড ওভ হাহের নারী স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের ব্যাপারে বলেনঃ “সুইডেনের নারীরা হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, তারা অনেক চড়া মূল্য তথা তাদের প্রকৃত শান্তির বিনিময়ে অনেক বড় একটামোহ ক্রয় করেছে আর তা হচ্ছে তাদের, প্রাপ্ত তথাকথিত নারী স্বাধীনতা।”

পশ্চিমা দেশগুলোর নারীদের অবস্থা সম্পর্কে ইউরোপীয় কমিশনের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, নারী স্বাধীনতা ও সমঅধিকারের নামে কিভাবে শুধু শ্লোগান আওড়াচ্ছে যার কোন অর্থ ও বাস্তবতা নেই। এ রিপোর্টে দেখা গেছে যে, ইউরোপীয় কোন কোম্পানিই নারীদের উচ্চ পদে চাকুরির যে সব কাল্পনিক বাঁধা আছে তা ভাঙ্গার যথাযথ চেষ্টা করেনি।

ইউরোপীয় কমিশনের সামাজিক বিষয়ক কর্মকর্তা এয়ানাদিমান্ত পুলু বলেনঃ ব্যবসায়িক ও কর্ম জগতে নারী-পুরুষের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। ইউরোপে নারীরা সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ২০% ও ৩০% ভাগ, আর বেসরকারী কোম্পানিতে তাদের উচ্চ পদে চাকুরির গড় ফ্রান্সে ২%, জার্মানীতে ৩%, বৃটেনে ৬.৩%,। তাছাড়া ব্যাংকে তাদের উচ্চ পদে চাকুরীর ভাগ ৫%।

এ কমিশন আরো বলেন যে, ধারাবাহিক ভাবে নারী-পুরুষের বেতনের পরিমাণের ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে প্রশাসনিক কার্যাবলীতে, যেখানে নারীর বেতন পুরুষের বেতনের চেয়ে ১৬% কম।

মাইকেল (কথা থামিয়ে)ঃ আমার মনে হয় রেলগাড়ি শেষ স্টেশনে পৌঁছে গেছে, এখন আমাদের মালামাল নিয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

সভ্যতার মুখোশধারী বৈষম্য



সভ্যতার মুখোশধারী বৈষম্য

সোয়া দুই ঘন্টার সফরের পর দু'বন্ধু প্যারিসে এসে পৌঁছল। রাশেদ ইতিপূর্বে এখানে আসেনি, দু'বন্ধু স্টেশন থেকে বের হল। মাইকেলকে দেখে মনে হল, সে প্যারিস শহর ভাল করে চিনে এবং এ শহরের সাথে তার গভীর সম্পর্ক আছে।

মাইকেলঃ রাশেদ! এ হলো প্যারিস শহর, আলোর রাজধানী, এখান থেকে বিশ্ব স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার প্রতীক জানতে পেরেছে, বিশ্বের মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা এখান থেকে চালু হয়েছে।

রাশেদঃ দেখ!! মাইকেল দেখ! এ মহিলাকে পুলিশ আটকিয়েছে, তাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে না যে, সে কোন অপরাধ বা আইন ভঙ্গ করেছে!

মাইকেলঃ ওহ, সে নেকাব পরিহিতা। দু'দিন ধরে ফ্রান্সের পাবলিক জায়গায় নেকাব পরে চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সম্ভবত এ পুলিশআইন ভঙ্গ করার কারনে জরিমানা করার জন্য তার গতিরোধ করেছে, তাকে আটক ও করতে পারে।

রাশেদঃ পাবলিক জায়গা!? অর্থাৎ গৃহে বোরকা পড়তে আইনী কোন অসুবিধে নেই.... মাশাল্লাহ! নারী ও মুসলমানদের জন্য চুড়ান্ত স্বাধীনতা! আমার মনে পড়েছে এ আইনের কথা। আরো মনে পড়েছে যে, এ আইন শুধু ফ্রান্সেই নয় বেলজিয়ামেও কিছুটা আছে, উত্তর ইতালিতেও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নেদারল্যান্ড এবং স্পেন সহ অন্যান্য দেশেও এ আইন চালু করার সর্বাত্মোক চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় পুলিশের ক্ষমতা রয়েছে যে, নেকাব পরিহিতাকে চেহারা খুলে তার পরিচয় জানতে চাওয়া।

মাইকেলঃ আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ সব নিষেধাজ্ঞা নারীদের ইচ্ছা-স্বাধীনতামত পোশাক পরিধানে বাঁধা সৃষ্টি করে। এসব আইন ফ্রান্সে স্বাধীনতার জন্য একটি বিপত্তি। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন একটা দেশে ব্যাক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ যেখানে শতশত আইন আছে যা অন্যের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আহবান করে।

রাশেদঃ ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতিতে রাষ্ট্রে ও রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নিষিদ্ধ নয়। তারপর এ সব নিষেধাজ্ঞা কেন শুধু মুসলমানের জন্য হবে? যারা বুকে ক্রুশ বা পাদ্রীর পোশাক পরে তাদের সাথে কি তারা এমন করে?! তাদের দৃষ্টিতে গোলামীর এ অর্থ বড়ই আশ্চর্যের ব্যপার । তাহলে নারীদেরকে উলঙ্গ করে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য ছেড়ে দেয়ার নাম দাসত্ব থেকে মুক্তি !! আর নারীরা স্বেচ্ছায় তাদের পূর্ন শরীর আবৃত করে চলার নাম দাসত্ব!! হ্যাঁ বন্ধু বোরকা পড়া আসলেই দাসত্ব, তবে তা প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ তায়া'লার দাসত্ব।

এখন আমি ফান্সের বিপ্লবের শ্লোগানে স্বাধীনতার অর্থ কি তা বুঝেছি... আল্লাহ ও তার গোলামীর সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার স্বাধীনতা। সৃষ্টজীবের থেকে স্বাধীনতা নয়। এ সব স্বাধীনতা ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্রের সরকার চালু করেছে, যেখানে আল্লাহর স্থানকে অপমানিত করে সেখানে যথেচ্ছা , যেভাবে খুশি সেভাবে চলার স্বাধীনতাকে বাস্তবায়ন করেছে। তারা স্বাধীনতার সংজ্ঞায় বলেঃ "অপরের স্বাধীনতা যেখানে শুরু সেখানে তোমার স্বাধীনতা শেষ"। তাহলে তারা কি নারীর শরীর অন্যরা দেখাকে স্বাধীনতা মনে করে? আর এ জন্য কি মুসলিম নারীর স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে দিবে?! আসলে ব্যাপারটা পর্দার বিষয় নয়, ইউরোপের মানুষ ইসলামের জয়গানে ভীত হয়ে পড়ছে।

মাইকেলঃ রাশেদ তুমি বিষয়টাকে এত বড় করে দেখোনা। কেননা ইউরোপে অনেক মুসলমান বসবাস করে, তারা অন্যদের মত নিজেদের অধিকার পেয়ে থাকে, এমনিভাবে তাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও কাজের পর্যাপ্ত সুযোগ যা তাদের দেশেও নাই।

রাশেদঃ আমি বিষয়টিকে বড় করছিনা, তবে এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণ আছে যে, তাদের মূল ভয় হচ্ছে ইসলাম।

মাইকেলঃ যেমন কি?

রাশেদঃ সুইজারল্যান্ডের মত মানবাধিকার রক্ষাকারী,ধর্ম নিরপেক্ষ এবং জেনেভা কনভেনশন চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশে মসজিদের মিনার তৈরি নষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মিনার তৈরিতে সমাজের কি ক্ষতি হত?! যে দেশে মুসলমানের সংখ্যা ৪% এর বেশী হবেনা, যেখানে মাত্র চারটি মিনার রয়েছে। একথা স্পষ্ট যে, তাদের এ সব নিষিদ্ধের মূলে রয়েছে ভয় ও ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণমাত্র।

মাইকেলঃ যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে এ সব নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করিনা, তবে আমি বুঝতেছি তারা মনে করেন যে, এ সব মিনার তাদের রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের সাথে বিরোধপূর্ণ, এগুলোকে তাদের দেশের পরিচয়ের জন্য ক্ষতিকর মনে করেন।

রাশেদঃ ঠিক আছে যদি তারা এ সব নিষেধাজ্ঞা অন্যান্য সব ধর্মের চিহ্ন যেমনঃ খৃষ্টানদের গীর্যা, ইহুদীদের উপাসনালয় ইত্যাদির ব্যাপারে করত তবে বুঝতাম তাদের ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতায় তারা এগুলো করে, তাহলে তারা যে সমঅধিকারের বুলি আওড়ায় তার বাস্তবতা বুঝতাম। ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়, বরং তাদের সীমালজ্ঞন ইসলামের মূলপ্রতীক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমনকি ইসলামের নবীর উপরও আক্রমন করেছে। যেমন আমরা দেখেছি, ডেনমার্কে আমাদের রাসুল সাঃ কে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুনের ঘটনা ঘটেছে আর অন্যান্য কিছু দেশ তাদের এ সীমালজ্ঞনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে।

মাইকেলঃ হে বন্ধু! এগুলো বাক-স্বাধীনতা। আমাদের দেশে বাক-স্বাধীনতার কাছে কোন পবিত্র বা নিষিদ্ধ জিনিস নাই। অনেকবার হযরত ঈসা আঃ ও অন্যান্য ধর্মপ্রতীকের ব্যাপারেও এ ধরনের সমালোচনা ও উপহাস হয়েছে।

রাশেদঃ বরং তোমাদের কাছেও অতি পবিত্র কিছু জিনিস আছে যা তোমরা বাক-স্বাধীনতা এমনকি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারাও একে স্পর্শ করোনা। ডেনমার্কের ম্যাগাজিনের রাসুলের সাঃ কার্টুন প্রকাশের পর ইউরোপের অনেক দেশে তা সংক্রমিত হয় এবং পশ্চিমা কিছু সরকার এর পক্ষ নেয়, যদিও তা দেড় শত কোটি মুসলমানের মহান ধর্মীয় প্রতীকে আঘাত হানে। পাশ্চাত্যেরবাক-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তারা এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করে

হলোকস্ট হত্যাকান্ডের ব্যাপারেইহুদীদের জালিয়াতি সম্পর্কে কার্টুন প্রকাশের জন্য ডাচ আপিল বিভাগ ডাচ মুসলিম গোষ্ঠীকে ২৫০০ ইউরো জরিমানা করেছিল। আদালত এ রায়ের কারণ দর্শিয়ে বলে যে, মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় আদালত বাক-স্বাধীনতার গুরুত্ব দিবে, তবে কেউ হলোকস্ট হত্যাকান্ড সম্পর্কে কোন নেতিবাচক কিছু বলতে পারবেনা, এটাকে আলাদাভাবে দেখা হবে।

ফ্রান্সের এক আদালত ১৯৯৮ সালে সে দেশের গবেষক জারুদীর বিরুদ্ধে হলোকস্ট হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির অভিযোগে চার্জ গঠন করে, কারন সে শুধুমাত্র ইউরোপে নাৎসি বাহিনীর হাতে নিহত ইহুদিদের প্রচলিত সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।

অস্ট্রীয় আদালত ইহুদীদের হলোকস্ট হত্যাকান্ডের বিস্তারিত তথ্য অস্বীকার করার কারনে ২০০৬ সালে বৃটিশ ঐতিহাসিক ডেভিড ইরভিং কে তিন বছরের কারাদন্ড দেয়।

২০০৯ সালে জার্মানের উচ্চ আদালত বৃটিশ ক্যাথলিক রিচার্ড উইলিয়ামসনকে দশ হাজার ইউরো জরিমানা করেন, কেননা সে ঘোষনা করেছিল যে, নাৎসী হত্যা ক্যাম্পে দুই থেকে তিন লাখ ইহুদি হত্যা করা হয়েছিল।

এরকমভাবে তাদের মত আরো অনেকে এ পবিত্র বিষয়ে বাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীন গবেষণার আশ্রয় খুঁজে পায়নি।

মাইকেলঃ অবশ্যই, ইতিহাসের লম্বা পরিক্রমায় খৃষ্টান ও মুসলমানের মাঝে বিদ্যমান বিরোধ, এ ছাড়াও মুসলমানের সর্বশেষ জঙ্গি তৎপরতা ইত্যাদি অনেকের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করেছে, অথচ এ সব তৎপরতা হিন্দু বা বৌদ্ধ বা অন্যদের মাঝে ততটা দেখিনা। তুমি কি অস্বীকার করতে পারবা যে, মুসলমানের কিছু কিছু কাজ কর্ম দেখে মানুষ ইসলামকে ভয় পায়?

রাশেদঃ হ্যাঁ এবার আমরা বাস্তবতার কিছুটা কাছাকাছি এসে গেছি। আমি মুসলমান কিছু লোক, গোষ্ঠী বা দলের কিছু আচার আচারনের কথা অস্বীকার করবনা। এ সবের সুযোগ নিয়ে কোন কোন শত্রুপক্ষ মানুষের মাঝে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও ভীতি উস্কে দিচ্ছে....কিন্তু বাস্তবে এর প্রভাব কতোটুকু তা দেখতে হবে। আমরা একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে আক্রমন করার অনেক কারন রয়েছে, আর এসব ঘটনাকে ব্যাবহার করে বিভিন্ন বিভিন্ন ইসলামবিরোধী দল তাদের লক্ষ্য হাসিলে তৎপর হয়।তাছাড়া আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে খেয়াল করলেই দেখব যে, কোন ধর্মীয় দল বা উপদল নেই যাদের মাঝে এসব শত্রুতাপূর্ণ ঘটনা নেই। কিন্তু এ সব ঘটনাকে সকলের উপর সমানভাবে ব্যবহার বা কারো কারো ব্যাপারে একেবারেই ভুলে যাওয়া কিন্তু ঠিক নয়, অর্থাৎ এ গুলো বিচ্ছিন্না ঘটনা যা আমরা ব্যক্তির উপর দোষারোপ করতে পারি, এজন্য সে দলের সকলের উপর এ দোষ বর্তাবেনা।

মাইকেলঃ অন্য কারন কি?

রাশেদঃ কিছু কিছু কারন আমি উল্লেখ করব, সব গুলো নয়ঃ

সুদূর অতীত থেকেই ইউরোপ কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্যে আরব ও মুসলমানের জন্য সেখানে অভিবাসনের পথ খুলে দিয়েছে। এর মূল কারনের মধ্যেঃ ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা, কেননা পাশ্চাত্যের লোকদের জন্ম হার কম হওয়ায় লোকসংখ্যার একটা সমতা আনতে তারা এ কাজটি করে। এটা ইসলামি কৃষ্টি- কালচারকে অনুসরণের জন্য ছিলনা, বরং তাদের ইচ্ছা ছিল মুসলমানেরা লোকসংখ্যা জন্ম দিবে আর সে সব জনবল পঞ্চাশ বছর পরে তাদের সমাজ,সংস্কৃতি ও সভার ধাঁচে গড়ে উঠবে।এমনিভাবেই পাশ্চাত্যের সমাজের কর্ণধারেরা পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু সমাজের এসব কর্ণধারেরা দেখতে পেল যে, ইসলামি নবজাগরণ ইসলামি বিশ্ব থেকে পাশ্চাত্যের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, ফলে পাশ্চাত্য সমাজের সভ্যতার গঠন ব্যবস্থায় অভিবাসী মুসলমান ও তাদের সন্তানেরা বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে। মুসলিম বোরকা পরিহিতা নারীরা ও ইসলামী রীতি-নীতি পালনকারী পরিবার অনেকটা আক্রমনের শিকার হল, কেননা তারা তাদের ধর্মীয় আখলাক-চরিত্র, ইসলামি মৌলিক নিয়ম-নীতির উপর চলতে থাকল। আর তারা এটাকেই তারা তাদের সংস্কৃতিকে পূর্নভাবে একীভুত করার পথে প্রতিবন্ধতা হিসেবে বিবেচনা করল।

মুসলিম সন্তানদের এ প্রজন্ম পাপাশ্চাত্যের সমাজ ব্যবস্থার মূল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পশ্চিমা বিশ্বের সামনে ভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বহনকারী ক্রমবর্ধমান এ জনসংখ্যা এক মহা সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে।

অতএব, এ সব উগ্র আক্রমণের মূল কারন হলো পাশ্চাত্যের লোকদের স্বকীয়তা হারানোর ভয়াবহতার উপলব্ধি। এ কারনেই তারা সব ধর্মীয় প্রতীক বা ইসলামী বেশভূষাকে ভীতের কারন মনে করেন। তারা মনে করেন যে, যদি সামান্য বাহ্যিক বেশভূষাকে তারা ছেড়ে দেয় তবে ধীরে ধীরে সমস্ত ইসলামি রীতিনীতি তাদের উপর চলে আসবে। তাই তারা শুরু থেকেই এ গুলোকে নিঃশেষ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে সকল সভ্যতার সজ্ঞাত এখন ইসলামের সাথে সজ্ঞাতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে অন্যান্য আয়োডলজি উহ্য হয়ে থাকে। আর এটাকেই আমেরিকার গবেষক স্যামুয়েল হান্টুন “সভ্যতার সংঘাত” নামে আখ্যায়িত করেছেন, যা পাপাশ্চাত্য সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক মতবাদকে বুঝায়।

মাইকেলঃ আমরা হোটেলে পৌঁছে গেছি, আমরা যে বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছি এ বিষয়ে অনেক আলোচনার দরকার।

প্যারিসের কফিহাউসে ফ্রয়েডের সঙ্গে কিছুক্ষণ



প্যারিসের কফিহাউসে ফ্রয়েডের সঙ্গে কিছুক্ষণ

দু'বন্ধু প্যারিসে পৌঁছার পর পছন্দমত হোটেলের খোঁজ খবর নেয়, অবশেষে তারা প্যারিসে ছাত্র হোষ্টেলে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। তদের বিশ্রামের প্রয়োজন, তাই তারা রাতের বাকি অংশ ঘুমে কাটাল। পরের দিন দু'বন্ধু শহরের বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে বাহিরে বের হলো, ঘুরতে ঘুরতে তারা এক কফিশপে এসে পৌঁছল।

মাইকেলঃ এ কফিশপে এককাপ চা খেতে খেতে বিশ্রামের সময়টা কাটালে কেমন হয়?

রাশেদঃ ভালই হয়, আমারও একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

মাইকেলঃ এই কফিশপে বিখ্যাত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ সিগমুন্ড ফ্রয়েড বসত। তার সম্পর্কে কি তুমি জান?

রাশেদঃ হ্যাঁ, একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানে তার নাম মানসিক বিশ্লেষণ স্কুলের সাথে জড়িত অন্যদিকে তিনি নীতি নৈতিকতার বিধিমালা থেকে সরে আসতে আহবান করেছেন আর অবাধ যৌনতার দিকে ডেকেছেন।

মাইকেলঃ তুমি যে সব সম্পৃক্ততার কথা বলেছ সেগুলোর দিকে না তাকিয়ে তিনি আমাদের কাছে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

রাশেদঃ আমি মনে করি তিনি একজন বিশিষ্ট্য চিন্তাবিদ যিনি আধুনিক পাপাশ্চাত্য সমাজের সভ্যতার ভিত্তি রুপায়ন করেছেন। তার মত ডারউইন, ক্যান্ট, মার্কস, ডরকেইম ও সার্টার এদের সকলেই পাপাশ্চাত্যের চিন্তা ধারার মাঝে ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছেন, নব্য পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারনামত তারা সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছেন। আর তাদের মূল ভুমিকাই ছিল ধর্ম, আখলাক-চরিত্র ও কৃষ্টিকালচারকে ধ্বংস করা।

ডারউইনের সৃষ্টি বিবর্তন ও বেড়ে উঠার মতবাদ ছিল জ্বলন্ত মিথ্যাচার যা দুটি বিপজ্জনক ভুয়া চিন্তার জন্ম দিয়েছে। এদু'টোকে পরবর্তীতে চিন্তাগবেষণা নির্ভরেরা তাদের গবেষনাকর্মে কাজে ব্যবহার করেছিল। প্রথম মিথ্যাচারঃ জিনিসের সার্বক্ষনিক ক্রমবর্ধনের ধারণা যা স্থির জিনিসের ধারণাকে বাতিল করে দেয়, এখান থেকে সকল মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার আপেক্ষিক হওয়া। দ্বিতীয় মিথ্যাচার হলোঃ মানুষের জৈবিকতা, শুধু তার বস্তুবাদ ও সেসব উপাদান যা তার মধ্যে প্রভাব ফেলে সেগুলোকে আলোচিত করা, পক্ষান্তরে মানুষের আত্মার দিকটাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা। এমনিভাবে এ কথাও উপেক্ষা করা হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর তৈরী, চাই এটা তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে হোক বা তার ক্রমবর্ধনের ক্ষেত্রে হোক।তার প্রথম কাজই ছিল দার্শনিকদের প্রশ্ন সমূহ যেমনঃ আল্লাহ, মানুষ, মহাবিশ্ব ও শেষ পরিণতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণাসমূহকে ধ্বংস করা।

ফ্রয়েডের এক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল এভাবে যে, সে মানুষকে কতিপয় যৌন সম্পর্কের সমষ্টিতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, আর চারিত্রিক ব্যাপারে মানুষের বিবেকের নির্দেশকে অস্বীকার করল। তিনি বলেনঃ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে মূল ইঞ্জিন বা গতিচালক হলো কামনাতৃপ্তি। এর ফলে সৎ চরিত্রের অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়, এসব মৌলিক অবকাঠামো গুলো বিভিন্ন পশ্চাদপদতায় রূপ নেয়, এগুলোকে অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মাইকেলঃ আমি মনে করি সব যুগের মানব সভ্যতার মাঝে কিছু যৌথ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর কিছু বৈশিষ্ট আছে যা এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতাকে আলাদা করে।এ বিষয়গুলো(ইলাহ/ আল্লাহ, মানুষ, বিশ্ব) সকল সভ্যতায় যৌথভাবে রয়েছে তবে এ সবের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে ভিন্নতা ছিল। কোন কোন সভ্যতায় এগুলোর একটিকে অপর দুটির উপরে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং প্রথমটার ভিত্তিতে অপর দুটিকে বিবেচনা করা হয়।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় এবং রেনেসাঁর যুগের পরে এ সভ্যতায় মহাবিশ্বের অর্থ ও ভাবধারা প্রধান্য পেয়েছে। যখন বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ব্যাপকহারে বিস্তারলাভ করেছে, তখন আল্লহর মূল সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে বাহ্যিক উপাদান সামনে নিয়ে আসা হলো। এতে করে মানুষের আত্মিক শক্তিকে হত্যা করা হলো, প্রকৃতপক্ষে ডারউইন হলো এসব চিন্তার অন্যতম জনক।

রাশেদঃ তোমার সাথে আমি একমত। তবে তোমার কথার সাথে আরো কিছু যোগ করতে চাচ্ছিঃ

প্রথমতঃ সে সময়ে পাশ্চাত্য সমাজে এ সব ধ্যান-ধারনার পরিবর্তনের মূল কারন হলো সে সময়ে আত্মিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্কের শূন্যতা ও পরস্পর বিরোধীতা, এছাড়াও গির্যার পদস্থলন ও সৃষ্টি ও জীবনের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত ধ্যান ধারনা ও এ সবের ব্যাপারে তারা যা বলে তা ই বিশ্বাস করতে হবে বলে বাড়াবাড়ি।

দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, পাশ্চাত্যের উন্নতির কারন হলো তাদের সে সব ধ্যান ধারনা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করা, নবজাগরণের শুরুতে ও মধ্যযুগে ব্যাপকহারে যার প্রসার ঘটেছে।

তৃতীয়তঃ বিজ্ঞানের প্রকৃত বিপ্লবের পরে দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের এসব ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা একের পর এক ভেঙ্গে যেতে থাকে। এতদসত্বেওপাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের কিছু লোক এখনো এসব ধ্যান ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ও এ সব ধ্যান ধারণা পোষন করে আছেন।

আর বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে যৌথ ধ্যান ধারণার ব্যাপারে তুমি যে কথা বলেছ সে ব্যাপারে মানুষের আচরনের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা ও সাতশত বছর আগে একজন মুসলিম বিজ্ঞানীর লিখিত ব্যাখ্যার তুলনার কথা মনে পড়ে।

মাইকেলঃ খুবই মজার ব্যাপার, ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা ও সে যুগের মুসলিম আলেমের ব্যাখ্যার মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে।

রাশেদঃ দু'জনের ধ্যানধারণার মাঝে সাদৃশ্য নয়, বরং আমরা বলতে পারি গঠনগত মিল। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলেঃ তুমি কি ফ্রয়েডের মত অনুযায়ী মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে জান?

মাইকেলঃ ভাল করেই জানি, এর মূল কথা হলোঃ ফ্রয়েড মনে করেন যে, মানুষের মাঝে অনেকগুলো জৈব ডিভাইস বা যন্ত্র রয়েছে যা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, যেমনঃ পরিপাকতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র....এমনিভাবে মানুষের রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক তন্ত্র যা তার অন্যান্য অংশের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে।

এ যন্ত্র যেসব দ্বারা গঠিত তা হলো তার কথায়ঃ (খামখেয়ালী) ,(আমিই মহান)(আমি)

(খামখেয়ালী) হলো সহজাতপ্রবৃত্তি , বিশেষ চাহিদা, পুর্ব অভিজ্ঞতা,অনুভূতি অঞ্চলে পৌছার জন্য সবসময়ে চলতে থাকা আদি প্রবণতা যা দ্বারা সে তার কামনাতৃপ্তিমোতাবেক চাহিদা পূরণ করে। (খামখেয়ালী)কে সবচেয়ে পূরাতন মনস্তাত্ত্বিক তন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এগুলো মানব সন্তান জন্মের সময়ই গঠিত হয়, তাই এটাকে বংশগত প্রভাব হিসেবে ধরা হয়।

(আমিই মহান) হলোঃ কতিপয় সামাজিক মূল্যবোধ, মৌলনীতি ও উচ্চতর গুনাবলী, অর্থাৎ মানুষ অন্যের দ্বারা যেসব গুনাবলীতে প্রভাবিত হয়, এতে আরো যোগ করা যায় শিক্ষা ও চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রভাব যা শিশুরা পিতামাতা, স্কুল ও সমাজ থেকে শিক্ষা পায়। পারিবারিক, জাতিগত, গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় ঐতিহ্য- সংস্কার ইত্যাদির প্রভাব, এছাড়াও যারা সমাজের প্রত্যক্ষ্য প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের গঠিত প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি। এছাড়াও বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সাথে শিশুদের বেড়ে উঠার প্রভাবও (আমিই মহান) তন্ত্রে প্রভাব ফেলে। যেমন যদি কোন অভিভাবক সমাজের উন্নত আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেন। (আমিই মহান) তন্ত্র সর্বদা যৌনক্ষুধা চরিতার্থকরণ বা প্রবৃত্তির কাজ ছেড়ে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হবে, কেননা (আমিই মহান) বিবেকটি এদিকে নিয়ে যাবে, এটা উন্নত আদর্শের পথে চলবে ফলে সর্বদা কামনাতৃপ্তি বাদ দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে পৌঁছতে থাকবে, - ফ্রয়েডের মতে-।

আর (আমি) তন্ত্রকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি যে,(খামখেয়ালী) ও (আমিই মহান) তন্ত্রের মাঝে এবং কামনাতৃপ্তির চাহিদা ও উন্নত আদর্শ ও মৌলিক মূলনীতি ও নিয়মকানুনের মাঝে বিদ্যমান বিরোধ বা একতুতার ফলাফলই হলো (আমি) তন্ত্রের কাজ। অতএব (আমি) তন্ত্র হলো জাগ্রত অনুভূতি যা বাস্তবতা ও মানবিক চাহিদা ইত্যাদির মাঝে সমতা বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের কাজ করে। পরিশেষে এটাই বহিরাগত আচার আচরনের মাপকাঠিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের ফলাফলে প্রকাশ পায়।

অতএব (আমিই মহান) তন্ত্র হলো সে ভিন্ন দিক যা (আমি) তন্ত্রের পর্যবেক্ষক ও সতর্ককারীর কাজ করে, সে (খামখেয়ালী) তন্ত্রের কামনা বাসনা ও চাহিদার ডাকে সাড়া না দিতে সতর্ক করে।

রাশেদঃ চমৎকার ব্যাখ্যা, মাইকেল, তুমি এমনভাবে ব্যাখ্যা দিলে যেন চায়ের কাপ মুখে নিয়ে ফ্রয়েড নিজেই এ কপিশপে বসে ব্যাখ্যা দিচ্ছে.....

কিন্তু আমি এ সুন্দর ব্যাখ্যাকে এভাবে পূর্ণ করতে চাই যে,ফ্রয়েডের ব্যাখ্যাকৃত মনস্তাত্ত্বিক তন্ত্র (আমি) ও অন্যান্যগুলোর মাঝে বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন, যদিও অসম্ভব বলব না। এগুলো পরস্পর বিরোধপূর্ণ ও সামঞ্জস্যবিধান করা দুরূহ ব্যাপার। যেহেতু (আমি) তন্ত্রকে (খামখেয়ালী) তন্ত্রের চাহিদার ডাকে সাড়া দিতে হয়, যা মূলত যৌন চাহিদাকে বুঝায়, আবার একই সময় তাকে বহিরাগর পরিমন্ডলে (আমিই মহান) তন্ত্রের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, যা চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নত চাহিদার দিকে ডাকে, এজন্যই দু'ইয়ের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করা খুবই কঠিন। এজন্য (আমি) তন্ত্র (খামখেয়ালি) তন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে তার ডাকে সাড়া দিতে গেলে (আমি মহান) তন্ত্রের সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়। যখন (আমি) তন্ত্র (খামখেয়ালী) ,(আমি মহান) তন্ত্র ও বাস্তবতার মাঝে সামাঞ্জস্যতা আনতে সক্ষম হয় তখন ব্যক্তি সমতা বজায় রেখে জীবন যাপন করে, আর যখন (খাম খেয়ালী) বা (আমি মহান) তন্ত্র তার উপর জয়লাভ করে তখন ব্যক্তি বিভিন্ন অশান্তি ও গোলযোগে ভোগে, তখন (আমি) তন্ত্র তার পরস্পর বিরোধী চাহিদার মাঝে সামাঞ্জস্যতা আনতে ব্যর্থ হয়, ফলে সে মানসিক ব্যাধিতে ভোগে।

এখানে মারাত্মক ক্ষতির দিক হচ্ছে, আমরা যখন বলি মানুষের মানসিক সুস্থতার অর্থ হলোঃ (আমি) তন্ত্র (খামখেয়ালী) তন্ত্র তথা চাহিদা ও যৌন প্রবণতার সাথে, এবং (আমি মহান) তন্ত্র তথা মূল্যবোধ, মৌলিক নীতি ও উন্নত চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলা। আর (খামখেয়ালী) তন্ত্রের ডাকে সাড়া না দিলে তাতে চাহিদাকে অবদমন করতে হয় আবার (খামখেয়ালী) তন্ত্রকে পরিবর্তন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়......তখন প্রয়োজনের খাতিরে (আমি মহান) তন্ত্রকে পরিবর্তন ও ভেঙ্গে দেয়া ব্যাতীত আমাদের সামনে আর কোন উপায় থাকেনা। এমতাবস্থায় ধর্ম ও উন্নত চরিত্রকে আমাদের জীবন হতে বের করে দিতে হয় আর এর পরিবর্তে মানুষের যৌনচাহিদামুখী চরিত্র গ্রহন করতে হয় যা তার (খামখেয়ালী) তন্ত্রকে বাস্তবায়ন করে। ধর্ম ও চরিত্রকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্যে ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটেছে। কোনপ্রকার চারিত্রিক নীতিমালা ব্যাতীত যৌন সম্পর্ক আর লালসার লাগাম ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এর উপর তাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে।ফলে পরিবার ধ্বংস হচ্ছে, বরং মানুষের মানবিকতা ধ্বংস হচ্ছে। এতে মানুষ আর চতুষ্পদ জন্তু -যে কোন আখলাকের বিধিমালায় আবদ্ধ নয়- এতদুভয়ের মাঝে আর কোন পার্থক্য থাকলনা। আস এবার আমরা ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করি!!

মাইকেলঃ তার মানে তুমি বলতে চাও যে, এসব অবদমিত জৈবিক চাহিদা পূরনে মানুষ যখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপায় খুঁজতে থাকে, তখন তা ফ্রয়েডের মতামত ও তার দর্শন তোমার ধারনা মতে,এমন এক সভ্যতার দিকে নিয়ে যায় যা অবদমনের সভ্যতায় সৃষ্ট নীতিমালা ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রাশেদঃ হ্যাঁ, পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তখন তা সৃষ্টি করে প্রভুর পবিত্রতাকে বাদ দিয়ে। অন্যদিকে মুসলমানেরা মনে করেন যে, মানব সমাজে আখলাক চরিত্র হলো এমন জিনিস, অবশ্যই যার উৎস হতে হবে আসমানী শরিয়ত, বিবেক বা জ্ঞান নয়। কেননা বিবেক একা অবশ্যই গোমরা বা বক্র হয়ে যাবে, আর বিবেক যখন শরিয়তের ছত্রছায়ায় থাকবে তখন আখলাক উন্নত চরিত্রের ফলাফল দিবে।

মাইকেলঃ রাশেদ তুমি কিন্তু তোমাদের ধর্মের আলেম এ ব্যাপারে কি বলেছে তা এখনো বলনি। তিনি যা বলেছেন তা কি আমাদের এসব কথার সাথে মিল আছে নাকি অমিল?

রাশেদঃ তিনি যা বলেছেন ত হলো নৈতিক মূল্যবোধ ও ধ্যান ধারণার অংশ। এখানে তার কথা আলোচনা করতে গেলে অনেক লম্বা কথা বলতে হবে, আমার মনে হয় আমরা পরে এ ব্যাপারে আলোচনা করলে ভাল হয়।

দুটি পন্থার মাঝে মানবাত্মা



দুটি পন্থার মাঝে মানবাত্মা

রাশেদ ও মাইকেলের থাকার যুব-আবাসটি খুবই চমৎকার ছিল। সস্তা হওয়া সত্বেও সেখানে খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, পড়াশুনার জায়গা, চিত্তবিনোদনের স্থান, যোগাযোগ ও ফোন করার ব্যবস্থা ছিল। সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল সেখানে তাদের একই বয়স ও একই পর্যায়ের উঁচু সাংস্কৃতিমনা অনেক তরুন পর্যটক ছিল।

মাইকেল ও রাশেদ মিটিং হলের একটি টেবিলের পাশে বসে তাদের পছন্দমত পানীয়ের অর্ডার দিল, অতঃপর মাইকেল কথা শুরু করলঃ

পূর্বের আলোচনায় তুমি যে আলেমের কথা বলেছিলে আমরা তার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে থেমেছিলাম, তিনি যে কথা বলেছিলেন তা কি আমার কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি বিরোধপূর্ণ?

রাশেদঃ ব্যাপারটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বা বিরোধপূর্ণ হওয়ার বিষয় নয়; ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি, যা স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্পষ্ট মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আমি তোমার সাথে এ ব্যাপারে কথা দীর্ঘায়িত করবনা ..এ আলেমের নাম হলো, ইবনুল কাইয়ুম (রাহঃ), তিনি তার বইয়ে (কলব) অন্তর, (নফস) আত্মা, ও (আকল) জ্ঞান বা বিবেকের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি তোমাকে শুধু ইঙ্গিত দিব যে, তিনি এ ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন তা ইসলামি সভ্যতার মূল ভিত্তি যে সব আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে গড়ে উঠেছে তারই পরিস্ফুটন। এজন্যই ইসলামী নীতি-পদ্ধতি এবং পাশ্চাত্য সমাজ ও তার চরিত্রে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টিকারীফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য আমি আমার আগের কথা পূর্ন করতে চাই।

মাইকেলঃ সময় বাঁচানোর জন্য সংক্ষেপে আমাকে তোমার শেষ কথাটাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। যদি তুমি এর বিপরীত বিশ্বাস কর, তবে আশা করছি তুমি আমাকে শুধরিয়ে দিবে।

রাশেদঃ হ্যাঁ, বল।

মাইকেলঃ ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাক্তিত্বের কতগুলো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলো হলোঃ

ব্যক্তির মাঝে যখন সহজাত-প্রবৃত্তি, আদি বাসনা বা প্রাণী স্বভাব (যাকে খাম খেয়ালি তন্ত্র বলে) (আমি) তন্ত্রের উপর প্রাধাণ্য পাবে তখন তার মাঝে স্বার্থপরতা, অহংকারী ব্যক্তিত্ব ও অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সীমা-লঙ্ঘনকারী হিসেবে প্রকাশ পাবে। যা তাকে সর্বদা তার প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি করতে আহবান করবে, পশুত্বের প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিবে, তখন (আমি মহান) তন্ত্র তার মূল্যবোধ, চিরাচরিত অভ্যাস ও মহাপবিত্রতার দ্বারা প্রতিরোধ করতে পারবেনা।

আর যখন ব্যক্তির মাঝে (আমি মহান) তন্ত্র তার মূল্যবোধ, চিরাচরিত অভ্যাস ও মহাপবিত্রতা ইত্যাদি (আমি) তন্ত্রের উপর প্রধাণ্য পাবে তখন ব্যক্তিকে রাহেব বা পাদ্রী ও অবাস্তব আদর্শবাদী হিসেবে গড়ে তোলবে আর তার সহজাত-প্রবৃত্তি, আদি বাসনাকে ধ্বংস করে দিবে।

সুস্থ, স্থিতিশীল বা ভরসা জনক ব্যক্তিত্ব হলো যা একদিকে সহজাত-প্রবৃত্তি, আদিম বাসনা ও অন্যদিকে মূল্যবোধ, উন্নত চরিত্রের মাঝে সমতা ও সামাঞ্জস্য রাখবে। এভাবে যে, প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু সহজাত-প্রবৃত্তিকে দমন করবে, আবার কখনো কখনো প্রয়োজন অনুযায়ী মূল্যবোধকে সীমাবদ্ধ করবে, প্রত্যেকটা পরিস্থিতি অনুযায়ী সে এ কাজগুলো করবে।

রাশেদঃ খুবই চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছ। এখানে আমরা এ দৃষ্টিভঙ্গি ও পাশ্চাত্যের সভ্যতা যা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এর মাঝে এবং ইসলামের নীতি ও পদ্ধতিমালার মাঝে পারক্য খুঁজে পেলাম। এ পার্থক্য এভাবে স্পষ্ট হয় যে দেখা যায়, সর্বশেষে (খাম খেয়ালী), (আমি) ও (আমি মহান) তন্ত্রের মাঝে পরস্পর বিরোধ মিটে যায়। আর তা ঘটে জীবনের সবক্ষেত্রে মানবিক সকল দিকের মাঝে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যতার মাধ্যমে।এর রহস্য নিহিত রয়েছে ঐ বিষয়ের মাঝে,যাকে আমরা অধিকারের সীমালঙ্ঘনে নিষিদ্ধতা বলি।

মাইকেলঃ প্রথমবার তোমার কাছে অধিকারের সীমালঙ্ঘনের কথা শুনলাম। এবার তোমার থেকে জানব কিভাবে অধিকারের সীমালঙ্ঘন করা করা হয়? তবে আমাকে একটু বলতে সুযোগ দাও, তোমার কথা মনস্তাত্বিক ডিভাইস বা যন্ত্রের গঠনপ্রণালীকে স্বীকার করে।

রাশেদঃ মনস্তাত্বিক ডিভাইস বা যন্ত্রের গঠনপ্রণালীর কথা ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে এক বা একাধিক মুসলিম আলেম শত শত বছর আগে এ রকম কথা বলে গেছেন। দেখ ইবনুল কাইয়ুম (রাহঃ) তার বইয়ে কি বলেছেন, রাশেদ একটি কিতাব বের করলেন, অতঃপর পড়া শুরু করলেনঃ "অতএব চারটি জিনিসঃ মাকরূহ বা অপছন্দ যা মাকরূহ বা অপছন্দের দিকে পৌঁছায়, আবার কিছু মাকরূহ বা অপছন্দ যা মাহবুব বা প্রিয় জিনিসের দিকে পৌঁছায়। প্রিয় জিনিস যা প্রিয় জিনিসের দিকে পৌঁছায়, আবার কিছু প্রিয় জিনিস অপ্রিয় জিনিসের দিকে পৌঁছায়। যে প্রিয় জিনিস অন্য প্রিয় জিনিসের দিকে পৌঁছায় সে কাজটি করার জন্য দু'টি কারণ বিদ্যমান থাকে। আর যে অপ্রিয় জিনিস অন্য অপ্রিয় জিনিসের দিকে পৌঁছায় সে কাজটি না করার জন্যও দু'টো কারণ থাকে।

বাকি দু'প্রকারে করা ব না করা, দুটির প্রতিই আকৃষ্টকারী কারণ রয়েছে।আর এ দু'প্রকারই মানুষের জন্য বিপর্যয়ের কারণ ও পরীক্ষা। মানুষের আত্মা তার কাছের জিনিসকে প্রভাবিত করে, আর তা হলো তাৎক্ষনিক। আর আকল বা জ্ঞান ও ঈমান বেশি উপকারী ও স্থায়ী জিনিসের প্রতি প্রভাবিত হয়, আর কলব বা অন্তর এ দুয়ের দিকেই আহবান করে।মুসলিম বিজ্ঞ আলেমরা এ ব্যাপারে কোরআন ও হাদিস থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন যে, যখন মানুষের আকল বা জ্ঞান (আমি মহান তন্ত্র) অলস বা গাফিল হয়ে যায় তখন তার সহজাত-প্রবৃত্তি (খাম-খেয়ালী তন্ত্র) কোন পর্যবেক্ষক ও হিসাব গ্রহণকারীর চিন্তা ছাড়াই সচল হয়ে যায়।

দেখতে পাচ্ছ? ফ্রয়েডের আত্মা ও (খামখেয়ালী তন্ত্রের কার্যক্রম আর মুসলিম আলেমের জ্ঞান, ঈমান) ও (আমি মহান) তন্ত্র এবং অন্তর ও (আমি) তন্ত্রের কাজের কার্যক্রমের মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

মাইকেলঃ তাহলে তাদের উভয়ের কথার মাঝে অনেকটা মিল আছে।

রাশেদঃ তবে এখানে একটা সূক্ষ্ম ও চিরন্তন পার্থক্য রয়েছে, যা দু'টো পদ্ধতিকে পার্থক্য করে দেয়, এটা হলো ইবনুল কাইয়ুমের মতে " এ দু'টো মানুষের জন্য বিপর্যয় ও পরীক্ষা" আর অন্যদিকে ফ্রয়েড মনে করেন, মানুষের সুস্থ ব্যক্তিত্বের জন্য আমি তন্ত্র/ ইবনে কাইয়ুমের মতে যা কলব, তা সহজাত-প্রবৃত্তির (খাম-খেয়ালী তন্ত্র/ নফসের) ডাকে সাড়া দেয়। ইসলামী রীতিনীতি ও পদ্ধতি অনুসারে সহজাত-প্রবৃত্তি ও অন্তরের প্রবৃত্তির ডাকের কারণ হলো মানুষকে পরীক্ষা করা, আর এসব পরীক্ষা মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই নিজের মনের খামখেয়ালী মত এ সবের ডাকে সাড়া দেয়া যাবেনা, আবার একেবারেই একে আমি মহান তন্ত্রের বাআকল ও ঈমানের মাধ্যমে মূলোৎপাটন করে দমন করার কথাও বলা হয়নি যেভাবে পাদ্রী বা সন্ন্যাসীরা করে থাকেন।

এটাই হলো মধ্যপন্থা ও সামাঞ্জস্যতা, যা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বা নীতিতে পাওয়া যায়না। আর তা হলোঃ মনের খামখেয়ালী ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে পূরণ করা যাতে আকল বা জ্ঞান ও ঈমানের সাথে বিরোধ না হয় ও অন্যের অধিকারে সীমালঙ্ঘন ও না হয়।

মাইকেলঃ তাহলে অধিকারের সীমালঙ্ঘন আবার কি?

রাশেদঃ উন্নত মূল্যবোধ ও মহান চরিত্রের কিছু আধিকার আছে, আবার অন্যদিকে সহজাত-প্রবৃত্তি ও মানবিক চাহিদারও কিছু অধিকার বা চাওয়া পাওয়া আছে, চারিত্রিক মূল্যবোধ উন্নত আর প্রবৃত্তি খারাপ বিষয় এমন ধারণাবশতঃ এ দুটির একটির মাধ্যমে অপরটির উপর সীমালঙ্ঘন করা ইসলামে নিষেধ। তোমাকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝাতে ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একটি হাদীস উল্লেখ করব, সেটি হলোঃ একদা তিনজন সাহাবী রাসুলের (সাঃ) গৃহে আসলেন, তার স্ত্রীদের কাছে গৃহে রাসুলের (সাঃ) আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যখন তারা রাসুলের (সাঃ)আমলের কথা শুনলেন তখন তারা এ আমলকে কম মনে করলেন, আর ভাবলেন এটা হয়ত রাসুলের (সাঃ) নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (কেননা আল্লাহ পাক তার পূর্ব ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছে)। আর তাহারা (উক্ত তিন সাহাবা) নিজেদেরকে অনেক গুনাহগার ভেবে আমলের ব্যাপারে অনেক বাড়াবাড়ি করলেন যা তাদের সৃষ্টির সহজাত প্রয়োজনকে কর্তন করল। তাদের মধ্যে একজন বললেনঃ আমি সারা জীবন রাতে নামাজ পড়ব, রাতে ঘুমাবোনা, অন্যজন বললেনঃ আমি প্রতিদিন রোজা রাখব (অর্থাৎ ফজর থেকে সুর্যাস্থ পর্যন্ত খাবার, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকব), তৃতীয়জন বললেনঃ আমি নারী থেকে বিরত থাকব, অতএব জীবনে কখনো বিবাহ করবনা। অতঃপর রাসুল (সাঃ) তাদের কাছে এলেন, বললেনঃ "তোমরা এ ধরণের কথা বলেছ, খোদার শপথ, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ পাককে অধিক ভয় করি, কিন্তু আমি রোজা রাখি আবার রোজা ভাঙ্গি, নামাজ পড়ি আবার ঘুমাই এবং নারীকে বিবাহ করি, অতএব, যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভূক্ত নয়"। উক্ত তিন ব্যক্তি দ্বীনের মাঝে তথা আমি মহান তন্ত্রের মধ্যে এমন কিছু বিষয় বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন যা মূলতঃ ফযিলত বা পছন্দনীয় বিষয়,কিন্তু এতে অন্য অধিকারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে; এমনকি যদিও সেটা তার প্রবৃত্তির অধিকার হোক না কেন। এ বিষয়টাকে আরো স্পষ্ট করে অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে,রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমার রবের রয়েছে তোমার উপর অধিকার (ইবাদত করা ইত্যাদি) তোমার আত্মার রয়েছে তোমার উপর অধিকার, তোমার স্ত্রী-পরিবার পরিজনের

রয়েছে তোমার উপর অধিকার। সুতরাং প্রত্যেক অধিকাররীকে তার প্রাপ্ত অধিকার বুঝিয়ে দাও"। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে এ ব্যাপারে অনেক আয়াত রয়েছে, যেমনঃ **আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না"। (সুরা কাসাসঃ ৭৭)**

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ "তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃতি, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে" (সুরা বনী ইসরাঈলঃ ২৯)।

আর বন্ধু তুমি হয়ত জান, ইসলাম সন্ন্যাসী জীবনযাপন হারাম করেছে।

ইসলামে মানুষ তার জ্ঞান ও অন্তর্নিহিত বিবেককে পরিতুষ্ট রাখে ; এর দ্বারা সে দ্বীনের বাস্তবায়ন করে এবং সাথে সাথে তার সহজাত প্রবৃত্তিকেও পরিতৃপ্ত করে, এতে কোন প্রকার সংঘাত, বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা থাকেনা।

রাশেদ ও মাইকেল যখন তাদের আলোচনায় মগ্ন ছিল তখন পাশের টেবিলে বসা এক যুবক তাদের কাছে আসল, তাদের সামনে এসে বললঃ

আমি কি তোমাদের সাথে বসতে পারি?

মাইকেল ও রাশেদঃ খুবই আনন্দের বিষয়, বসুন।

যুবকঃ আসলে তোমাদের আলোচনা আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে, আমি খুবই কৃতজ্ঞ হব যদি আমরা পরস্পর পরিচিত হই এবং তোমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দাও।

মাইকেলঃ আমার কোন অসুবিধে নেই।

রাশেদঃ তোমাকে সুস্বাগতম, ইনি আমার বন্ধুবৃটেনের অধিবাসী মাইকেল, সে শিক্ষকতা করে। আর আমি মিশরের অধিবাসী রাশেদ, লেখক ও সাংবাদিক।

যুবকঃ তোমাদেরকেও স্বাগতম, তোমরা আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করায় আমি খুবই আনন্দিত। আমি আমার পরিচয় দিচ্ছিঃ আমি ভারতের অধিবাসী রাজিব,জার্মানীতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি, প্যারিসে কিছু বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এসেছি।

মাইকেল ও রাশেদঃ রাজিব তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুবই ভাল লাগল।

রাশেদঃ এভাবেই আমরা দেখি যে, পশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা নফস বা আত্মাকে তার দোষত্রুটি, অসুখ, ব্যাধি ও দুর্ভোগের কারণ ইত্যাদির দৃষ্টিকোণেই দেখেন। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে নফস বা আত্মা কল্যাণ ও অকল্যাণ দুটিই বহন করে।এতে করে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের মাঝে কোন ধরনের বিরোধ ছাড়াই নফসের পরিবর্তন সাধন করে তাকে পশুত্বের অন্ধকার থেকে বের করে উন্নত চরিত্রের উচ্চ শিখরে উন্নীত করা যায়।

রাজিবঃ আমি তোমাদের আলোচনার সারাংশে বলব যে, যখন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও চাহিদা সরাসরি পন্থায় বা ভিন্ন ভাবে পরিতৃপ্ত হতে উপায় খুঁজে, তখন তাকে সভ্যতার বিবেচনা করতে হয় যে সভ্যতা উন্নত মূল্যবোধ, চরিত্র নিয়ে গঠিত, আর এটাই ফ্রয়েডের মতে এমন সভ্যতা, যা প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রনের জন্য সৃষ্ট।

ইউরোপীয় সভ্যতার ফলে যে চারিত্রিক মূল্যবোধ তৈরী হলো তাতে মহাবিশ্বের ধারণা বেশি প্রধাণ্য পেল। এ সভ্যতায় মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া হলো এ হিসেবে যে, মানুষই এ বিশ্বের মূল। এসব বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে সে সভ্যতা থেকে ইলাহ বা আল্লাহর ধারণা বিলোপের কারণে । আর ইসলামী সভ্যতায় আল্লাহর ধারনাই হল মূল পরিচারিকাশক্তি, তবে এ ধারণা মানুষের অস্তিত্ব ও গঠনকে চূর্ণ করে না।

রাশেদঃ এটাই বড় দলিল যে, মানবসমাজে উন্নত চরিত্রের জন্য তার উৎস অহী হওয়া অত্যাবশ্যকীয়, মানুষের বিবেক নয়। কেননা মানুষের বিবেক একাকী অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর আকল বা বিবেক যখন ওহীর কাঠামোতে কাজ করবে তখন কাংখিত চরিত্রাবলির সৃষ্টি হবে।

মাইকেলঃ রাজিব, তোমার উপস্থিতি আমাদের আলোচনাকে আরো প্রাণবন্তর করে তুলবে। আমার মনে হয় আমরা কাল কোন এক সময় এখানেই আলোচনার জন্য মিলিত হতে পারি, তোমাদের জন্য কি এ স্থান উপযুক্ত?

রাজিবঃ হ্যাঁ, আমার জন্য উপযুক্ত।

রাশেদঃ আমি খুবই আনন্দিত হব যদি তোমরা কাল ঠিক এই সময়ে আমাদের নতুন বন্ধু রাজিবের সংবর্ধনায় দেয়া দুপুরের খাবারের দাওয়াত গ্রহণ কর।

মাইকেল ও রাজিবঃ অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমরা গ্রহণ করলাম।

ঈমানের প্রয়োজনীয়তা



ঈমানের প্রয়োজনীয়তা

বন্ধুরা পূর্বনির্ধারিত সময় মত যুব-আবাসে এসে মিলিত হল। খাবারের মেন্যু দেখে মাইকেল ও রাশেদ তাদের অর্ডার জানাল, রাজিব তখন আরেকটু চিন্তা করছিল, সে বললঃ

অনেক হোটেলে পূর্নাংগ নিরামিষ খাবারের ব্যাপারে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়না। যাই হোক আমার পছন্দের খাবারের অর্ডার দিচ্ছি।

মাইকেলঃ তাহলে তুমি নিরামিষ ভূজি?

রাজিবঃ হ্যাঁ, ভারতের প্রায় ৪০% লোক নিরামিষ ভূজি।

রাশেদঃ কিন্তু এটা কি ধর্মীয় কারনে নাকি স্বাস্থ্যগত কারনে?

রাজিবঃ প্রকৃতপক্ষেযে হিন্দু ধর্মে আমি দীক্ষিত, তাতে গরুর মাংস ভক্ষণ সম্পুর্ণরুপে নিষেধ। ভারতে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নিকট নিরামিষ খাবার খুবই প্রচলিত। যদিও এ নিয়মের নির্মমতার কারণে এদের সংখ্যা এখন দিন দিন কমে যাচ্ছে, তবে আমি স্বাস্থ্যগত এবংপরিবেশগত কারনে নিরামিষ খাবার পছন্দ করি।

রাশেদঃ (ওয়েটারকে ডেকে)ঃ এগুলো আমাদের অর্ডার, প্লিজ এগুলো দাও।

মাইকেলঃ কিন্তু রাজিব, তুমি তোমার ধর্ম ত্যাগ করে কোন ধর্ম গ্রহন করেছ?

রাজিবঃ কোন ধর্মই না। আমি জার্মানীতে পড়াশুনা কালীন সময় এ ব্যাপারে প্রচুর অধ্যয়ন করি, হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে ভাবতে থাকি, যা অনেক সমালোচনা ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। আর আমি খৃষ্টান ধর্মেও বিশ্বাসী নই। তাই অনেকটা নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী।

মাইকেলঃ এ সন্দেহের ব্যাপারে আমিও তোমার কাছাকাছি। তবে আমি মনে করি যে, মানুষের কখনো কখনো কোন ইলাহ বা রবের সাথে সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। তবে এ সম্পর্ক যেন কখনো মানুষের উপর স্বেচ্ছাচারী বা নিয়ন্ত্রণকারী না হয়।

রাশেদঃ আমি মনে করি তোমার এ কথাটাকে বিশ্লেষণ করা উচিত।

মাইকেলঃ কোন কথা?

রাশেদঃ নাস্তিকতায় চিন্তাভাবনা, মানব জীবনে দ্বীন ও প্রভুর অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তা।

রাজিবঃ আমি মনে করি বিজ্ঞানে মানুষের উন্নতির ফলে অনেক রহস্য প্রকাশিত হয়ে গেছে , ফলে অদৃশ্যের ব্যাখ্যার আর কোন দরকার নেই। আমি মনে করি পৃথিবী একটা বৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর পরিচালিত। এভাবে বলা যায় যে, মহাবিশ্ব স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক অবশ্যম্ভাবী কঠোর নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কারণে এখানে যা কিছুই হচ্ছে তা সেই অবশ্যম্ভাবী নির্ধারিত ফলাফলের কারনেই হচ্ছে। আর যখন এ মহাবিশ্ব এ সব স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক অবশ্যম্ভাবী কঠোর নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তখন স্রষ্টার চিন্তা ভাবনার দরকার নেই।

রাশেদঃ আমাদের চারপাশে যা আছে তা বুঝতে বিজ্ঞান একটি চমৎকার উপকরণ, কিন্তু ব্যাপারটা এভাবে নয়। এভাবে আমরা মানবেতিহাসের এতবড় একটি বিষয় নিয়ে আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী শুধু এক দিক থেকে আলোচনা করতে পারিনা, এ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে অনেকগুলো দিক বিশ্লেষন করতে হবে; সেগুলো হলোঃ

আমাদের চারপাশের সব ঘটনার ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান দিতে পারে? অবশ্যই না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যখন আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান পেলাম তখন দেখলাম যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বলছে, এ বিশ্বে যা কিছু আছে তার মাত্র ৫% আবিষ্কার করতে পেরেছি আমরা, বাকিগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন উপাদান, সেগুলো সম্পর্কে কিছুই জানিনা। এটা বলা হচ্ছে তাদের বর্তমান ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী, তবে ভবিষ্যতে না জানার এ পরিমান বৃদ্ধির অনেক বেশী সম্ভাবনা রয়েছে।

এই যদি হয় আমাদের এ পরিদৃষ্ট মহাবিশ্বের অবস্থা, তবে অদৃশ্য বিশ্বের কি অবস্থা কি হতে পারে?!

এ কারনেই আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিতঃ বিজ্ঞানের কি কোন সীমারেখা আছে যেখানে সে স্থির হবে? আমাদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞানের সক্ষমতা যতই হোক না কেন সব কিছুর ব্যাখ্যায় তা সীমাবদ্ধ। অদৃশ্য জগত বিজ্ঞানের উপলব্র নাগালে নেই, কেননা বিজ্ঞান কোন কোন দৈহিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতেই অক্ষম । তাহলে অদৃশ্য জগতের ব্যাখ্যা কিভাবে দিবে যাকে কোন ল্যাবরেটরিতে বা অন্য কোন প্রত্যক্ষ উপায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায়না?!

আরো যোগ করলে বলা যায় যে, কোন বস্তুর গঠনের পদ্ধতি জানার কারণে তার সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করা বা তার সৃষ্টিকে খাটো করে দেখা উচিত নয়।যেমনঃ একজন মানুষ যদি প্রথমে টেলিভিশন দেখে আশ্চর্য হয়, অতঃপর সে এটার তৈরীপ্রনালী সম্পর্কে জানে এর অর্থ এ নয় যে সে এটার আবিষ্কারককে অস্বীকার করবে বা তার কাজটাকে খাট করে দেখবে। এমনিভাবে যখন আমরা জীববিজ্ঞানের মাধ্যমে জীবকোষের রহস্য উদ্ধার করতে এবং ডিএনএ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি আর এর আশ্চর্য প্রকাশ পেয়েছে তখন এর মানে কি এই যে এতে কোন বিস্ময়কর কিছু নেই? বা এর পিছনে কোন স্রষ্টা নেই? বরং উল্টো, যখন মানুষ এ বিস্ময়কর সৃষ্টির সামনে অনুরুপ সৃষ্টি করতে এবং এতো ক্ষুদ্র বস্তুর কার্যকারীতার ব্যাখ্যা দিতে অপারগ হয়ে পড়ে তখন সেটা তাকে এ বিশ্বাসের দিকেই ধাবিত করে যে, এ সৃষ্টির পিছনে একজন স্রষ্টা রয়েছেন।

আরেকটি উদাহরণ নাওঃ আমেরিকার জীব বিজ্ঞানের অধ্যাপক সীসিল পেস হামান বলেছেনঃ

"খাদ্য মানব দেহের অংশে পরিণত হওয়ার আশ্চর্যজনক কার্যপ্রণালীইতিপূর্বে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হত। বর্তমানে ইহা চাক্ষুষ দর্শনের দ্বারা বলা হয় যে রাসায়নিক কার্যক্রমের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাই বলে কি তা আল্লাহর অস্তিত্বকে বাতিল করে দেয়? তাহলে কোন শক্তি রাসায়নিক উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের জন্য উপকারী কার্যকরী বস্তুতে পরিবর্তন করে? মানব শরীরে খাদ্য প্রবেশ করলে ইহা স্বয়ং ক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে। এটা অসম্ভব যে, এই আশ্চর্যজনক পদ্ধতি এমনি এমনিই কাজ করে, এটা দেখার পর নিশ্চিতভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, আল্লাহ তায়া'লা যে মহান নিয়মের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে পদ্ধতিতে এ সব করেন"।

মাইকেলঃ কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনের থিওরী এ অর্থেই, তথা বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যকীয়তা ও স্রষ্টার সৃষ্টিকে বাতিল করার অর্থে, বলেছে যে, সৃষ্ট সব জীব একটা স্বয়ংক্রিয় প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মলাভ করেছে ও বেড়ে উঠেছে, যেখানে কোন সৃষ্টি নেই।

রাশেদঃ এই বিবর্তনের থিওরী ও অন্যান্য থিওরির উপর একটা প্রশ্ন চলে আসে, সেটা হলো, সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা কি সার্বজনীন ও স্থির? অনেক জ্ঞানীরাই এ কথা ভুলে যান যে, বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হলো সামষ্টিক ও বৈল্পবিক, এ দু'টো জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কেননা এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তথ্য, জ্ঞান ওআবিষ্কারসমূহ একত্রিত হয়ে পূর্বের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টি সৃষ্টি করে এবং জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দেয়।

অতএব ডারউইনের বিবর্তনের থিওরী - সর্বোপরী ধরে নিলে বলা যায় যে, এটা একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বাস্তব বিজ্ঞান সম্মত পর্যায়ে পৌছেনি, এমনকি একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা থিওরীর পর্যায়েও পৌছেনি, বরং এটা উন্নতির পর্যায়ে একটা ধারনা, এ সব ধারনা আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব আবিষ্কারের সাথে সাংঘর্ষিক... তাছাড়া যেসব খননকাজে ক্যামব্রিয় যুগের অনেক বড় বড় পশু প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে , এসব যুগকে ক্যামব্রিয় বিস্ফোরণ বলা হয়, তার সাথেও সাংঘর্ষিক। এমনিভাবে প্রানীর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় যা একটি অন্যটি হতে পরিবর্তন হয়ে সৃষ্টি নয়, যেমনিভাবে বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়।

রাজিবঃ তাহলে এই ধরা কোন স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনিতে বিকশিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই?

রাশেদঃ তাহলে শোন আমি তোমাদেরকে গণিত এবং সমাপতন আইনের মৌলিক রীতি অনুযায়ী কাকতালীয়ভাবে সৃষ্টি হওয়ার ব্যাখ্যাটা আরো স্পষ্ট করে বলি, যাতে বুঝতে পারো যে, কাকতালীয়ভাবে কোন কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভাবনা কতটুকুঃ

ধরে নেই আমাদের কাছে বড় একটি বক্সে হাজার শব্দমালা ভর্তি আছে, তাহলে হয়তো সেখানে (أم) শব্দটির জন্য মীম অক্ষরের পাশে আলিফ অক্ষরটি থাকার অনেক সম্ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু দীর্ঘ একটি কবিতা বা গল্প বানানোর জন্য এসব অক্ষর সয়ংক্রিয়ভাবে সুবিন্যাস্ত থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, অসম্ভব যদি না ও হয়।

বিজ্ঞানীরা পরমাণু জমা করে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এ থেকে অ্যামিনো এসিড তৈরি হয়, (অ্যামিনো এসিড) এমন উপাদান যা থেকে প্রোটিন ও মাংস তৈরি হয়। তারা দেখেছেন এগুলো হতে কোটি কোটি বছরের দরকার, এবং এমন উপাদান প্রয়োজন যার জন্য সুবিশাল বিশ্বেও স্থান সঙ্কুলান হবেনা। এটা শুধুমাত্র ক্ষুদ্রর একটি অংশের ক্ষেত্রে, তাহলে সকল প্রাণী জগত, গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির তৈরি ও গঠনের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? জীবন ও বিশ্ব তৈরির ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়? এটা বিবেকের কাছে অসম্ভব ব্যাপার যে, অন্ধ কাকতালীয়ভাবে এমনি এমনিভাবেই এগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞানের সব শাখা প্রমাণ করেছে যে, বিশ্ব পরিচালনায় অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আশ্চর্য নিয়ম কানুন আছে, এ সব কানুনের কিছু স্থির, আবার কিছু পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানীরা এগুলো আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহনের মত অনেক ঘটনা আমরা শত শত বছর আগে আন্দাজ করতে পারি।

তাহলে কে এ সব নিয়ম কানুন সৃষ্টি করেছেন? প্রত্যেক অণু পরমাণুতে এ সব নিয়ম বাস্তবায়িত করেছেন, বরং অণু পরমাণু ছাড়াও আরো সূক্ষ্ম জিনিসের প্রথম সৃষ্টির সময় এ সব নিয়ম কানুন বাস্তবায়ন করেছেন। কে এসব আইন কানুন প্রণয়ন করেছেন ও সব কিছুর মাঝে সমতা ও সামাঞ্জস্যতা বিধান করেছেন? কে তিনি যিনি ডিজাইন করেছেন, অতঃপর সুন্দর করে উত্তম পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন? এসবকিছু কি স্রষ্টা ব্যতিতই সৃষ্টি হয়েছে? নাকি মানুষ নিজেই এগুলো সৃষ্টি করেছে? এভাবেই মুসলমানদের কিতাব আল কোরআন জিজ্ঞেস করেছেঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?"** (সুরা আত্ব তুরঃ ৩৫)

এ বিশ্ব যে আইন কানুনে চলে এবং দৃষ্টি মেলে আমরা জগতে যে অপূর্ব সৃজনশীলতা দেখি তা প্রমাণ করে যে, এমন একজন বিজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, সুপরিপক্ক সৃষ্টি কর্তা আছেন যিনি এ সব এত সুন্দর করে সৃজন করেছেন।

মাইকেলঃ এখানে একটা প্রশ্ন জাগে - যদিও আমি সেটাকে সমর্থক করিনা- ঃ দ্বীন ও আল্লাহর উপর বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কি? অনেক লোকইতো আল্লাহর উপর বিশ্বাস না করে জীবন যাপন করছে।

রাশেদঃনৃবিজ্ঞান (নৃতত্ত্ব) ও ধর্মবিজ্ঞানের গবেষনায় দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের প্রয়োজনীয়া সব যুগে, সব সমাজে সকল মানুষের কাছেই ছিল। মানুষ আদিকাল থেকেই ইবাদত করার জন্য একজন ইলাহকে খোঁজ করত, তাঁর কাছে কিছু চাইত, বিশ্বাস করত যে, তিনি খুব শক্তিশালী, এ বিশ্বের নিয়ন্ত্রক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি সদাজীবিত, মৃত্যু বরণ করেন না।

মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই মানুষ সমস্যা, বিপদ, হুমকি , ঝুঁকি ও হতাশায় পতিত হয় তখনই মানুষের এমন জৈবিক প্রয়োজন দেখা দেয় যা তাকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে ধাবিত করে।

এমনিভাবে, মানুষ ঈমান ব্যতিত অনেক সময় এমন পশুতে পরিণত হয় যাকে তার প্রবৃত্তি পরিচালনা করে, বিবেক তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনা।

রাজিবঃ রাশেদ আমাকে বলতে সুযোগ দাও, আমি এমন এক দেশে বসবাস করি যেখানে অনেক ধরণের ধর্ম রয়েছে, এর পর আমি ইউরোপে গেলাম, সেখানে আবার অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানলাম, এখন দেখলাম প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারনা, তাহলে আমরা কিভাবে এর ব্যাখ্যা দিব? কিভাবে জানব যে সত্য প্রভুর গুণাবলী কি হওয়া উচিত? এছাড়াও কিভাবে বুঝব যে কোন ধর্ম সত্য আর কোন ধর্ম অসত্য?

রাশেদঃ ওয়েটার খাবার নিয়ে এসেছে, আমাদের এ আলোচনা সামনের বৈঠকে করব, কিন্তু প্রথমেই আস আমরা পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত এ উক্তিটিতে একমত হই,তাহলোঃ ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, আর বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ"।

সত্যপথের আলো



সত্যপথের আলো

একটি সামাজিক হলের টেবিলে রাশেদ, মাইকেল ও রাজিব তিন বন্ধু একত্রিত হল। প্রত্যেকে নিজেদের পছন্দের পানীয় অর্ডার দিল, রাজিব কথা শুরু করলঃ

আমরা গত সাক্ষাতে সত্য ইলাহ বা ঈশ্বরের গুণাবলী ও কিভাবে সঠিক ধর্ম চেনা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।

মাইকেলঃ আমাকে সত্য ও বাস্তবতা কথা বলতে সুযোগ দাওঃ পদার্থবিজ্ঞান তার বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় অনেক কিছু আবিষ্কার ও বাস্তবায়ন করেছে। গত দুই শতাব্দির তুলনায় চিকিৎসা বিজ্ঞান বর্তমানে লক্ষগুণ উন্নতি লাভ করেছে। যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশাল উন্নতি অর্জন করেছে, আমরা রসায়ন শাস্ত্রের মাধ্যমে পদার্থের মূল উপাদান জেনেছি, এমনিভাবে বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম দ্রুত উন্নয়নের ফলে আমরা অনেক নতুন নতুন গবেষনা ও আবিষ্কার দেখতে পারব। পদার্থ বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা এখন কিন্তু কেউই একথা বলেনা যে, পৃথিবী গোলাকার নয়, অথচ হাজার হাজার বছর ধরে গবেষনা জগত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে আসছে সেগুলো হলোঃ আল্লাহর অস্তিত্ব, ধর্মের বাস্তবতা, মানব জীবনের জন্য উত্তম নীতিমালা, ন্যায়পরায়ণতার অর্থ কি? ইত্যাদির সঠিক ব্যাখ্যা ও ধারনা। আমরা যখন বলি যে, বিজ্ঞান উন্নতি হচ্ছে, তাহলে কেন এ কথা বলা যাবে না ধর্মও উন্নতি হচ্ছে?!

রাশেদঃ হাজার বছর ধরে মানুষের বিশ্বাস, অনুভূতি এবং ধারনাগুলোর পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষ চলে আসছে ,আজকের দিনেও সেগুলোর মাঝে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংঘর্ষ চলছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের আকল বা জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানে এতটা উন্নত হয়নি যতটা উন্নত হয়েছে পদার্থ বিজ্ঞানে। এটা একারনে যে, আমাদের মূল অস্তিত্ব কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। এমনি ভাবে মানুষের বড় বড় বিষয়াবলী যা মানুষকে ভাবায় তার কোন পরিবর্তন হয়নি। মানুষ সব সময় তার পূর্ন অস্তিত্বের বিকাশের কথা ভাবে, এ অস্তিত্বের সাথেই সে নিজেকে মিশিয়ে নেয়। সে ব্যাখ্যা খোঁজে তার প্রকৃতির স্বভাব- ধরণের যা তাঁকে তার প্রকৃতির খুব কাছাকাছি করে দিবে, এসব ঘটনা ও বাস্তবতার সাথে তার প্রকৃতির সম্পর্ক কি? কেন আমাদেরকে সৃষ্ট জীব করা হয়েছে, তথা এমন সৃষ্টজীব আল্লাহর সাথে এবং অন্যদের সাথে যার সম্পর্ক নির্ধারিত? অথচ এ মানুষটি এক সময় ছিলনা। এ জন্য এধরনের বিষয়ে আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে জ্ঞান লাভ করতে পারি যেমনিভাবে বর্তমানের উলামায়ে কিরামগন থেকেও জ্ঞান লাভ করতে পারি। যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সে গুলো মূলত উত্থিত বিষয়, আর সেগুলো মহাবিশ্ব, জীবন, মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কিত। মানুষ যখন পদার্থ বিজ্ঞানের কিছু বাস্তবতার উপর একমত হয়েছে , কিন্তু ভাব-অনুভূতি, চিন্তা-গবেষনা বিষয়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে একমত হতে পারেনা। এটা মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য যা কখনো শেষ হবেনা।

মাইকেলঃ তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে, এ সব বাস্তবতায় আমরা কখনো পৌঁছতে পারবনা।

রাশেদঃ কে বলল একথা? তাহলে আলোচনার উদ্দেশ্য কি? আমি মনে করি আমরা আবেগ এবং গোঁড়ামি ত্যাগ করে সত্য জানতে এ বিষয়ে উন্নত মেধা বিতর্কের মাধ্যমে আলোচনা করলে সমাধানে পৌঁছতে পারব। যে ব্যক্তি একনিষ্ঠার সাথে সত্য পথ জানতে চায়, আল্লাহ পাক তাকে সে পথের সন্ধান দেন এবং পৌঁছিয়ে দেন। এর প্রমান হলোঃ এ সব ধারণা এবং অনুভূতি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক থাকা সত্যেও ইতিহাসে নবী রাসুল, সৎ বান্দা ও চিন্তাবিদের মাধ্যমে বরং কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় ভাবে এসব ধারণার অনেক উন্নতি ও বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু মূল কথা হলো মানুষের হয়রানী, বিভ্রান্তি এবং স্ববিরোধিতা মানবিক চিন্তা গবেষনারই বৈশিষ্ট্য, আর এ সমস্যা আগেও ছিল বর্তমানেও আছে।

দু'টি পয়েন্টে আমাকে আলোচনা করতে সুযোগ দাও, সে দু'টো হলোঃ

প্রথমতঃ পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি একথা অত্যাবশ্যকীয় করেনা যে, চিন্তা, অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণার ও উন্নতি হতে হবে। যেহেতু এ দুয়ের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই। এর প্রমান হলো আমেরিকা ও জাপানে পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি হওয়া সত্যেও তাদের মাঝে চিন্তা, অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণা, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে অনৈক্য বিদ্যমান। তাই এর অর্থ দাঁড়ায়, কোন সমাজে পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি চিন্তা-ভাবনা বিজ্ঞানের উন্নতিকে জরুরী করে না।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের সমর্থন বা অসমর্থনের দ্বারা বাস্তবতা অর্জিত হয়না। কেননা অনেক সময় ভুলের উপর মানুষের ঐক্যমত হয়ে থাকে। বরং ইতিহাসের সাক্ষী হলো অনেক মানুষ ভুল চিন্তা ধারা, অনৈতিকতা এমনকি মারাত্নক অপরাধের উপর ঐক্যমত হয়েছে।

রাজিবঃ তোমার সাথে একমত। কিন্তু আমরা মূলেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, পরস্পর বিরীধী বিশ্বাস, ও আবেগ-অনুভূতি নিয়ে আছি। এজন্য আমাদেরকে প্রথমত কিছু মূলনীতি, প্রমাণাদির উপর ঐক্যমত হতে হবে যাতে আমরা এগুলো দিয়ে দলিল প্রমাণ দেয়া যায়।

মাইকেলঃ আমি মনে করি, এ ব্যাপারে বিবেক ও জ্ঞান- বিজ্ঞান এদুটোই হলো একমাত্র মাধ্যম,এব্যাপারে আমরা সকলেই একমত।

রাশেদঃ প্রাথমিকভাবে তোমাদের সাথে একমত। কিন্তু তোমরা কোন বিবেকের কথা বলছ? আমার বিবেক তোমার বিবেক নয়, এমনিভাবে কোন বিজ্ঞান? তোমরা কি শুধু পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের কথা বলেছ?

মাইকেলঃ বিবেক দ্বারা আমি বাহ্যিক সর্বজনস্বীকৃত বিবেকের কথা বুঝেছি, বা বিবেকের প্রমাণাদি যাতে আমরা সকলে একমত। আর আমি মনে করি, আমরা কেউই বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত বাস্তবতাকে অস্বীকার করিনা। এগুলো অবশ্যই বৈজ্ঞানিক অনুমান,থিওরি বা সেসব পরীক্ষা নয় যা বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছেনি। তোমরা কি আমার সাথে একমত?

রাশেদঃ একমত। কিন্তু আরেকটি প্রমানের কথা উল্লেখ করব যা উক্ত দু'টো প্রমানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তাহলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির প্রমাণ। এখানে আমি বিবেক ও বিজ্ঞানের প্রমানের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ন কথা বলব, আর তা হলো, বিবেক যেটাকে অকাট্যভাবে ভূল বা অসম্ভব মনে করে তা এবং যেটাকে বুঝা কঠিন মনে করে এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে।

রাজিবঃ সহজাত প্রবৃত্তির প্রমান দ্বারা তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছ?

রাশেদঃ এর অর্থ হলোঃ মানুষের ভেতরের অনুভূতি বা ঝোঁক, যা সব মানুষের রয়েছে। পৃথিবীতে বিদ্যমান সব জিনিসের মাঝে স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যাবলী রয়েছে, চাই সে জড়, উদ্ভিদ, জীব বা মানুষ হোক। যেমন বলা যায়, পানির বৈশিষ্ট্য হলো একশত ডিগ্রী গরমে ফুটবে, মানব বেঁচে থাকার জন্য শরীরের উষ্ণতার প্রয়োজন শতকরা ৩৪-৪২ ডিগ্রি। এসব বৈশিষ্ট্য সব বিদ্যমান প্রাণীর মাঝেই রয়েছে যা তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

মাইকেলঃ তুমি কি মানুষ ও প্রাণীদের সহজাত প্রবৃত্তির কথা বলেছ?

রাশেদঃ মানুষ ও প্রাণীদের মাঝে সহজাত প্রবৃত্তি বলতে তাদের বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা বুঝিয়েছি যা জীবন চলতে সব প্রাণীর ভিতরে থাকে। যেমনঃ হিংস্র প্রাণীর মধ্যে শিকার প্রবৃত্তি। কেউ কিন্তু এ শিকার প্রবৃত্তিকে হিংস্র প্রাণীর মাঝে রোপন করেনি।কিছু কিছু অতিথি পাখি ও মাছের নিজ আবাসের পথ খুঁজে পাওয়ার প্রবৃত্তি, মেয়েদের মাঝে মাতৃত্বের প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির অধিকারীরাণীর মাঝে রোপন করেনি,আছে। মনে করে তা এবং যেটাকে বোঝ কঠিন ওয়ালা এসব অনুভব করতে পারে, কিন্তু সে প্রবৃত্তির জ্ঞানের রহস্যের প্রতি খেয়াল করেনা।

স্বভাব ও স্বভাবজাত বিষয়গুলো শুধু মানুষের মাঝে পাওয়া যায়, ইহা মানুষের মূল জিনিস, বহিরাগত অর্জন নয়। ইহা জানা ও অনুভব করা যায়। কিন্তু স্বভাব ও প্রবৃত্তির মাঝে পার্থক্য হলো এই যে, প্রবৃত্তি বস্তুগত জিনিস থেকে হয়, আর স্বভাব মানবিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত, যেমনঃ জানার আগ্রহ বা ভালবাসা, সত্য অনুসন্ধান, আবিষ্কারের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা, কল্যাণ ও সম্মানের দিকে ধাবিত হওয়া, সৌন্দর্যের দিকে ঝোঁক ইত্যাদি। মানুষ এসব জিনিসের দিকে আকৃষ্ট , ইহা পেতে চায় ও সামাজিক শিক্ষা দীক্ষা, যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রবিষ্ট না করেই এ সবের প্রতি আকর্ষিত হয়। অতএব, স্বভাবজাত জিনিসগুলো মানুষের অন্তরে রোপিত, নিজে নিজেই বেড়ে উঠে, এর উদাহরণ হল পশুদের প্রবৃত্তি, কিন্তু এগুলো মানুষের মাঝে নৈতিকতার সাথে নির্দিষ্ট, এ সব স্বভাব মানুষকে ভাল গ্রহণ ও খারাপ ত্যাগে উৎসাহিত করে। অতএব সুস্থ স্বভাবের এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবেনা যিনি ভাল জিনিস থেকে ভেগে যায়, আর খারাপ জিনিসের দিকে ধাবিত হয়।

রাজিবঃ তাহলে আমরা কিভাবে এসব স্বভাবজাত বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করব যে, এগুলো স্বভাবজাত আর এগুলো স্বভাবজাত নয়?

রাশেদঃ মানুষের স্বভাবজাত জিনিস কয়েকটি গুনে গুণান্বিত, এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলোঃ

ইহা সকলের মাঝে ব্যাপকহারে ও সাধারনভাবে পাওয়া যাবে।

সময়ের সাথে চলতে থাকবে, অতএব একসময় এগুলোর প্রয়োজন হবে আবার অন্য সময় প্রয়োজন হবেনা এমন হবে না।

ইহা মানুষের আভ্যন্তরীন স্বত্বা থেকে আসবে, শিক্ষা বা অর্জন থেকে অর্জিত হবেনা, যদিও শিক্ষা এগুলোকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করে।

পারিপার্শ্বিক প্রভাবদ্বারা প্রভাবিত হবেনা, কিন্তু কখনো কখনো কোন পরিস্থিতিতে প্রভাবিত হতে পারে। স্বভাবজাত জিনিসগুলোর বিশুদ্ধতা পরিবর্তন ও প্রকৃতি বিনষ্ট হতে পারে, এর অবস্থা হল মানুষের অন্যান্য অনুভূতির মতই যেমনঃ শ্রবণ, দেখা, স্বাদ ইত্যাদি যখন রোগে আক্রান্ত হয়, তখন সাধারনত পুরোপুরিভাবে বিনষ্ট হয়না বরং দুর্বল হয়ে যায়, অথবা কার্যকারীতা কমে যায় তবে মূল বাকী থেকে যায়।

মাইকেলঃ আমার মনে হয় আমরা উথাপিত বিষয়ে একমত, তবে শেষ পয়েন্টের কিছু ব্যাপারে সন্দীহান, যে স্বভাব আমাদের আলোচ্য বিষয়ে দলিলের মাধ্যম হতে পারে।

রাজিবঃ তাহলে আমরা স্বভাবের উপর নির্ভরশীল বিষয়ে আলোচনা করতে পারি, যদি আমরা সকলে একমত হই তাহলে তো ভালই, আর একমত হতে না পারলে অন্য দলিল-প্রমাণ খুঁজব।

রাশেদঃ প্রসঙ্গক্রমে, এসব দলিল প্রমানের মাধ্যমের ব্যাপারে আমরা একমত হওয়ার পর আমি একটি বিষয় সতর্ক করতে চাই, তা হলো, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু লোক মনে করেন যে, এ সব মাধ্যম ইসলাম ধর্মের সাথে মিলে না, এটা একটা ভুল ধারণা।

মাইকেলঃ আমরা যা জানি, দ্বীন হলো মহাপবিত্র কিছু আয়াতের উপর ঈমান আনা, এর সঠিকতা কোন সমালোচনা ও সন্দেহ ছাড়া মেনে নেয়া। এ কারনেই ইউরোপে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে এ দু'য়ের মাঝে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধসমূহ হয়েছে, যেহেতু গীর্যাগুলো এ সব আবিষ্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তারা পবিত্র গ্রন্থ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু বিবেক প্রসূত গবেষণার ঘোর বিরোধিতা করেছিল।

রাশেদঃ তোমার কথা কিছুটা সঠিক, কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নয়। এ কথা সত্য যে, ইসলাম মহাপবিত্র আয়াতের উপর ঈমান আনতে বলে এবং ইহার সত্যতা মনে প্রাণে মেনে নিতে বলে। তবে বিবেক , চিন্তা গবেষণা এবং নিজের ও মহা বিশ্বের ব্যাপারে চিন্তা -গবেষণা করে যে জ্ঞান লাভ হয়, ইসলাম তাকে আল্লাহ, কিতাব ও রাসূলের প্রতি ঈমানের পথ হিসাবে সাব্যস্ত করেছে।

রাজিবঃ খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার!! তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ তাহলে বিবেক, চিন্তা-গবেষণা ও বিজ্ঞানের প্রতি সম্মান করে!

মাইকেলঃ হলের দায়িত্বশীলগন দেখছি আমাদের প্রতি ঈশারা করেছেন যে, তাদের হল বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। আমরা এখানেই শেষ করি, আগামীকাল বাকিটা পূর্ণ করব।

রাজিবঃ আমি কাল ব্যস্ত থাকব, আমি খুবই আনন্দিত হব যদি তোমরা আগামী পরশু আমার সাথে সেন নদীর তীরে ভ্রমনের দাওয়াত গ্রহণ কর।

মাইকেল ও রাশেদঃ চমৎকার! অবশ্যই আসব।

তোমার ইলাহ বা স্রষ্টাকে জান!!



তোমার ইলাহ বা স্রষ্টাকে জান!!

একটি রৌদ্রময় বিকেলে তিন বন্ধু পূর্বের সময়মত সেন নদীর তীরে আসল। রাজিব তার বন্ধুদেরকে একটি স্পেশাল বিলাসবহুল নৌযানে ডাকল। তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে নদীর চমৎকার দৃশ্য, সবুজ শ্যামল ঘেরা চারপাশ দেখতে লাগল। রাশেদ আকাশপানে দৃষ্টিপাত করে দু'বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলঃ

নদী-নালা, সমুদ্র, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ এবং আমরা এ বিশ্বে যা কিছু দেখি, বরং যা কিছু দেখিনা... সব কিছুই অলৌকিক হিকমত বা প্রজ্ঞার স্পষ্ট প্রমাণ যা মানব জীবনের স্পন্দন যোগায়। এগুলো প্রমাণ করে যে এ বিশ্বের একজন স্রষ্টা বা প্রতিপালক আছে, তোমরা কি আমার সাথে একমত?

রাজিবঃ আমরা পূর্বের আলোচনায় একমত হয়েছিলাম যে, এ মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকা জরুরী। তবে আমাদের পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু কিছু ব্যাপারে আলোচনা -পর্যালোচনা করা দরকার।

মাইকেলঃ আমি মনে করি আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু রাজিব সত্য স্রষ্টার গুণাবলী কি হওয়া দরকার বলে যে বিষয়ে উত্থাপন করেছে সে বিষয়ে আগে আলোচনা করা দরকার।

রাশেদঃ আমরা যে ধরায় বসবাস করি এবং সৃষ্টিজগতের যে সৃজনশীলতা দেখি, সেটার সাথেই তোমরা যা খুঁজতেছ তার সাথে গভীর সম্পর্ক আছে, যেহেতু ঈমানের মূল হলো আল্লাহ সত্য এ বিশ্বাস; সেটা হলো, এ বিশ্ব সম্পর্কে তোমার কাছে সঠিক ধারণা থাকা, তুমি নিজেও যে বিশ্বের অন্তর্ভূক্ত। আর তা হবে, এর সমস্ত উপাদান, গঠন এবং এতে অবস্থিত সবকিছুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার মাধ্যমে।

মাইকেলঃ আমরা মেনে নিলাম এ বিশ্বে একজন স্রষ্টা আছেন, কিন্তু এ স্রষ্টার ধরণ বা কল্পনা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকমের, এমনকি এগুলো এতই ভিন্ন ও বিরোধপূর্ন যে মানুষ দিশেহারা হয়ে এ সবের থেকে ভেগে যায়, আর প্রায় নিরীশ্বরবাদ জীবন যাপন করে, যদিও কেউ কেউ সরাসরি এটা স্বীকার করেনা।

রাশেদঃ তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু, কিন্তু আমি একটু সংযোগ করব যে, এ ভেগে যাওয়া তাকে একজন উপাস্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হতে তাকে বিরত রাখেনা,বরং প্রকৃতপক্ষে যারা ইলাহকে অস্বীকার করে সে নিজে নিজেকেই ইলাহ মনে করেন, সে তার খামখেয়ালীকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়। অবাধ্য নাস্তিকেরা আল্লাহর স্বীকৃতি ও ঈমান হতে ভেগে গিয়ে অন্য এমন বস্তুর দিকে ধাবিত হয় যাকে ঐসব গুনের অধিকারী মনে করে যা একমাত্র ইলাহের জন্য হতে পারে। আর তা করে থাকে শুধুমাত্র ইলাহ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা হতে পলায়ন করার জন্যই।

রাজিবঃ যখন আমরা ইলাহর গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করতেছি তখন আমরা একথা বলতে পারি যে, ইলাহ হবেন মহান, প্রিয় এবং একই সময় পরাক্রমশালী। মানুষ তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষীতা অনুভব করবে হবে। এটা মানুষের দিক থেকে। কিন্তু এ সব গুণাবলী প্রকৃতপক্ষে মানুষের অবস্থার আলোকে পাওয়া যায়। ফলে একাধিক ব্যাক্তি একাধিক ইলাহের ব্যাপারে এমন গুনাবলী লক্ষ্য করতে পারে। তাই আমাদেরকে ইলাহের এমন কিছু গুণাবলী উপস্থাপন করতে হবে যে ব্যাপারে সব মানুষই একমত।

রাশেদঃ তোমার কথা খুবই সুন্দর এবং সঠিক.... আমরা সেটাই আলোচনা শুরু করে তা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের সকলের স্বীকারোক্তি যে, অবশ্যই একজন ইলাহ আছেন, আমরা আরো একমত হয়েছিলাম যে, এই সুবিন্যাস্ত বিশ্বে একজন শক্তিশালী স্রষ্টা আছেন, যিনি এটাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। এই স্রষ্টাকেই আমরা রব বা প্রতিপালক বলি। এই রবই আমাদেরকে ও সব সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন,তিনিই প্রকৃতপক্ষে উলুহিয়্যাত বা ইলাহ হওয়ার যোগ্য ও ইবাদত পাওয়ার অধিকারী। তাঁকে ছাড়া কাউকে ইবাদত করা উচিত নয়। অর্থাৎ তুমি যেভাবে বলেছ যে, তাঁর মর্যাদা, ভালবাসা, ভয়, আশা ইত্যাদি ছেড়ে অন্য কারো দিকে ফেরা বা কোন কিছু আশা করা উচিত নয়। এভাবেই আমরা প্রকৃত ইলাহ বা আল্লাহর গুণাবলী মোটামোটিভাবে বুঝতে পারি।

রাজিবঃ যখন তোমার কথা মেনে নিলাম, তখন আমি বলতে পারি যে, আল্লাহর প্রথম গুণ হলো সদা বর্তমান, তিনি চিরঞ্জীব, এমনিভাবে তিনি সব সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা।

রাশেদঃ তোমার কথা সঠিক, এটা আরো একটা বিষয় জরুরী করে তোলে, আর সেটা হলো এ ইলাহর জাত (স্বত্তা) ও সিফাত (গুণাবলী)সৃষ্ট নয়, কারণ সৃষ্টিকারী কখনো সৃষ্টজীব হতে পারেন না। কেননা, যদি তিনি সৃষ্টজীব হবেন তবে তিনি আমাদের মতই হবেন, তাঁরও একজন স্রষ্টা থাকবেন, ফলে তিনি ইলাহ হতে পারেন না, আর তাঁকে ইবাদত ও করা যায়না। তাই সব সৃষ্টিকূলের কেউই ইলাহ হতে পারেন না।

মাইকেলঃ তাহলে আমাদের জানা উচিত স্রষ্টার অর্থ কি?

রাশেদঃ সংক্ষেপে বলতে পারি যে, স্রষ্টা হলেন পূর্ব কোন নমুনা বা সাদৃশ্য ছাড়া কোন কিছুর উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকারী, অর্থাৎ যিনি অনস্তিত্ব থেকে সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি একমাত্র অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে সক্ষম। তিনিই এ সৃষ্টিকূলকে সুন্দরভাবে সুবিন্যাস্ত করে সৃষ্টি করেছেন, এতে রয়েছে অনেক হিকমত বা প্রজ্ঞা, তিনি অনর্থকভাবে সৃষ্টি করেননি, বা এগুলো এমনি এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি।

আর সৃষ্টজীবের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী হলোঃ তার সৃষ্টির পূর্বে কোন অস্তিত্ব ছিলনা, অর্থাৎ সে নতুন সৃষ্ট, তাঁর শুরু আছে, তার অবশ্যই একটা শেষ রয়েছে, তাঁর ক্ষমতা ও সক্ষমতাও সীমাবদ্ধ, সর্বদা অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী।

রাজিবঃ যখন এমন ইলাহ স্রষ্টা হবেন তখন অবশ্যই তিনি তাঁর সৃষ্টিজীবের মালিক হবেন।

যখন আমরা বললাম, আসমান-জমিন আল্লাহর, তিনি সৃষ্টি করেছেন, তখন এটা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে যে, তিনি সব কিছু জানেন, কেননা কোন কিছু যদি তাঁর কাছে গোপনীয় থাকে তবে -সে গোপন আবস্থায়-বান্দা স্রষ্টা থেকে স্বাধীন হয়ে যাবেন। আল্লাহর জ্ঞানের প্রমাণ হলোঃ আমাদের দেখা সৃষ্টিজীবকে তিনি প্রজ্ঞা, নির্ভুলতা এবং পরিপূর্ণতা দিয়ে তৈরি করেছেন, আর এটা পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী না হলে সম্ভবপর নয়।

রাশেদঃ মালিকানার ফলে এটা বর্তায় যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুর উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও অধিকার রয়েছে। তাঁর মালিকানা ও পূর্ণজ্ঞান থাকার কারনে এটা প্রমাণ করে যে, তাঁর রয়েছে সবকিছু নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা, সৃষ্টিকূলের জন্য আইনকানুন করা তাঁর অধিকার একমাত্র তাঁরই।

মাইকেলঃ কিন্তু আমিও তো কিছু কিছু জিনিসের মালিক, আমিও তো অনেক কিছু জানি, এগুলো কি তাহলে ইলাহ হওয়ার প্রমাণ করে?... আমার মনে হয় একথা ঠিক নয়!

রাশেদঃ তোমার এ কথাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হে বন্ধু, আমি মনে করি এভাবে একটার পর একটা গুণাবলী উল্লেখ করা- যদিও এগুলো গুরুত্বপূর্ণ-আমাদের পথ অনেক দীর্ঘ করে দিবে, এরচেয়ে আমরা এমন একটা সাধারণ মূলনীতি ঠিক করব যেটা এসব গুণাবলীর মাপকাঠি হবে এবংএর দ্বারা আমরা আল্লাহর গুণাবলী বের করতে পারব। তোমরা আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি তোমাদের কাছে এ মূলনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব, এগুলো প্রকৃতপক্ষে আমার ইসলামি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমি ধারণা অনুযায়ী বলছি।

মাইকেল ও রাজিবঃ বল....

রাশেদঃ সংক্ষেপে এ মূলনীতি হলোঃ

প্রথমতঃ সাধারনত জাতী সিফাত বা মূল সত্ত্বাগত গুণাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ অপূর্ণ গুণাবলী, পূর্ণ গুণাবলী। পূর্ণগুণাবলী হলোঃ ভাল গুণাবলী দ্বারা গুনান্বিত করে তাঁর বিপরীত খারাপ গুণাবলী থেকে মুক্ত রাখা। আর অপূর্ণ গুণাবলী হলোঃ খারাপ গুণাবলী দ্বারা গুনান্বিত করে তার বিপরীত ভালো গুনাবলীকে বাদ দেয়া।

অতএব, খারাপ গুণাবলী থেকে মুক্ত থাকতে হলে, এর বিপরীত গুণাবলীতে গুণান্বিত হতে হবে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া। নতুবা খারাপ গুণ না থাকার অর্থ হবে, কোন একটা অপূর্নতা। কেননা জাত বা সত্তার সাথে কোন গুণাবলী না থাকা আবার অপূর্ণতা ও অক্ষমতা।

দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টজীব যেসব গুণাবলী নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করতে অপছন্দ করে, সে সব গুণাবলীও স্রষ্টার জন্য সাব্যস্ত করা যাবেনা। মাখলুক যেসব জিনিস থেকে দূরে থাকে সেগুলো খারাপ গুণাবলী, অতএব আল্লাহ তায়া'লা এগুলো থেকে মহা পবিত্র ও মুক্ত। এ সব খারাপ গুণাবলী কোন ভাবেই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবেনা, কেননা আল্লাহ পাক হলেন সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য হলোঃ স্রষ্টার অনুরূপ কোন কিছু নেই... আর আমাদের বর্ণিত যেসব গুণাবলী স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়,যেমনঃ মালিকানা, ইলম, রহমত, ভালবাসা.. ইত্যাদি এগুলো প্রকৃত অর্থে উভয়ের ক্ষেত্রে এক হতে পারেনা। কেননা স্রষ্টার গুণাবলী মাখলুকের গুণাবলীর মত নয়, যেহেতু মাখলুকের গুণাবলী অপূর্ণতা এবং উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন উপসর্গ থেকে খালি নয়।

মাইকেলঃ যদি তুমি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলতে তাহলে আরো ভাল হতো।

রাজিবঃ তুমি যে পয়েন্টগুলো আলোচনা করেছ যদি উদাহরণগুলো তার সাথে ব্যাখ্যা কর এবং সেসব উদাহরণগুলো যদি বিগত আলোচনা হতে অথবা বাস্তবতার আলোকে হয় তাহলে ভাল হয়।

রাশেদঃ ভাল, প্রথম পয়েন্টঃ সব জ্ঞানীরাই একমত যে, দুর্বলতা একটি অপূর্ণতার গুণ, এমনিভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী ও অপূর্ণতার গুণ। এ দু'গুণের কোন একটিও ইলাহের গুণ হতে পারেনা, বরং তিনি এ থেকে মুক্ত, আবার একই সময় তিনি এর বিপরীত পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। আর তা হলো শক্তিশালী ও অমুখাপেক্ষী। এজন্যই আমাদের মহাগ্রন্থ আল কোরআন তিনিটি শব্দের দ্বারা ঈসা আঃ ও তাঁর মাতা মারিয়াম আঃ এর ইলাহ বা খোদা হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে, সেগুলো হলোঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "তারা খাবার খেতেন" (সুরা মায়েদাঃ আয়াত ৭৫) অতএব যার খাবার গ্রহনের প্রয়োজনীতা আছে তাঁর ক্ষুধার ও অনুভূতি আছে, আর এতে তাঁর দুর্বলতা ও দৈন্যতা প্রকাশ পায়। আর যে খাবার খায় সে অন্যান্য মানুষের মত খাবারের মুখাপেক্ষী হয়, অতএব তারা দুজন বা তাদের কোন একজনও ইলাহ বা আল্লাহ হতে পারবেন না, কেননা তাদের মাঝে ইলাহের গুণাবলী বাস্তবায়িত হয়নি।

এমনিভাবে, সন্তান গ্রহণ করাঃ সত্য ইলাহ মুখাপেক্ষী সৃষ্টিজীবের সাদৃশ হতে পারেনা। কেননা মানুষ বংশ বৃদ্ধি, সাহায্য কামনা, উত্তারাধিকারী করণ বা অন্যান্য কারনে সন্তান নেয়, আর এসব কিছুই মুখাপেক্ষীতা ও অপূর্ণতার গুণ, যা ইলাহের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনা।

আর দ্বিতীয় পয়েন্ট হলোঃ সব জ্ঞানীরাই অক্ষমতার গুণের সাথে নিজেকে গুণান্বিত করতে অস্বীকার করবে। অতএব, আল্লাহ তাআলা তো এসব গুণের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার অধিক উপযুক্ত। বরং এর বিপরীত পূর্ণতার গুণে তিনি গুণান্বিত, আর তা হলো সক্ষমতা (কুদরত)। এটা এভাবে যে, ঈসা আঃ যখন শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম হলেন, অথবা, মূর্তি বা প্রাণী যা কিছু মানুষ ইলাহ হিসেবে মানে তারা যখন নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেনা, তাহলে তারা অন্যকে, তাদের ইবাদতকারী ও ভালবাসাকারীকে ও রক্ষা করতে অক্ষম। এটা তো স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। সুতরাং অক্ষম কেউ সত্যিকারের ইবাদাতের উপযুক্ত ইলাহ হতে পারেনা।

জ্ঞানীরা সবাই অত্যাচার ও জুলুমের গুণে গুণান্বিত হতে অপছন্দ করেন, ফলে সত্য ইলাহ জুলুম করেন না, তিনি ন্যায়পরায়ণ। এমনিভাবে সব অপরিপূর্ণতাকে বাদ দিলে তার বিপরীত পূর্ণতার সব গুণাবলী সাব্যস্ত হয়।

পরিশেষে, তৃতীয় পয়েন্টঃ উদাহরণ স্বরূপ বলব। ইলম বা জ্ঞানের গুণ, এটা ভাল গুণ, এর বিপরীতটা খারাপ, তা হলো মূর্খতা। জ্ঞানী হওয়া পূর্ণতার গুণ আর মূর্খতা অপুর্ণতা ও দোষ। আল্লাহ পাক পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, কেননা তিনি সর্বময় সার্বজনীন জ্ঞানের অধিকারী, ও সব ধরণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে মুক্ত।

আর মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞানের পূর্ণতা হলো আপেক্ষিক, কেননা সে কিছু বিষয়ের জ্ঞানে গুণে গুণান্বিত, কিন্তু আবার একই সময় সে অন্য কিছু ব্যাপারে অজ্ঞতার দোষে গুণান্বিত। অতএব পরিপূর্ণতা মানুষের ব্যাপারে আপেক্ষিক ব্যাপার, এভাবে বাকি গুণাবলী সমূহ।

মাইকেলঃ অন্ধকার নেমে আসার সাথে সাথে শীত অনুভব করছি, আমার মনে হয় আজ রাতে এ পর্যন্তই যথেষ্ট।

আসমানী আলো (মানুষের জন্য নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তা)



আসমানী আলো (মানুষের জন্য নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তা)

রাশেদ যখন যুব-আবাসের সামাজিক হলে প্রবেশ করল তখন মাইকেলকে একটি টেবিলের পাশে বসে হলের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখতে পেল, যেন সে ঝুলন্ত ঝাড়বাতি নিয়ে চিন্তা করতে ছিল। রাশেদ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করল। মাইকেল এটা খেয়াল করেনি, রাশেদ তার সামনে চেয়ার টেনে বসে বলতে লাগলঃ

মনে হচ্ছে তুমি কোন ব্যাপারে খুবই চিন্তিত.. আমার সাথে কি তোমার চিন্তার বিষয়টা শেয়ার বা আলোচনা করা যায়?

মাইকেলঃ ওহ! দুঃখিত, তোমার আগমন আমি লক্ষ্য করিনি...।

রাজিব এখনো আসেনি?

রাশেদঃ আমাদের নির্ধারিত সময়ের এখনো পাঁচ মিনিট বাকি আছে।

ঐ যে, সে আমাদের দিকে আসতেছে...

রাজিবঃ শুভ অভিবাদন, তোমাদের সাথে দেখা করার জন্য আমি অধীর আগ্রহে ছিলাম।

রাশেদঃ আমরাও ....

মাইকেলঃ প্রকৃতপক্ষে আমি এ ফলপ্রসু আলোচনায় খুবই খুশি... তোমাদের আগমনের পূর্বে আমি একটা বিষয়ে গভীরভাবে ভাবছিলাম, বিষয়টিতে তোমাদের অংশগ্রহণ করাকে আমি পছন্দ করি। আমাদের পূর্বের আলোচনাসমূহ থেকে আমার এ চিন্তা জন্মায়, যে প্রতিপালক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাকেই যখন আমাদের ইলাহ হিসেবে মানা উচিত, তাহলে এটা কি সম্ভব যে তিনি আমাদের সাথে কোন যোগাযোগ না রেখে এবং তাঁকে চেনার কোন পথ না রেখে আমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে রেখেছেন?আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে রাখা কি যুক্তিযুক্ত?

রাজিবঃ তোমাদের এখানে আসার আগে আমিও একই বিষয় নিজে নিজে চিন্তা করেছি।

রাশেদঃ তোমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো খুবই ভাল ও যথাযথ। আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, জমিনে যা কিছু আছে তার সব কিছুই মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, আসমান থেকে তিনি অনেক কল্যাণ বর্ষণ করেন, যদিও তারা সকলে এগুলো পাওয়ার যোগ্য নয়। এই মহাবিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টি এবং তাদের জন্য সব ধরণের নেয়ামতের ব্যবস্থা অনর্থক বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন হওয়া যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।

মাইকেলঃ খুবই সুন্দর, তাহলে আমরা এ পয়েন্ট নিয়েই আলোচনা চালিয়ে যাব।তাহলে, মহাবিশ্ব ও মানব সৃষ্টি এবং তাদের জন্য সব ধরণের নেয়ামতের ব্যবস্থা করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

রাজিবঃ আমার মনে হয় ইতিপূর্বে আমরা সত্য ইলাহের গুণাবলীর যে আলোচনা করেছিলাম তার সাথে এর সম্পর্ক আছে, কেননা রব বা প্রতিপালক এই সৃষ্টির পূর্বেই ছিলেন, কিন্তু আমরা সে সময়টা নির্ধারিত করতে পারিনা।

রাশেদঃ রাজিব তুমি যা বলেছ তা ঠিকই। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করব। উদাহরনটি পুরোপুরি না মিললেও তার কাছাকাছি হবে। যখন তুমি কোন কিছু পছন্দ কর, তখন তার বাস্তবায়ন পছন্দ কর, তাই না?

রাজিবঃ অবশ্যই।

রাশেদঃ তাহলে বাস্তবায়ন করতে কে বাঁধা দেয়?

রাজিবঃ আমার যা মনে হচ্ছে, আমি এটা বাস্তবায়ন করতে পারিনা বলে।

রাশেদঃ তাহলে, যখন তোমার মাঝে সে শক্তির সঞ্চয় হবে, তখন তুমি তা বাস্তবায়ন করতে পারবে... বিষয়টা এমনই।

মাইকেলঃ আমার কাছে বিষয়টা স্পষ্ট না হয়ে আরো অস্পষ্টতা বেড়ে গেল।

রাশেদঃ ঠিক আছে, আমি কথা পূর্ণ করছি... আমরা পূর্বের আলোচনায় একমত হয়েছিলাম যে, আল্লাহ পাকের অনেক সুন্দর সুন্দর গুণাবলী আছে, এ গুণাবলীগুলো সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত গুণাবলী, যা আল্লাহ ও মাখলুক সকলেই ভালবাসে। আল্লাহর সে সব গুণের মাঝে হলোঃ তিনি সৃষ্টিকারী, শক্তিশালী, সক্ষম, মালিক ইত্যাদি। এ সব গুণের ভালবাসার অর্থ হচ্ছে এ কাজ গুলো করা ও বাস্তবায়ন করা। যেহেতু আল্লাহ তায়া'লা সক্ষম ও শক্তিশালী তাই তাঁর ইচ্ছ বাস্তবায়নে কোন কিছুই তাঁকে বাঁধা দিতে পারেনা, তাই আল্লাহ তায়া'লা সৃষ্ট জগতকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রিয় গুণের নিদর্শন হিসাবে। যেহেতু তিনি খালিক বা সৃষ্টিকর্তা তাই সৃষ্টি করাকে ভালবাসেন, যেহেতু তিনি দাতা, তাই তিনি দান করাকে ভালবাসেন। আবার যেহেতু তিনি রহিম বা দয়ালু, তাই তিনি দয়া করাকে ভালবাসেন। তিনি যেহেতু সর্বময় সক্ষম, তাই কোন কিছুই তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ করতে বাঁধা দেয়না।

মাইকেল; তাহলে এসব সমীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান কি হবে? !

রাশেদঃ আমাদের অবস্থান হলো, এই যে, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে চেনা ও জানার জন্য, এবং তাঁকে সব ধরণের অপূর্ণতা ও দোষ থেকে মুক্ত হিসেবে স্বীকার করার জন্য।আমাদেরকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, এগুলোকে শুধু ভোগের জন্য দান করেন নি, বরং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা ও এগুলোর অপব্যবহার না করার জন্য দিয়েছেন। আর এসবের দাবী হলো, একমাত্র তাঁর ইবাদতের স্বীকৃতি দেয়া, কেননা তিনিই একমাত্র দাতা, সৃষ্টিকর্তা, তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য ও উপযুক্ত।

রাজিবঃ তোমার কথায় দুটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়। প্রথমটা হলোঃ তুমি যা বলেছ সেগুলো বাস্তবায়নে কি তাহলে আমরা উপাসনালয়য় বসবাস করব?

রাশেদঃ না, না। তুমি যা মনে করেছ আমি কিন্তু তা উদ্দেশ্য করিনি। ইবাদতের এ অর্থ অসম্পুর্ণ, যা আমার ধর্ম ইসলাম স্বীকার করেনা, ইবাদতের অর্থমানব জীবনের সব ধরণের কার্যক্রমকে শামিল করে, যেখানে জমিনের আবাদ, মানব সভ্যতা গঠন ইত্যাদি রয়েছে।

মাইকেলঃ কিন্তু আমরা দ্বীনের দিকে না গিয়ে জমিন আবাদ করি, বর্তমান সমাজ সভ্যতা গঠন করি ।

রাশেদঃ এ কারনেই আমরা এ সভ্যতায় মানুষের অনেক দুর্ভোগ দেখতে পাই। যেমন দুশ্চিন্তা, আত্যহত্যা, সমকামিতা, সামাজিক অবক্ষয় ও মানুষের একের উপরে অপরের অত্যাচার। বিশেষ করে এগুলোর কারণ হচ্ছে মানুষ নিজেদের কার্যক্রমকে কারো নজরদারী হতে নিরাপদ মনে করার কারণে। আর এগুলো সেসব নীতিমালার অনেকটা কাছাকাছি হয়ে থাকে যাতে শুধু বস্তু এবং তার আবিষ্কার ও উন্নতিতে গুরুত্ব দেয়া হয়। অথচ মানবিক দিক সেখানে অনুপস্থিত। এই দিকটাকে গুরুত্ব দিলে মানবিক বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর তার মধ্যে অন্যতম হলো আত্মিক দিক।যখন সভ্যতা ওমানুষের কাজকর্ম তাঁর স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত হবে, তখন তার সব দিক মানবিকতার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে, বরং সমগ্র মানবজাতি ও মহাবিশ্বের সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। কেননা এটা সহজভাবেই বলা যায় যে, যিনি এ মানব ও বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাদের কল্যাণ- অকল্যাণ, ভাল-মন্দ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

মাইকেলঃ এর অর্থ তাহলে কি এটাই দাঁড়ায় যে, যেমনঃ ইঞ্জিনিয়ার রাজিব যদি কোন কাজ সুচারুরূপে করতে চায় তাহলে তাকে ধর্মের কিতাবের দিকে যেতে হবে?..... এটা কিভাবে সম্ভব?! অতঃপর যদিও তোমার কথা মেনে নেয়া হয় তাহলে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনকে সরল সঠিক পথে পরিচালনা করতে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলব?

রাশেদঃ আমার কথার অর্থ এটা নয় যে, দ্বীন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং জাগতিক কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে অনুপ্রবেশ করবে বা নাক গলাবে। বরং জীবন যাপনের জন্য দ্বীন কিছু মৌলিক নিয়ম-কানুনও নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারন করে দিয়েছে, যা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও এর মাধ্যমে সে এ বিশ্বে তার অবস্থান ও মর্যাদা এবং তার রবের সাথে তার সম্পর্ক জানতে পারে।

আরো স্পষ্ট করতে তোমাদের জন্য দু'টি উদাহরণ দিচ্ছিঃ আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে এবং জমিন ও এতে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন করে জমিন থেকে খাদ্য উৎপাদন করেন। অতঃপর তিনি উহা থেকে ঔষধ ও বিষাক্ত বিষ উৎপাদন করেন। আর আমাদের জ্ঞানে ক্ষমতা দিয়েছেন অখাদ্য থেকে খাদ্যকে বেছে নেয়ার, আমাদের আরো ক্ষমতা দান করেছেন এ সব উদ্ভিদ থেকে উপকৃত হওয়ার এবং পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা করে ঔষধ তৈরি করার। এর পর তিনি তাঁর দ্বীনে আইন করে দিয়েছেনঃ যা কিছু আমাদের বা অন্যদেরকে ক্ষতি করে তা নিষিদ্ধ, ইহা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অন্য আরেকটি উদাহরনঃ ন্যায়বিচার ভাল, আর অন্যায় অত্যাচার খারাপ এ ব্যাপারে সব মানুষই ঐক্যমত। কিন্তু যখন এ ন্যায়বিচারের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যায় তখন দেখবে এটা নিয়ে অনেক মতানৈক্য দেখা দিবে। কেননা মানুষের জ্ঞান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রত্যেক দল তাদের স্বার্থ দেখে। এ জন্যই আমাদের ন্যায়বিচারের একটা মূল উৎসের প্রয়োজন যা সব মানুষের সব ধরণের ক্ষমতার শীর্ষে থাকবে এবং সব মানুষ তার সামনে সমান হবে, তার অধিকারের ব্যাপারে কোন লৌকিকতা, ঝোঁক, প্রবৃত্তির অনুসরণএবং কোন ব্যাক্তিস্বার্থ থাকবেনা।

আর আল্লাহ যা চান তা জানার পথ হলোঃ এসবও আল্লাহর গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। তিনি মালিক ও প্রজ্ঞাময়। আমরা পূর্বের আলোচনায় বলেছিলাম যে, আল্লাহ তায়া'লা এ মহাবিশ্বকে বিশেষ হেকমতের কারণে সৃষ্টি করেছেন, অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। তাহলে তোমরা কি এটা কে প্রজ্ঞা ভাবতে পার যে, যেমনঃ কোন কোম্পানি তার প্রয়োজনীয় সম্পত্তির ব্যাবস্থা করবে, সেখানে উৎপাদন হবে, শ্রমিক ও কর্মজীবিরা চাকুরি করবে, তার যন্ত্রগুলো সচল থাকবে, উৎপাদিত জিনিস বাজারজাত করা হবে...... আর এসব কিছু কোন নিয়ম-কানুন, অফিস ও আইন ছাড়া সম্ভব হবে!!!

মাইকেলঃ অবশ্যই না।

রাশেদঃ তাহলে এই মহাবিশ্ব ও সৃষ্টির ব্যাপারে তোমরা কি মনে কর...এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর কিতাব ও সনদ প্রেরণ করেছেন, যাতে মানবজাতির দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যানের পথ দেখায়। এগুলো আবার তিনি তাঁর নির্বাচিত প্রতিনিধি যাদেরকে নবী ও রাসুল বলা হয় তাদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মাধ্যম, যাতে বান্দা তাদের রব বা প্রতিপালককে চিনতে পারেন। তাহারা মানুষকে ন্যায়ের আলামত দেখিয়েছে, অন্যায়ের ক্ষতিকর দিক বর্ণনা করেছেন, মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অকল্যাণের সব কিছু বর্ণনা করেছেন।

মানুষ রিসালাত বা নবুয়্যাতের প্রতি খুবই মুখাপেক্ষী, কেননা সে দু'টো অবস্থানেঃ একটি অবস্থান তাঁকে ভাল কাজের দিকে টানে, আর অন্যটি তাকে ক্ষতিকর জিনিসের দিকে নিয়ে যায়, রিসালাত হলো আলোকবর্তীকা স্বরূপ যা কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ বলে দেয়। পৃথিবীতে বান্দার জন্য ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে আলোর দিশা ।

ভাল মন্দের মাঝে ইন্দ্রিয় পার্থক্য করা রিসালার উদ্দেশ্য নয়, কেননা এগুলো জ্ঞানহীন পশুপাখিরাও পারে। যেমন গাধা যব ও মাটির মাঝে পার্থক্য করতে পারে। বরং রিসালার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখেরাতে যে সব কাজ ব্যক্তির উপকার বা ক্ষতি করবে তার মাঝে পার্থক্য করা। যদি রিসালা না থাকত তবে বিবেক জীবনযাপনে ভাল মন্দ বিস্তারিতভাবে জানতে পারতনা।

রাজিবঃ দ্বিতীয় পয়েন্ট হলোঃ আমরা দেখি মানুষ আল্লাহ ও তাঁকে অবনত মাথায় মেনে নেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর নেয়ামত ভোগের ব্যাপারে কিভাবে সবাই সমান হবে?!

রাশেদঃ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা, যাতে রবের ব্যাপারে তাদের অবস্থান প্রকাশ পায়। তবে তারা প্রতিদান ও শেষ পরিনতিতে একরকম হবেনা। এ প্রতিদানই সকল রাসুলের রিসালাতের মূল বিষয়, যা এমন আইন ও সনদ,যার দিকে সকলের ফেরা উচিত।

মাইকেলঃ আমি একটা বিষয় যোগ করব, সেটা হলোঃ সব মানুষ কিভাবে আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করে, অথচ তাদের মাঝে কেউ কেউ ধোঁকাবাজ, মিথ্যাবাদী ও অত্যাচারী। আবার তাদের কেহ কেহ সামাজিক শাস্তি থেকে অব্যহতি পেয়ে যায়, আইন তাদের উপর প্রয়োগ হয়না?!!

রাশেদঃ এটাও মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, কিন্তু এ সব লোক যখন সামাজিক শাস্তি থেকে অব্যহতি পায়, আইন তাদের উপর প্রয়োগ হয়না, তারা আল্লাহর সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতা থেকে অব্যহতি পাবেনা। এটাই হলো মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশের হিকমত। অর্থাৎ প্রতিদানের দিন, মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে এবং নিজ ও অন্যের সাথে যেসব ভাল-মন্দ কাজ করেছে তার প্রতিদান সেদিন পাবে। সেদিন সব পক্ষ- প্রতিপক্ষের মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে।

কিন্তু এগুলো বুঝতে একটি রেফারেন্স বা মূলভিত্তির প্রয়োজন হয়, যাতে মানুষ নিজেদের মাঝে সে অনুযায়ী বিচার বিবেচনা করতে পারে এবং সেটা তাদের জানা থাকবে, তাকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করবে। এখানেই নবী রাসুলের রিসালাতের ভূমিকা স্পষ্ট হয়। নবী-রাসুলেরা মানবজাতিকে সেসব মৌলিক বিষয় শিক্ষা দেন যে ব্যাপারে তাদের হিসাব নেয়া হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করা বা তার ব্যাতিক্রম করার জন্য তাদের কি পরিনাম হবে তা তাদেরকে জানিয়ে দেন। তাদেরকে পরকালের সুখ-শান্তি ও আযাবের কথা, এবং কিয়ামতের দিন কি হবে, তা জানিয়ে দেন।

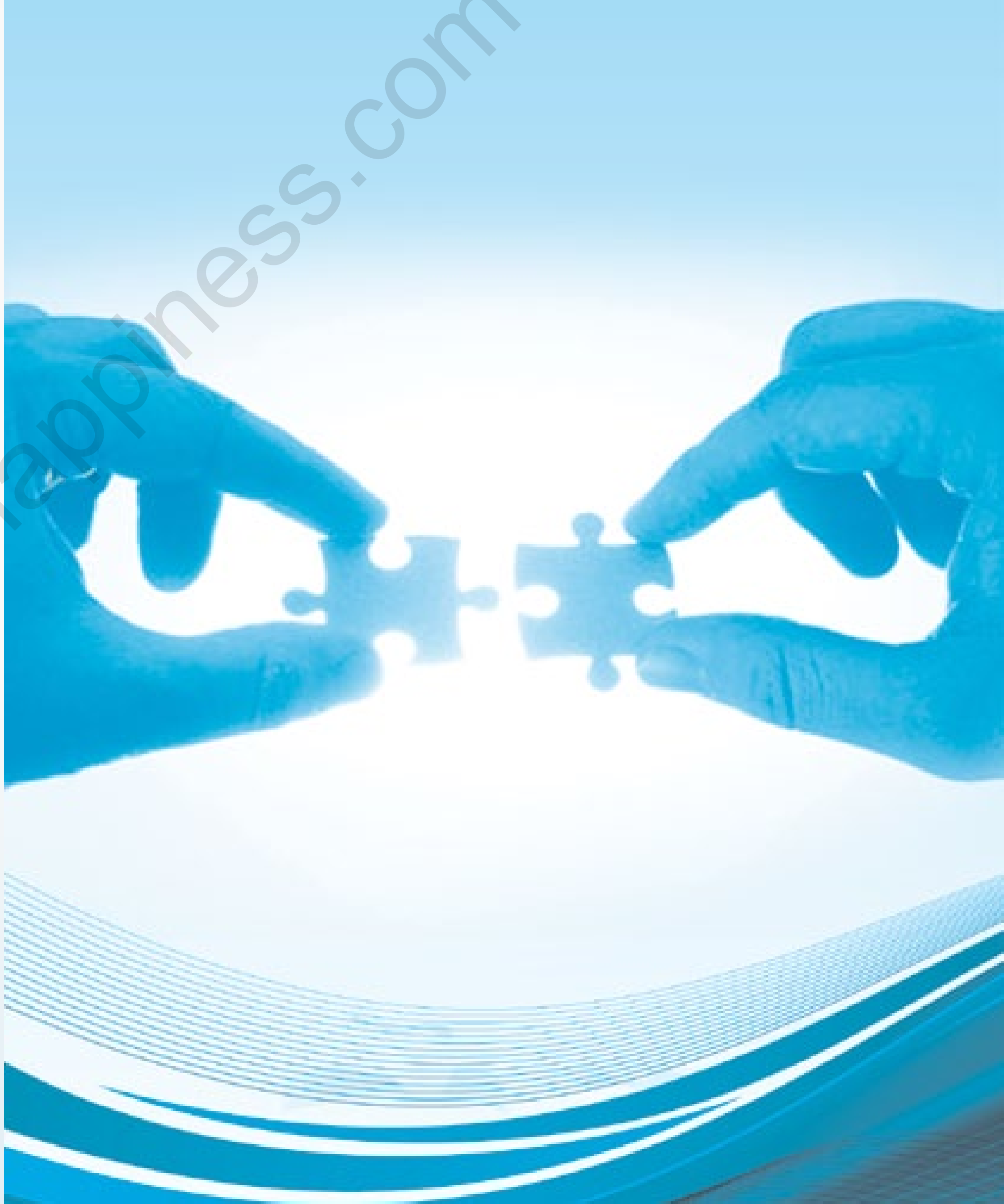
রাজিবঃ রাশেদ! তোমার কি মনে আছে যে, আমরা বলেছিলাম সত্য দ্বীনের কি কি গুণাবলী থাকে সে ব্যাপারে আলোচনা করব?

রাশেদঃ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার মনে আছে।

রাজিবঃ আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা যায়।

মাইকেলঃ রাজিব, তোমার কথাই ঠিক, আমার মনে হয় আমাদের পরবর্তীআলোচনার বিষয় এটা হতে পারে।

সত্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী



সত্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী

পূর্বের কথামত রাশেদ তার দু’বন্ধুকে লুফোর যাদুঘরের (Louvre Museum) গেটেরসামনে অভ্যর্থনা জানালো। সে তাদেরকে যাদুঘরের ভিতরে ঘুরে দেখতে আহবান জানিয়ে বললঃ

আমি এই স্থান নির্ধারন করেছি, আজকের আলোচনা শুরু করার আগে তোমাদেরকে নিয়ে এ যাদুঘরে ঘোরার জন্য, যাতে মানব ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জানতে পারি। আমার এ ভাবনার ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি? তোমাদের ভাল না লাগলে এখান থেকে আমরা ফিরে যেতে পারি...

মাইকেলঃ রাশেদ তোমার ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক... আমাদেরকে এখানে এনে আবার আমাদের মতামত চাও!! এখানে আসার আগেই এ ব্যাপারে পরামর্শ করা উচিত ছিল। তবে আমার কোন অসুবিধে নেই, রাজিব তোমার মতামত কি?

রাজিবঃ আমারও কোন অসুবিধে নেই, তবে আমি মনে করি আমাদের ঘুরাফেরা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে, যদি আমরা পূর্বনির্ধারিত আলোচনা করতে চাই। লুফোর যাদুঘর অনেক বড়, এতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এবং আমাদের শক্তিও শেষ হয়ে যাবে।

রাশেদঃ আমার ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তোমাদেরকে চমকে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটাতে আমি ভুল করে ফেলেছি।

মাইকেলঃ তোমাকে এতকিছু বলতে হবেনা, এখন চল তাড়াতাড়ি ঘুরে আসি; কেননা যাদুঘরের কক্ষগুলোর দীর্ঘতা প্রায় তের বর্গকিলোমিটার, আর তাতে প্রায় লক্ষাধিক জিনিস আছে।

রাশেদঃ আমি লুফোর যাদুঘর ঘুরতে আসিনি, কিন্তু আমি কিছু জীবন্ত তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি যে বিষয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আমার মনে হয় আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে প্রাচীন সভ্যতার সংগ্রীহিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি, আর এগুলোর প্রায়ই নীচতলা ও প্রথম তলায় রয়েছে...

প্রায় দুই ঘন্টা পরে তিন বন্ধু যাদুঘর থেকে বের হল, ঘুরা-ফেরার কারনে তাদেরকে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

রাশেদঃ আমরা একটু বিশ্রাম নিতে পারি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানা সামনের হোটেল থেকে দুপুরের খাবার খেতে পারি।

যখন তারা সেদিকে যাচ্ছিল, রাশেদ নতুন করে কথা শুরু করলঃ

তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, আমরা যে প্রাচীন সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো দেখলাম তার সাথে কোন না কোনভাবে ধর্মের সম্পর্ক রয়েছে? এটা কি ইহা প্রমাণ করেনা যে, ইতিহাসের যেকোন সময় ও স্থানে মানুষের জন্য ধর্ম ছিল?!

রাজিবঃ তুমি যা বলেছ তা নৃতত্ত্ববিদদের কাছে সমর্থিত একটা বিষয়। তারা বলেছেন যে, মানব ইতিহাস ও সভ্যতা খুঁজে তারা এমন কিছু সভ্যতা পেয়েছেন যেখানে শিল্প-কারখানা ছিলনা, কোন কোন সভ্যতায় ঘর-বাড়ি বা বড় বড় ইমারাত ছিলনা, আবার কোন কোন সভ্যতায় বিজ্ঞান ও দর্শন ছিলনা। কিন্তু এমন কোন সভ্যতা পাওয়া যায়নি যেখানে ধর্মীয় উপাসনালয় ছিলনা।

মাইকেলঃ প্রকৃতপক্ষে, কোন জ্ঞানী লোকই বলবেনা যে দ্বীন একটি খারাপ জিনিস, বরং দ্বীন হলো মানবের অস্তিত্বের জন্য সভ্যতার মৌলিক উপাদান। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা মনে করেন যে, তার ধর্মই সঠিক, অন্যেরটা ভুল। সে তার ধর্মের দিকে লোকদেরকে ডাকে। প্রত্যেক আক্বিদার লোকেরা তাদের বিশ্বাসী বিষয়ের অনুসরণ করতে বলে ও তাদের নেতাদেরকে সম্মান করতে বলে। প্রত্যেক জাতি তার ধর্মকে সত্য মনে করেন, ফলে ব্যক্তি দিশেহারা হয়ে যায়ঃ সত্য ধর্ম কি ইহুদি ধর্ম? নাকি খৃষ্টান ধর্ম? নাকি বৌদ্ধ ধর্ম? নাকি ইসলাম ধর্ম? কিভাবে জানব কোনটি সত্য ধর্ম? নাকি আমরা বলব যে, সব গুলোই সঠিক, যেহেতুসবগুলোই তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা মেটায়?! বিষয়টি হয়রান হওয়ার মত, তাইনা?

রাশেদঃ হ্যাঁ, দিশেহারা হওয়ার মতই, কিন্তু একটু চিন্তা ভাবনা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলেই এ দিশেহারা ও হয়রানি থেকে বের হওয়া যায়ঃ আমরা এখন ক্ষুধার্ত, তাই বলে আমাদের সে ক্ষুধা মেটানোর জন্য খাবারটি মানুষের জন্য উপযোগী নাকি পশুদের জন্য উপযোগী এগুলো বিবেচনা না করেই যা পাই তাই খাবনা। আমাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য যা পাই তাই দিয়ে উদরপূর্ন করতে রাজী হবনা। তাহলে আমাদের আত্মিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে আমাদেরকে কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে... অবশ্যই আমাদেরকে সঠিকটা যাচাই বাচাই করে নিতে হবে।

আবার সবগুলো সত্য হওয়াও অসম্ভব, কেননা সত্য একটি, একাধিক হতে পারেনা। এ সব ধর্মগুলো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারেনা, যে সব গুলো সত্য হবে। যখন ধর্ম একাধিক আর সত্য মাত্র একটি তাহলে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায়ঃ কোন ধর্মটি সত্য? তাহলে আমাদেরকে বাতিল ধর্ম থেকে সত্য ধর্ম বের করতে হলে কতিপয় মৌলিক নীতিমালা জানতে হবে। যখন এগুলো কোন ধর্মের মধ্যে পাওয়া যাবে তখন সেটাকে সত্য ধর্ম বলা হবে। আর যখন এগুলো বা এসবের কোন একটপাওয়া যাবেনা তখন আমরা বুঝব যে এটা বাতিল ধর্ম।

রাজিবঃ কিন্তু তুমি তো এখন তোমার কথার মাঝেই প্রথম মূলনীতি বলে দিয়েছ। তা হলো, ধর্মটি হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাহলে ধর্ম কি আসমানী হওয়া জরুরী? পৃথিবীতে তো অনেক ধর্ম আছে যা আসমানী ধর্ম নয়, সেগুলো লক্ষ লক্ষ লোক অনুসরণ করে। যেমনঃ বৌদ্ধ, হিন্দু, কনফিউশিয়াসের ধর্ম ইত্যাদি।

রাশেদঃ এটা খুবই স্পষ্ট, যে কোন দ্বীনের মূল হলো এক ইলাহ বা একাধিক ইলাহের(!) উপাসনা করা। যখন আমরা স্বীকার করলাম যে, একজন রব-ই বিশ্ব ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পৃথিবীর সব কিছু মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, তাদেরকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, তাহলে এটাও অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে যে, ইবাদত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী হলেন তিনিই, তাঁর কোন শরিক নেই। কিভাবে অন্যের শুকরিয়া ও ইবাদত করা হবে? অথচ তিনি সৃষ্টি করেছেন ও রিজিক দান করেন। এছাড়াও সত্য ধর্ম এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ডাকবে, তাঁর জন্য সত্য ইলাহের গুণাবলী সাব্যস্ত করবে, তাঁর রাসুলগণকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখবে এবং

তাদেরকে যথাযথ সম্মান করবে।

আমরা পূর্বের আলোচনায় একমত হয়েছিলাম যে, সত্য ইলাহের গুণাবলী ও মানুষের প্রয়োজনীয়তার দাবী হলো, মানুষকে পথপ্রদর্শন করার জন্য এবং তাদের সুশৃংখল জীবন ও সুখ শান্তির জন্য একটি জীবন বিধান থাকা। আর সে জীবন বিধান হবে একমাত্র সে ধর্মের আলোকে যা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সম্যক অবহিত স্রষ্টা কর্তৃক নির্বাচিত।

আমরা আরো একমত হয়েছিলাম যে, মানুষের হিসাব ও প্রতিদানের জন্য শেষদিন থাকা জরুরী, যেদিন সে তার কৃতকর্মের ফলাফল পাবে ও জুলুমের প্রতিদান ভোগ করবে। যখন একমাত্র আল্লাহ তায়া'লাই কিয়ামতের দিনে বান্দাহর হিসাব নিবেন, তাহলে তাঁর হিসাবটাও তাঁর প্রেরিত ধর্ম অনুযায়ী হতে হবে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, যে কোন ধর্ম কোন ব্যক্তি প্রবর্তন করলে ও তা তার নিজের দিকে সম্পৃক্ত করলে সেটা দ্বিধাহীনভাবে বাতিল ধর্ম।

তবে আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই; তা হলো, অনেক ধর্মের অনুসারীকে যদি জিজ্ঞেস কর তাদের বিশ্বাসের দলিলের ব্যাপারে তখন তারা জবাব দিবে যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ ধর্মের উপর এবং এ পথে চলতে দেখেছি, অতঃপর তারা অনেক মিথ্যা কিচ্ছা কাহিনী ও ঘটনা বর্ণনা করবে। এজন্য তারা উত্তরাধিকারসুত্রে পাওয়া কিতাবের উপর নির্ভর করে, যেগুলো কে বলেছে বা কে লিখেছে কিছুই জানা নাই। প্রথম কোন ভাষায় লেখা হয়েছিল, কোন দেশে পাওয়া গেছে তাও জানা নাই। এগুলো শুধুমাত্র কিছু মিশ্রিত কথা, যা জমা করা হয়েছে, এরপর পালাক্রমে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম প্রাপ্ত হয়েছে, কোন ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়াই। এগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে। এখান থেকে সত্য ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে যায়, তা হলো,, এর নিসবত বা সম্পৃক্ততার মূল উৎস জ্ঞাত থাকা আর আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলগনের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে তা সঠিকভাবে প্রমাণিত হওয়া।

রাজিবঃ অসুবিধে নেই, তাহলে আমাদেরকে সেসব মূলনীতির উপর ভিত্তি করে চলতে হবে যেগুলোর ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি; চাই সেগুলো বিবেক, বিজ্ঞান ও প্রকৃতিগত স্বভাব দ্বারা দলীল-প্রমান নেয়ার ক্ষেত্রে হোক বা অন্যান্য প্রমানিত বাস্তবতা হোক যার ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি। যেমনঃ রবের অস্তিত্ব, সত্য রবের গুণাবলী, মানব জাতির জন্য রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা।

মাইকেলঃ যখন আমরা এ ব্যাপারে একমত হলাম, তাহলে ধর্মটি আল্লাহর পক্ষ হতে হওয়া এবং একমাত্র তাঁর জন্যই ইবাদাত হওয়া-এসবের পরে যে গুণটি থাকতে হবে তা হলো, ধর্মটি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সম্মান করবে, এর বিরোধীতা করবেনা। সঠিক জ্ঞান বা বিবেকের সাথে একমত হতে হবে। কেননা আমরা যখন বলব যে, সঠিক ধর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর সঠিক জ্ঞানও আল্লাহর সৃষ্টি, তাহলে আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিরোধ হতে পারেনা।

রাশেদঃ তোমার কথার সাথে একমত। সাথে সাথে আমি দু'টি বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি তা হলোঃ

প্রথমতঃ আমরা আগেই বলেছি, কোন কিছু সংঘটিত হওয়া বা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটি বিবেকের কাছে নিশ্চিতভাবে অসম্ভব হওয়া আর কোন বস্তুর ধারণা বিবেকের কাছে কঠিন মনে হওয়া- এ দুটোর মাঝে অনেক তফাৎ আছে। দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলো কল্পনা করা বা তার অবস্থাসম্পর্কে সন্তোষজনক ধারণা করা বিবেকের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। যেমনঃ ফেরেশতা ও শয়তানের অস্তিত্ব, মানবের অন্তর্ভুক্ত রাসুলের নিকট অহি নাযিলের পদ্ধতি , কিয়ামতের দিনের বিস্তারিত বর্ণনা ইত্যাদি। কিন্তু এসবকিছু এমনসব বিষয় হতে ভিন্নতর যা সংঘটিত হওয়া বিবেকের কাছে নিশ্চিতভাবে অসম্ভব।

যেমনঃ একশত বছর আগে আকলের কাছে বিশ্বাস করা কষ্টকর ছিল যে, মানুষ উপরে উঠতে পারবে, এমনকি চাঁদে যান পাঠাতে পারবে, বা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে অন্যের কথা শুনতে পারবে ও অন্যকে দেখতে পারবে। কিন্তু জ্ঞান এটাকে অসম্ভব মনে করেনি। কিন্তু যখন আমরা বলি একই ব্যক্তি একই সময় দুটি স্থানে, বা (১+১+১=১) তখন বিবেক এটাকে অসম্ভব বলে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বের পয়েন্ট অনুযায়ী, দ্বীনের কিছু কিছু ব্যাখ্যা আমাদের জ্ঞানের কাছে কখনো কখনো স্পষ্ট হয়ে উঠেনা, যদিও জ্ঞান সেটার বিরোধিতা করেনা। তখন সেগুলোকে মেনে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সঠিক দলিলের উপর ভিত্তি করে এগুলোর উপর ঈমান এনেছি। কেননা যখন তুমি জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে পারবে যে, কোন ব্যক্তি ১০০% নির্ভরযোগ্য লোক, তাঁর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, সে ব্যক্তিটি তাঁর উপর তোমার বিশ্বাসের ব্যাপারে পরীক্ষা করে যদি তোমাকে বলেঃ (এ সাদা কাগজে স্বাক্ষর কর) তখন তুমি এ কাগজের মূল উৎস কি সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা না করেই স্বাক্ষর করবে। আর যদি তাঁর উপর তোমার বিশ্বস্ততা পূর্ণ না থাকে তবে তুমি তাঁকে সে কাগজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। এমনিভাবে ঈমান ও বিশ্বাসের ব্যাপার। এটা জ্ঞান ও চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহর উপর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে হয়। দ্বীনের বিস্তারিত বিষয়সমূহ আল্লাহর উপর তোমার বিশ্বাসকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করব।

মাইকেলঃ তাহলে, সত্য ধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলোঃ এটা পরস্পর বিরোধপূর্ণ হতে পারবেনা, এক অংশের সাথে অন্য অংশ ভিন্ন হতে পারবেনা। তাই একবার এককাজের আদেশ দিয়ে, আবার সে কাজের বিপরীতটা করতে আদেশ দিবেনা, বা একটি জিনিস একবার হারাম করে অতঃপর আবার কোন কারণ ছাড়াই জায়েয করবেনা, বা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের জন্য কোন কিছু জায়েয করে অন্যের উপর তা হারাম করবেনা।

রাজিবঃ যখন আমরা বলব যে, মানব জাতির কাছে তাদের স্রষ্টা যা চান এ দ্বীন তাঁর জন্যদলিল স্বরূপ, তখন এটাও অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে যে, এ দ্বীন আল্লহর ইবাদতের দিকে পথ প্রদর্শক, আল্লাহর উদ্দেশ্য মানব জাতিকে বুঝানোর মাধ্যম, মানুষের জন্য অনুসরনীয় বিধি-বিধান, জীবনের সব ধরণের প্রশ্নের জবাব দিবে, ইহা বলে দিবে সে কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? আত্মার প্রশান্তি, নিরাপত্তা কিভাবে আসবে? আর মানবের স্বভাবজাতের সাথে এর মিল থাকবে।

মাইকেলঃ আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো, সত্য ধর্ম মহান চরিত্র ও ভাল কাজের দিকে ডাকবে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। ইহা সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ হবে,যা তাদেরকে রক্ষা করবে নিজের উপর জুলুম ও পারস্পরিক জুলুম হতে; চাই সে জুলুম অন্যের অধিকার বিনষ্টের মাধ্যমে হোক বা কল্যানকর বিষয় জোর করে চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে হোক অথবা বড়রা ছোটদেরকে গোমরাহ করার মাধ্যমে হোক।

রাশেদঃ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আছে যা আমরা ভুলে গেছি, সেটা হলোঃ দ্বীনের মধ্যে এসব ভাল গুণাবলীর সবগুলো থাকবে এর কোনটা বাদ যাবেনা।

মাইকেলঃ আমি চাই রাশেদ তুমি তোমার ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বল, আমি দেখেছি তোমার ধর্ম সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই কম, বা যতটুকু জানি তা বিকৃত।

রাশেদঃ আগামী সাক্ষাতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

মহামানবদেরবের সর্বশ্রেষ্ঠজন



মহামানবদেরবের সর্বশ্রেষ্ঠজন

খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে রাশেদ ধীরে ধীরে একটি বই ও ব্যাগে ল্যাপটপ নিয়ে বন্ধুদের সাথে দেখা করতে আসল। নিকটে এসেই দ্রুত সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের জবাবের অপেক্ষা না করেই কথা শুরু করলঃ

আজকে বন্ধু মাইকেলের ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, আমি আজ তোমাদেরকে ইসলামের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব, সকলেই একমত যে, ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হলোঃ ইসলামের নবী মুহাম্মদের সাঃ উপর ঈমান আনা। আমি তোমাদের জন্য মুহাম্মদ সাঃ সম্পর্কে পশ্চিমা চিন্তাবিদের লেখা একটি বই এনেছি, শুনো তিনি কি বলেছেনঃ

মাইকেলঃ থাম হে বন্ধু রাশেদ, আমি মনে করেছিলাম ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য হবে ইলাহ বা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা কি হবে সে ব্যাপারে।

রাশেদঃ তোমার কথা ঠিক আছে... কিন্তু আমি এ ব্যাপারটি বিভিন্ন কারনে কেটে গেছি, এর অন্যতম কারণ হলোঃ

ইসলাম মূলত রাসুলের রিসালাহ বা নবুয়্যতী বাণী। ইহা কেউ ধারণা করতে পারেনা যে, ইলাহ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা রাসুলের (সাঃ) বানানো নতুন কোন ব্যাপার। বরং আদম আঃ থেকে শুরু করে ঈসা আঃ পর্যন্ত যত নবী রাসুল আগমন করেছেন তাদের সকলেরই ধর্ম ছিল ইসলাম। বরং ইসলাম হলো সব মানব জাতির মূল ধর্ম। যা ঘটেছে তা হলো মানব জাতি এ ধর্মকে পরিবর্তন করেছে, এর মূলরূপ রেখাকে বিকৃত করেছে। অতঃপর ইসলাম এসে পুনরায় আল্লাহর উপর ঈমান আনাকে সঠিক করেছে, সকল মানবজাতিকে এক আল্লাহর দিকে ডেকেছে, তাঁর সাথে শরিক করতে নিষেধ করেছে। ইসলামে আল্লাহর উপর ঈমান ও তাঁর একত্ববাদ স্বীকার মানব সৃষ্টির শুরু থেকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পুনঃনবায়ন মাত্র, এটা পৃথিবী শেষ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। এটা এমন ধর্ম যা ইসলামের নবীর জন্মের আগেই ছিল।

দ্বিতীয়তঃ আমরা ইতিপূর্বে যেসব বিষয়ে একমত হয়েছি আমি মনে করি সে গুলোকে আবার আলোচনা না করে বাদ দিয়ে যাব।

রাজিবঃ তোমার কথার উদ্দেশ্য কি এই যে, ইসলামে সত্য ইলাহের গুণাবলী বাস্তবায়িত হয়েছে, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি?

রাশেদঃ হ্যাঁ, ইহাই সঠিক।

রাজিবঃ তাহলে অন্য আলোচনার আগে তুমি যদি সংক্ষেপে ইলাহ সম্পর্কে ইসলামী ভাবনার রূপরেখাটি আলোচনা করতে।

রাশেদঃ আচ্ছা ঠিক আছে..., ইসলামে রব বা প্রতিপালক হলেন একজন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এ পৃথিবীর সব কিছুই তিনি অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে তাঁর অনুরূপ কিছুই নেই, তিনিই মহাবিশ্বের আইন প্রণয়ন করেছেন, যাকে আমরা (প্রকৃতির আইন) বলি। তিনি সব কিছু নির্দিষ্ট পরিমান ও পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সব কিছু থেকে মহান, সর্বাপেক্ষা বড়, সব কিছুর উপরে।

তাঁর স্বত্বা, গুণাবলী, কাজকর্ম ইত্যাদির অনুরূপ কিছুই নেই, তাঁর রয়েছে নিরঙ্কুশ পরিপূর্ণতা, কোন দিক থেকে তাঁর অপূর্ণতা নেই, তিনি মহাপবিত্র, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আবার কারো থেকে জন্ম গ্রহণও করেন নি। কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি জীবন মৃত্যু দান করেন, সৃষ্টির কোন কিছুতে তিনি অবস্থান করেননা আবার তাঁর স্বত্বার মধ্যেও কোন মাখলুক অবস্থান করেনা।

এই প্রতিপালকই একমাত্র ইলাহ, যিনি ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করা বৈধ নয়। তাঁর রাজত্বে কেউ তাঁর অংশীদার নয়, তাঁর কোন মন্ত্রী, উপদেষ্টা বা সাহায্যকারী নেই যাদেরকে তাঁর সাথে ইবাদত করা যাবে। তাঁর কাছে পৌঁছতে কোন মাধ্যম বা সুপারিশকারী লাগেনা, তাঁর জন্য ইবাদত হবে সব দিক থেকে একনিষ্ঠভাবে।

মাইকেলঃ তুমি যে বই নিয়ে এসেছ তাতে কি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে?

রাশেদঃ বইটিতে মানব ইতিহাসের চিরস্থায়ী মহান লোকদের কথা বলা হয়েছে, লেখক হলেনঃ ডক্টর মাইকেল হার্ট, যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গাণিতবিদ, তিনি মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসায় কাজ করতেন।

মাইকেলঃ তার ঐতিহাসিক গবেষণার কারণ কি?

রাশেদঃ ঐতিহাসিক গবেষণা এ বিজ্ঞানীর মজার শখ ছিল। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কোটি কোটি মানুষের মাঝে বিশ্বকোষ মাত্র বিশ হাজার মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে উল্লেখ করেনি, তখন তিনি তাদের মধ্য হতে মহামানবদেরকে বাছাই করার জন্য কিছু মূলনীতি ঠিক করলেন। এর গুরুত্বপূর্ন মূলনীতিগুলো হলোঃ ব্যক্তির বাস্তবিকতা থাকা অর্থাৎ , কাল্পনিক বা অপরিচিত না হওয়া এবং খুব প্রভাব বিস্তারকারী হওয়া, চাই সেটা ভাল কাজে হোক বা খারাপ কাজে হোক। এ প্রভাব বিশ্বব্যাপী হতে হবে, এবং মানব ইতিহাসের সাথে বিস্তৃত হতে হবে। আমি মনে করি এ মূল ভিত্তিগুলো খুবই সুন্দর।

রাজিবঃ এ লেখকের মতে কে সবচেয়ে বেশি মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী? !

রাশেদঃ এ লেখক ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাঃ কে একশত মহান ব্যক্তির মধ্যে প্রথমে রেখেছেন। তার এ নির্বাচনের অনেকগুলো কারণ ছিল, সেগুলো হলোঃ

এরপর রাশেদ বইটি খুলে ও পড়া শুরু করলঃ

"আমি মুহাম্মদ সাঃ কে এ তালিকার সবার উপরে রেখেছি, এতে হয়ত অনেকেই আশ্চর্যবোধ করবে, তারা আশ্চর্য হতেই পারেন, তবে মুহাম্মদ সাঃ ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যিনি দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন। তিনি অন্যান্য মহান ধর্মের প্রবর্তকের মত ইসলামের দিকে লোকদেরকে ডেকেছেন, তিনি রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর তেরশত বছর পরও তাঁর প্রভাব এখনো শক্তিশালী ও নবজীবনপ্রাপ্ত।"

এরপর তিনি বলেছেনঃ " ......এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে, মুহাম্মদ এ তালিকায় সবার উপরে, অথচ খৃষ্টানদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে দ্বিগুণ, এটা হয়ত অদ্ভুত মনে হতে পারে যে তিনি তালিকায় সবার উপরে অথচ ঈসা আঃ তালিকায় তিন নম্বরে, আর মুসা আঃ ষোল নম্বরে।

তবে এর অনেকগুলো কারণ রয়েছেঃ এর অন্যতম হলোঃ ইসলামের প্রচার কাজ, ইহা প্রতিষ্ঠা ও এর শরিয়তের বিধিবিধানগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত করতে রাসুল মুহাম্মদ সাঃ এর ভূমিকা ঈসা আঃ এর তুলনায় অনেক বেশী ভয়ানক, কষ্টকর, ও মহান ছিল। তাছাড়া ঈসা আঃ খৃষ্টানদের জন্য শুধু চারিত্রিক কিছু মূলনীতি নিয়ে এসেছেন, আর সেন্ট পল ঈসাই ধর্মের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি (সেন্ট পল) নিউ টেষ্টামেন্টে যা কিছু আছে তা লিখার দায়িত্বশীল ছিলেন।

অন্যদিকে মুহাম্মদ সাঃ নিজেই ইসলামের নীতিমালা, শরিয়তের মূলনীতিসমূহ, সামাজিক ও চারিত্রিক মূলনীতি, মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার চলার জন্য সব ধরণের লেনদেনের মূলনীতি ইত্যাদি সব কিছুর ব্যাপারে একমাত্র দায়িত্বশীল ছিলেন। কোরআন একমাত্র তাঁর উপরই নাযিল হয়েছে, কোরআনে মুসলমানেরা দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেয়ে থাকে।" তোমরা কি এ কথায় আশ্চর্য হচ্ছ?!

রাজিবঃ বাস্তবেই কথাগুলো ভাবনার উপযুক্ত। তবে আমি বলতে চাইঃ এ লেখক মানব গবেষনায় বিশেষজ্ঞ নয়।

রাশেদঃ যদিও তিনি মানব গবেষনায় বিশেষজ্ঞ নন, তবে তাঁর কথাগুলো সন্তোষজনক ও নিরপেক্ষ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন ইহুদি হওয়া সত্যেও মুহাম্মদ সাঃ এর পক্ষে কথা বলেছেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, যদি তুমি আরো প্রমাণ চাও তবে আমি আরো কিছু উল্লেখ করতে পারি।

অতঃপর রাশেদ তার ল্যাপটপ বের করল, সে কিছু ফাইল থেকে পড়া শুরু করল, বলতে লাগলঃ

দেখ হে বন্ধুঃ

ফ্রান্সের কবি ল্যামারটিন (Lamartine) বলেছেনঃ মুহাম্মদ সাঃ মানবিক যে মহত্ব লাভ করেছেন আর কে সে রকম মহত্ব লাভ করতে পেরেছে?!, তিনি যে পূর্ণতায় পৌঁছেছেন সেখানে কোন মানুষই পৌঁছতে পারেনি! মুহাম্মদ সাঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বিদ্যমান সব বাতিল আক্বিদা ধ্বংস করেছেন।

জার্মান প্রথম কবি গ্যাটে বলেছেনঃ আমি ইতিহাসে এ মানব জাতির জন্য সর্বোচ্চ মহান আদর্শের খোঁজ করেছি, অতঃপর আরবের নবী মুহাম্মদ সাঃ এর মাঝে সে মহান আদর্শ খুঁজে পেয়েছি।

রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক ল্যেভ তলস্তোয় (Leo Tolstoy) বলেছেনঃ "আমি নবী মুহাম্মদের ব্যাপারে একজন আশ্চর্যান্বিত ও অবাক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ পাক শেষ নবুয়্যাত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তিনিই যাতে শেষ নবী হন"।

প্রসিদ্ধ আইরিশ লেখক, চিন্তাবিদ, যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw) বলেছেনঃ "আমি ইসলামের নবী মুহাম্মদের জীবনী বার বার ভালভাবে পড়েছি, তার জীবনীতে মহান চরিত্রই পেয়েছি যেভাবে তাঁর হওয়া উচিৎ। আমি কতইনা আকাঙ্ক্ষা করেছি যে, ইসলামই বিশ্বের অনুসৃত পথ হবে। আমি মুহাম্মদের জীবনী পড়েছি একজন আশ্চর্যজনক ব্যক্তি হিসেবে, অতঃপর দেখলাম, তিনি ঈসা আঃ এর সাথে তুলনা হতে অনেক উর্ধ্বে বরং তাঁকে বলা যায়(মানবতার রক্ষাকারী ও ত্রাণকর্তা)"।

মাইকেলঃ এ সব আলোচনা মুহাম্মদ সাঃ এর মহত্ত্বের ব্যাপারে, কিন্তু তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে যে, মুহাম্মদ সত্যিই আল্লাহর নবী?

রাশেদঃ শুন হে বন্ধু! সুইজ্যারল্যাণ্ডের ধর্মতত্ত্ববিদ ডক্টর হান্স কং (Dr. Hans Kong) কি বলেন, তিনি বলেন মুহাম্মদ সাঃ প্রকৃতার্থেই একজন নবী, একথা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবেনা যে, মুহাম্মদ সাঃ ই একমাত্র সফলতা ও মুক্তির পথপ্রদর্শক"।

এছাড়াও মুহাম্মদ সাঃ এর নবী হওয়ার ব্যাপারে অনেক দলিল প্রমাণ আছে।

মাইকেলঃ যদি তুমি পার তবে আমাদের কাছে সেগুলো পেশ কর, তার অল্প কিছু হলেওবল।

রাশেদ তার ল্যাপটপে কিছু ফাইল খুলে বলতে লাগলঃ

নবী মুহাম্মদের সাঃ এর সত্যতার অন্যতম প্রমাণ হলোঃ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে তাঁর আগমনের সুসংবাদ। তাওরাতে (ওল্ড টেষ্টামেন্টের দ্বিতীয় বিবরণী গ্রন্থ/ Deuteronomy) (অধ্যায় ১৮. অনুচ্ছেদঃ ১৫-৩০) আছেঃ রব মুসা সাঃ কে ডেকে বললেনঃ "আমি তাদের কাছে তাদের ভাইদের মধ্য হতে তোমার মতোই একজন নবী পাঠাব। নবীআমার কথাই সে তার মুখ দিয়ে বলবে, আমি যা আদেশ করব তাসে লোকদেরকে বলবে। এই নবী আমার হয়ে যা বলবে তা যে গ্রহণ করবেনা আমি তার থেকে প্রতিশোধ নিব।"

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বনী ইসরাইলের ভাই হলো ঈসমাইল আঃ এর বংশধর (অর্থাৎ আরব জাতি), এছাড়াও মুসা আঃ ও মুহাম্মদ সাঃ এর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, রবের বাণী (আমার কথাই সে তার মুখ দিয়ে বলবে) এটা প্রমাণ করে যে, ইসলামের নবী উম্মী বা পার্থিব লেখা পড়া জানবেনা।

নিউ টেস্টামেন্টে যোহনের বাণী (Gospel of John) (অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদঃ ১৫)ঃ ঈসা আঃ তাঁর সাথীদেরকে বললেনঃ আমি চলে যাচ্ছি, অচিরেই তোমাদের কাছে অধিক প্রশংসিত ব্যাক্তি আসবে , তিনি সত্য আত্মা , যিনি নিজের থেকে কিছু বলবেন না, তাঁকে যা বলা হবে তাই বলবে, তিনি আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন, তোমরাও সাক্ষ্য দিবে, কেননা তোমরা অন্য মানুষের পূর্বে আমার সাথে আছ"। (الفارقليط) মুলত গ্রিক শব্দ (PERIQLYTOS) এর অর্থঃ অধিক প্রশংসার অধিকারী, অর্থাৎ আহমদ বা হামেদ বা অনেক প্রশংসিত, এ অর্থেই আবরের নবী মুহাম্মদ সাঃ এর নাম।

তাঁর নবুয়্যাতের আরো প্রমাণ হলোঃ অদৃশ্য জগতের বিষয় সম্পর্কে তাঁর খবর দেয়া, বরং কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয় সূক্ষ্ম সুক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যসহ বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে কোন কিছু ঘটার পূর্বে সে সম্পর্কে তাঁর সংবাদ প্রদান, এবং তাঁর রিসালাত ও তাঁর আনীত শরিয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধানের বৈজ্ঞানিক বিস্ময় তাঁর নবুওতের সত্যতার প্রমাণ।

মাইকেলঃ কোথায়? ......এ সব কোথায়? আমাদেরকে কিছু উদাহরণ দাও।

রাশেদঃ কোরআনে এ ব্যাপারে অনেক আছে, যে কিতাব মুহাম্মদ সাঃ এর উপর নাযিল হয়েছে, ইহাই তাঁর সবচেয়ে বড় মু'জিযা বা বিষ্ময়।

রাজিবঃ তাহলে আমাদেরকে এ কোরআন জানতে হবে, তবে এর মাধ্যমে রাসুলের সত্যতা জানতে পারব এবং এই ধর্মের মূলভিত্তিগুলো জানতে পারব।

রাশেদঃ হ্যাঁ, সঠিক কথা বলেছ, আগামী সাক্ষাতে আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে উত্থাপন করব।

মাইকেলঃ যাওয়ার আগে আমি একটা বিষয় জানতে চাই, তোমার কাছে যে বই আছে তা কোথায় পাওয়া যাবে?

রাশেদঃ বইটি আমার কাছে অনেক আগ থেকেই আছে, তবে এর নতুন সংস্করণ আমাদের থাকার জায়গার কাছেই একটি লাইব্রেরিতে দেখেছি, আগামী সাক্ষাতের আগে আমরা সে লাইব্রেরীতে যেতে পারি।

শেষ কথা



শেষ কথা

তিন বন্ধু আগের নির্ধারিত সময়মত তাদের থাকার হোটেলের সামনে মিলিত হলো, রাশেদ তাদেরকে সেই লাইব্রেরির দিকে নিয়ে চলল, যেখানে (একশত মহামানব...সবার মহান মুহাম্মদ সাঃ) বইটি আছে। সংবাদপত্রের কর্নারে এসে শিরোনাম দেখে মাইকেল থেমে গেল, সে হঠাৎ রাশেদকে ডাকলঃ

রাশেদঃ এ উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনামটি দেখ ... এটা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু, “ইসরাইলের একটি লাইব্রেরিতে কোরআনের পুরাতন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে”।

রাশেদঃ তুমি কি জানতে চাচ্ছ কিভাবে এ পাণ্ডুলিপি ইসরাইলের লাইব্রেরিতে পৌঁছেছে?.. আমি গতকাল এ খবর একটি ওয়েবসাইটে পড়েছি, কিছু কিছু ব্যাখ্যায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ইরাকে জোট বাহিনীর আক্রমণের পরে এটা চুরি করে ইসরাইলে নিয়ে গেছে।

মাইকেলঃ না, না, আমি তা উদ্দেশ্য করিনি, আমার কথার উদ্দেশ্য হলো, এর সাথে তোমাদের কোরআনের মৌলিকতা ও সত্যতার সম্পর্ক আছে। সংবাদে বলা হয়েছে, পাণ্ডুলিপিটি ১২০০ বছর পূর্বে লেখা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন প্রথমবার লেখার ২০০ বছর পর মাত্র এ পাণ্ডুলিপিটি লেখা, এটা নিঃসন্দেহে আশ্চর্যজনক খবর।

রাশেদঃ প্রথমতঃ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির মধ্যে এটা কোরআনের সর্বাধিক পুরাতন পাণ্ডুলিপি নয়, কেননা, রাশিয়া দাবী করেছে তাদের কাছে কোরআনের সবচেয়ে পুরাতন পাণ্ডুলিপি রয়েছে। রাশিয়ার গবেষক ইভিম রিদওয়ান বলেছেনঃ নেদারল্যান্ডে তেজস্ক্রিয় কার্বন বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের কাছে কোরআনের যে পাণ্ডুলিপি আছে তা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের।

অন্যদিকে মিশরিরা দাবী করেন যে, কায়রোর হোছাইন মসজিদে কোরআনের সবচেয়ে পুরাতন পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যার বয়স প্রায় ১৪০০ বছর, ইহা সেই ছয়কপি কোরআনের এক কপি যা ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাঃ এর নির্দেশে কোরআন হেফাযতের জন্য লেখা হয়েছিল।

ইয়ামেন দাবী করেছে, ১৯৭২ সালে সান'আতে বড়জামে মসজিদের খনন কাজের সময় তারা কোরআনের সবচেয়ে পুরাতন পাণ্ডুলিপি পেয়েছে যা ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাঃ এর খেলাফতের সময় লিখিত হয়েছিল।

এদের সবার দাবীই সঠিক হতে পারে, কেননা কোরআনের অনেকগুলো কপি করা হয়েছিল ও সেগুলো বিভিন্ন দেশে ও শহরে পাঠানো হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে মুসলমানের কাছে যে কোরআন আছে হুবহু সে কোরআনই রাসুলের সাঃ সময় ছিল, একথা সব ধর্ম বিজ্ঞানীদের নিকট স্বীকৃত, এমনকি প্রাচ্য-বিশেষজ্ঞগণও স্বীকার করেন। কিন্তু তারা একথা স্বীকার করেন না যে, ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মের কিতাবের সত্যতা ও ভিত্তি শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রমাণিত নয়।

ফ্রান্সের প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ সমাজ বিজ্ঞানী আর্নষ্ট রিনান (Ernest Renan) বলেনঃ “কোরআন শরিফ কোন পরিবর্তন ও বিকৃতির মুখোমুখি হয়নি”।

আমেরিকান ডক্টর মাইকেল হার্ট, -যার বই আমরা কিনতে এসেছি- বলেছেনঃ “রিসালাতের ইতিহাসে মুহাম্মদের উপর নাযিলকৃত কোরআন ছাড়া অন্য কোন আসমানী কিতাব সম্পূর্ণ অক্ষত নাই”।

জার্মান কবি গ্যাঁটে এ পরিসীমা পার হয়ে আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, আল কোরআন সব কিতাবের কিতাব, মুসলমানেরা যেভাবে বিশ্বাস করে আমিও সেভাবে এটাকে বিশ্বাস করি”। বরং তিনি সত্তর বছর বয়সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, যে রাত্রিতে মুহাম্মদের উপর কোরআন নাযিল হয়েছে সে রাত্রি তিনি উদযাপন করবেন।

রাজিবঃ এটা আমাদের আজকের বিষয়... কোরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী এর প্রমাণ কি? আর ইসলাম যে আসমানী ধর্ম এরই বা প্রমাণ কি?

রাশেদঃ ইহা শুধু আসমান থেকে প্রেরিত ধর্ম নয়, বরং বর্তমানে ইহাই একমাত্র সঠিক ধর্ম।

মাইকেলঃ আমরা একটু একপাশে গিয়ে বসি, যাতে আমাদের আওয়াজে লাইব্রেরির লোকেরা বিরক্ত না হয়।

রাজিবঃ (রাশেদকে উদ্দেশ্য করে, তারা আলোচনার জন্য একপাশে যেতে যেতে) তাহলে তুমি বল, তোমার কি প্রমাণ আছে?

রাশেদঃ আমি এ সময়ে যতটূকু পারি তোমাদের সামনে এ ব্যাপারে প্রমাণ দিব যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআন আল্লাহর বাণী, ইহা মুহাম্মদের কথা বা বাণী নয়। আর আমি তোমাদেরকে কোরআনের কিছু বৈজ্ঞানিক বিস্ময়কর দিক বলব, যাতে মানুষের সসীম জ্ঞানের সামনে মহান আল্লাহর অসীম ও পূর্ণ জ্ঞানের কথা প্রমাণিত হয়।

মাইকেলঃ আমাদের যা উপকারে আসবে ও আমরা যেসব বিষয়ে একমত হয়েছি তা নিয়ে কথা বল। আর বিজ্ঞান ও আকল বা বিবেকের আলোকে এ নিয়ে কথা বলো।

রাশেদঃ গীর্যার অনুসারীরা তাদের কিতাবকে পবিত্র গ্রন্থ বলে। অথচ পবিত্র হওয়াটা ভুল ও বৈপরীত্বময় হওয়ার পরিপন্থী। যেহেতু তা সকল ত্রুটি হতে মুক্ত, পূর্নাঙ্গ গুনাবলীর অধিকারী সত্য ইলাহের গুনাবলীর বিপরীত। আমি বিজ্ঞানের সাথে গীর্যার অবস্থান এবং বিজ্ঞানের সাথে তাদের পবিত্র গ্রন্থের সাংঘর্ষিকতার কারণে তাদের সাথে বিজ্ঞানীদের যে যুদ্ধ হয়েছে তা বলবনা। কিন্তু আমি কোরআনের দিকে তাকাবো, এ ব্যাপারে কোরআনের অবস্থান কি তা বর্ণনা করবঃ

বর্তমান যুগের একজন মুসলিম বিজ্ঞানী আব্দুল মজিদ যিন্দানি আমেরিকার নর্থ স্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাত্রী ও স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রফেসর জুলি স্যামসনের সাথে কোরআনে বর্ণিত শুক্রাণু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির তিনটি ধাপের কথা আলোচনা করেছিলেন, কোরআন কিভাবে বলেছে যে, দুটি শুক্রাণু একত্রিত হলে মানুষ সৃষ্টি হয়, এরপর মানুষটির জন্মের বিস্তারিত রূপ, চোখের রঙ, চামড়ার রঙ, চুলের রঙ ইত্যাদি ঠিক হয়। আধুনিক বিজ্ঞান এ ব্যাপারে প্রমাণ করেছে যে,

মানুষের সকল বিস্তারিত উত্তরাধিকারী গুণাবলী শুক্রাণুর ধাপেই নির্ধারণ করা হয়। এটা আল্লাহ পাকের কথার অনুরূপ, তিনি বলেছেনঃ **"মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন"। (সুরা আবাসাঃ ১৭-১৯)**

এ ব্যাখ্যা শুনার পর সে প্রফেসর একটি সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে, " আমরা গবেষণা করে যেখানে পৌঁছেছিসে ব্যাপারে শতবছর পূর্বেই কোরআন এসে বলে গেছে, এটা প্রমাণ করে যে, কোরআন আল্লাহর বাণী..." ।

আমি ল্যাপটপ খুলে তোমাদেরকে আর কিছু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রমাণ দেখাচ্ছি... প্রফেসর কিথ মুর (The Developing Human) "মানব সৃষ্টির ধাপসমুহ" বইয়ের লেখক, বইটি একটি বিশ্ববিখ্যাত রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত, যা আটটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি একটি সম্মেলনে বলতেছিলেনঃ কোরআনে বর্ণিত মানবের জিনের (Embryos) গুণাবলী সপ্তম শতাব্দীর বিজ্ঞানের গবেষণার উপর ভিত্তি করা অসম্ভব।

এসব হতে একমাত্র যে বিবেকসম্মত ফলাফল বেরিয়ে আসে তা হলোঃ এসব গুণাবলীর কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাঃ কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে। যেহেতু তাঁর পক্ষে এর বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়। কেননা তিনি উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন, এজন্যই তিনি বিজ্ঞানের শিক্ষা পাননি। ডক্টর কিথ মুর এখানেই ক্ষান্ত হননি, তিনি কোরআন ও হাদিসে জিন নিয়ে বর্ণিত অনেক আয়াত ও হাদিস তার লেখা বইয়ে পেশ করেছেন।

জাপানের টোকিও পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক (Aoshioda Cousin) আশুধা কজিন বলেছেনঃ "কোরআন যে আল্লাহর কালাম তা মেনে নেয়ার ব্যাপারে কোন সমস্যা বা অসুবিধা দেখতে পাইনি, কেননা কোরআনে বর্ণিত মানবের জিনের গুণাবলীর ভিত্তি সপ্তম শতাব্দীর বিজ্ঞানের গবেষণার উপরে মনে করা অসম্ভব। এ থেকে একমাত্র যে বিবেকসম্মত ফলাফল বেরিয়ে আসে তা হলোঃ এসব গুণাবলীর কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাঃ কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে।"

আরো জানতে চাও?!

রাজিবঃ কোরআনে কি অন্য বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে?

রাশেদঃ কোরআনে অনেক বিষয়ে অনেক আলোচনা এসেছে, যেমনঃ ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে অনেক আয়াত এসেছে, যা আধুনিক বিজ্ঞান ছাড়া প্রমাণ করা যাবেনা। যেমনঃ মুছা আঃ ও ফেরাউনের ঘটনা, কোরআন ফেরাউনের ডুবে মরার কথা বলেছে এবং পরবর্তী মানুষের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ তাঁর লাশ হিফাযতের কথা বলেছে।অর্থাৎ আগত জাতি তার এ ঘটনা দেখে শিক্ষা লাভ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না"। (সুরা ইউনুসঃ ৯২)**

এখানে তিনিটি ইশারা রয়েছেঃ

১. ফেরাউন ডুবে মরেছে ।

২. পানি থেকে তার লাশকে উত্তোলন করা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে

৩. তার এ লাশকে হেফাযত করা হয়েছে মমি করে যাতে মানুষ তা দেখতে পারে।

এটা আধুনিক বিজ্ঞান এটাই প্রমাণ করেছে। কিন্ত তার লাশের মমি ১৮৯৮ সালের আগে আবিষ্কৃত হয়নি, অর্থাৎ রাসুলের সাঃ ইন্তেকালের প্রায় ১২০০ বছর পরে। ১৯৮১ সালের আগে এ সব মমির মৃত্যুর কারণ তখনো জানা যায়নি, যে এটা পানিতে ডুবে মারা গেছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, পরীক্ষা নীরিক্ষার দ্বারা একদল বিজ্ঞানী তাদের মধ্যে অন্যতম ফ্রান্সের মরিচ বুকাইলী (Maurice Bucaille) এটাকে প্রমাণ করেছেন। তিনি একথা আগে জানতেন না যে কোরআনে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়েছে , ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর (আল কোরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল ও বিজ্ঞান.. আধুনিক জ্ঞানের আলোকে পবিত্র ধর্মগন্থের মাঝে পর্যালোচনা) নামে বই লিখেন।

পবিত্র কোরআনে অনেক বিষ্ময়কর ঘটনা আছে যা ঘটার আগেই সংবাদ দেয়া হয়েছে, যেমনঃ সুরা রূমে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **আলিফ-লাম-মীম, রোমকরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে" (সুরা রূমঃ ১-৩)**

এখানে দুটি বিষ্ময় রয়েছে, প্রথমতঃ কোরআন সংবাদ দিয়েছে যে, কয়েক বছর পর রোম সম্রাজ্য পারস্য সম্রাজ্যের উপর জয় লাভ করবে, অর্থাৎ এক হতে নয় বছরের মাঝে । কোরআন যা বলেছে তা বাস্তবায়িত হয়েছে সাত বছর পর। রোম ও পারস্যের মধ্যে ৬২৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ হয়, তাতে রোমানরা জয়লাভ করেন।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে কোরআনের আরেকটি বিষ্ময় দেখঃ কোরআন ভৌগলিক সীমারেখা ঠিক করেছে, যা সে সময় মানুষ জানতনা। আর সেটা হলো যুদ্ধটি হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে নিম্নভূমিতে। "আদনা" আরবী শব্দের দু'টো অর্থ হলোঃ অধিক নিকটবর্তী ও নিম্নবর্তী জায়গা। এটা আরব উপদ্বীপের নিকটবর্তী ছিল, অন্য দিকে এটা ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিম্নভূমি ছিল, যেহেতু ইহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৩১২ ফুট নিচে (প্রায় ৪০০ মিটার) ছিল। উপগ্রহের হিসেবে এটা সবচেয়ে নিম্নভূমি, যা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা উল্লেখ করেছে। ঐতিহাসিক সত্যতা হলো সে যুদ্ধটি বিশ্বের সবচেয়ে নিম্নভূমি ডেড সাগরের অববাহিকায় হয়েছে, যা তখন আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে অনুমান করা সম্ভব ছিলনা।

মাইকেলঃ আমার মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে রাশেদ।

রাজিবঃ কিন্ত আমার আরো জানতে ইচ্ছে করে, কোরআন কি অন্য আরো কোন বিষয়ে আলোচনা করেছে? যেমনঃ কক্ষপথ, ণৃবিজ্ঞান এবং সমুদ্রপথ...ইত্যাদি?

রাশেদঃ হ্যাঁ, কোরআনে এসব এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে ইশারা রয়েছে, যেমনঃ মহাবিশ্ব সৃষ্টিতত্ব, মানব সৃষ্টি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান এবং আলোকবিদ্যা

ইত্যাদি। এছাড়াও ইশারা রয়েছে ঐতিহাসিক অলৌকিকতা এবং ডিজিটাল সংখ্যার.... আরো আছে এর অলঙ্কারশাস্ত্র ও শরিয়াতের অনিন্দন বিধিবিধান ইত্যাদি।

মাইকেলঃ আমাদের আলোচনার অনেক বিষয় আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আমাদের বন্ধু রাজিবকে হারাব, কেননা কাল আমাদের ফিরে যাওয়ার সময়।

রাজিবঃ এটা আমাকে অনেক চিন্তিত করে তুলেছে, তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। তোমাদের আলোচনার দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছি। তবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যেতে পারব।

রাশেদঃ সুন্দর প্রস্তাব, তোমাদের কাছে আরেকটি প্রস্তাবঃ আমাদের এ সুন্দর দিনগুলোকে স্মরণীয় রাখতে একটি বিদায়ী অনুষ্ঠান করলে কেমন হয়?

মাইকেল ও রাজিবঃ সুন্দর প্রস্তাব।

নিরাপত্তা/ সুরক্ষা



নিরাপত্তা/ সুরক্ষা

রাশেদ ও মাইকেল লন্ডনের উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠল। ট্রেন চলা শুরু করলে মাইকেল রাশেদকে উদ্দেশ্য করে কথা শুরু করলঃ

আমি দেখেছি তুমি তোমার কথায় অনেকবার একটা গুরুত্বপূর্ন পয়েন্ট উল্লেখ করেছ তা হলোঃ " মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য" আর তুমি একবার বলেছিলেঃ এ উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ইবাদত করা। এ ব্যাপারটা আমাকে এবং আমার জানামতে অনেককে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। মানুষ বিভিন্ন মূহুর্তে ও অবস্থানে পড়ে নিজে নিজেকে জিজ্ঞেস করেঃ আমি কেন এ দুনিয়াতে এসেছি? কেন আমার এতো দুর্ভোগ? মানব সন্তানদের মাঝে কেন এত বিরোধ? বরং মানব ও বিশ্বের সাথে কেন এতো বিরোধ? এ প্রশ্নগলো কি গুরুত্বপূর্ণ নয়?

রাশেদঃ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি যে, পশ্চিমা মানুষদের চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক গঠন প্রণালী এর জন্য দায়ী। অতএব, এসব মৌলিক উপাদানগুলোর মাঝে দ্বন্দ্ব অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার যেহেতু এ সব পাশ্চাত্যের বস্তুগত সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যে বর্তমান সংস্কৃতি পুরাতন গ্রিক ও রোমান সভ্যতা থেকে নির্যাসিত। তাই মৌলিক ভাবনা বা ধারণার দ্বন্দ্ব সে দুই সভ্যতায় বিরাজমান ছিল বিধায় এ দ্বন্দ্ব এখনো বিদ্যমান। আর তাদের সে দ্বন্দ্ব ছিলঃ একাধিক ঈশ্বরের মাঝে দ্বন্দ্ব, মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে দ্বন্দ্ব, মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে দ্বন্দ্ব এবং ভাল ও মন্দের শক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব। এছাড়াও আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুবাদী বৈশিষ্টের কারণে দেখা দিয়েছিল আত্মিক দৈন্যতা।

মাইকেলঃ তুমি এমনভাবে কথা বল যেন তোমার কাছে মানুষের পরিবর্তনের জন্য কোন যাদুকরী বিকল্প গুণাবলী আছে।

রাশেদঃ বিষয়টি মুসলমানের ক্ষেত্রে সঠিক, কেননা ঈমান ভাঙ্গন, বিভ্রান্তি ও হয়রানির জন্য নয়। মুসলিম ইসলামের মাধ্যমে জানেঃ সে কোথা থেকে এসেছে? কোথায় যাবে? এ আবাসস্থল দুনিয়ার মূল কি? এ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি? তার মর্যাদাই বা কি? এখানে মানবিক কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে?

মাইকেলঃ এখনো আমার প্রশ্ন বাকি আছে, যদিও আমি তোমাকে অনেক প্রশ্ন করেছি, তাহলে এ সবের ব্যাপারে ইসলামের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি কি?

রাশেদঃ মুসলমান অনুভব করে যে, সে এ মহাবিশ্ব ও তার উপাদানের সাথে মিলে আছে, এ সব জিনিস সৎ বান্দার সাথে মহান আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সামনে নতিস্বীকারে অংশ গ্রহণ করে। এ ইবাদত চাই তারা নিজের ইচ্ছায় করুক, যেমন যে ইবাদতের ধরণ মানব জগতের নিকট স্পষ্ট জানা আছে,আবার চাই সে তার স্বভাবজাত প্রকৃতির কারণে করুক,যার ধরণ আমাদের কাছে জানা নেই। কোরআনে একাধিকবার উল্লেখ আছে যে, "পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাছবিহ বা গুণগান গায়।" কোরআনে 'তাসবীহ' শব্দটি ত্রিশ বারের অধিক এসেছে। এভাবে বিচক্ষণ মুসলিম জানে যে, সে এই গঠিত বিশ্বের একটি অংশ যারা আল্লাহর গুণগান গায়। অতএব সে বিশ্ব ও এর উপাদানের সাথে সঙ্গতিপূর্ন অবস্থানে আছে, তাদের মাঝে কোন বিভাজন ও বিরোধ নেই।

এমনিভাবে সে আরো অনুভব করে প্রকৃতির ভালবাসা ও হৃদ্যতা। সে তাকে বন্ধুভাবে, শত্রু নয়। কোরআন শরিফ বারবার ঘোষণা করেছে যে, তিনি মানুষের জন্য এ পৃথিবীর সব কিছু অধীনস্থ করে দিয়েছেন। এটা এভাবে স্পষ্টভাবে কোরআনে বিশ বারের অধিক বলা হয়েছে। অন্য শব্দ দিয়েও একাধিকবার এ বর্ননা এসেছে।

মাইকেলঃ এর পর কি? এর পরে কি হবে?

রাশেদঃ যখন আমরা লক্ষ্য করব দেখবঃ মানুষ আত্মিক সুখ -শান্তির জন্য কি চায়, কিসে তার শান্তি বাস্তবায়িত হবে ও তার মানবিকতা বাঁচবে? তখন দেখি পাঁচটি শব্দের মাঝে এ সবের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়ঃ الاستسلام (আত্মসমর্পণ), الخضوع (নতিস্বীকার), الطاعة (আনুগত্য), الإخلاص (আন্তরিকতা বা একনিষ্ঠা), الطمأنينة ও (প্রশান্তি)। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, মানুষ এমন একটা দাসত্ব বা আনুগত্যের ছায়ায় থাকতে পছন্দ করে যা সমস্ত বিশ্ব জুড়ে থাকবে। আর এ সব শব্দের অর্থ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ইহাই ইসলামের অর্থ।

মাইকেলঃ আরো একটু বিস্তারিতভাবে বললে ভাল হত।

রাশেদঃ বিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্কের অন্যতম ফলাফল হলোঃ তার এ নতিস্বীকারের ফলে সে নিজের অন্তরে ও আশেপাশে প্রশান্তি অনুভব করে। একক মৌলিক নীতির উপর জীবনযাপন করে। এতে মৌলিক অনুভূতিগুলোর মাধ্যমে চারিত্রিক অবকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এতে জীবনে সব ক্ষেত্রে সমতা আসে, মানবিক, আত্মিক, বিবেকের ও শারীরিক সমতা লক্ষ্য করা যায়।

এমনিভাবে মুসলমান জানে, আল্লাহ তায়া'লা আমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত"। (সুরা বাকারাঃ ২৯)**

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **এবং আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের, যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূমন্ডলে; তাঁর পক্ষ থেকে"। (সুরা জাসিয়াঃ ১৩)**

সে আরো জানে আল্লাহ তায়া'লা এগুলো সৃষ্টি করে আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন আর আমাদের সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকবেনা! এটা হতে পারেনা। অবশ্যই আল্লাহ যা তাদের অধিন্যস্ত করে দিয়েছেন তার মাঝে একটা সম্পর্ক থাকবে, আর যখন সম্পর্ক থাকবে তখন অবশ্যই আল্লাহ এ ব্যাপারে একটি বিধান নাযিল করবেন যাতে এ সব সম্পর্কের বিস্তারিত বিধান থাকবে। কেননা আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা"। (সুরা আল আ'রাফঃ ৫৪)**

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ **"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?" (সুরা আল কিয়ামাহঃ ৩৬)**

অর্থাৎ এ বিশ্ব কোন বিধি-বিধান, আদেশ- নিষেধ ইত্যাদি ছাড়া চলতে পারেনা। তাই মুসলমানকে এগুলো শিক্ষালাভ করতে হবে। সে তার দ্বীনের মাঝে খুঁজে পায় জমিনের উপর মহাবিশ্ব ও শরিয়াতের ন্যায়পরায়নতা ও সমতা।

এ হিসেবে ইসলাম মানব জীবনের জন্য পূর্নাংগ জীবন বিধান দিয়েছে; মুসলিম তার রবের সাথে ইবাদত ও আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলবে, এমনিভাবে নিজেদের মাঝে লেনদেন যেমনঃ বিবাহ, তালাক, বেচাকেনা, চিরাচরিত অভ্যাস যেমনঃ খাবার ও পানের আদব, ঘুম, পোশাক পরা, গৃহে প্রবেশ ও বাহির হওয়া, এমনকি ব্যক্তিগত পাক পবিত্রতার আদবসমূহ জানবে ও বাস্তবায়ন করবে। এমনিভাবে সে সমাজ, দেশ, অন্যান্য সমাজের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলবে, যাতে জীবনের সব ক্ষেত্র শামিল হয়, যেমনঃ অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিকতা... অতএব জীবনের সব দিকের বিবেচনায় ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান।

এ দ্বীন যেমনিভাবে মুসলমানের অনুভূতির সাথে মিশে আছে তেমনিভাবে তার বিধান নাযিল করেছে আবার তার মাঝে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সমতা এনেছে। মানুষকে দুনিয়া আবাদ করতে আদেশ দিয়েছে, জগত ও নিজ সত্ত্বা হতে আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করতে বলেছে। এ সব কিছু আল্লাহর প্রতি অবনত ও তার ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। যখন এসব কিছু আল্লাহ পাকের দেয়া নিয়ম কানুন অনুযায়ী হবে তখন এগুলো আল্লাহর ইবাদতের শামিল হবে।

মাইকেলঃ তুমি যা উল্লেখ করেছ এর ফলে বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থার সম্ভাবনা রয়েছে, বা কমপক্ষে বলতে হবে জীবনের উপর দ্বীনের নিয়ন্ত্রণ ও একচ্ছত্র প্রভাব পড়বে।

রাশেদঃ আমাদের জানা উচিত প্রত্যেক জিনিসের কিছু নিয়ম আছে যেগুলো দ্বারা তার উপাদানকে পরিচালনা করা হয়। আর প্রত্যেক উপাদানের অবস্থান ও কার্যকরীতা রয়েছে, এগুলোকে যথাযথভাবে মিলাতে পারলে ভাল ফলাফল দিবে ও উদ্দেশ্য সফল হবে, আর এটাকেই আল্লাহ তায়া'লা মিজান বা পাল্লা বলেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড। যাতে তোমরা সীমালংঘন না কর তুলাদন্ডে। তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না"**।(সুরা আররাহমানঃ ৭-৯)

অতএব, মিজান বা পাল্লা হলো ন্যায়বিচার। এ পাল্লাই সব কিছুর মাঝে ন্যায়বিচার করে, এ বিশ্ব যেমন একটা নিয়ম, পরিমাপের উপর চলে এবং এর উপর ভিত্তি করে এরসকল নিয়ম বাস্তবায়িত হয়, এমনিভাবে এই স্রষ্টার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দ্বীনটি ও মিজান ও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, সমতা ও সীমালঙ্ঘন না করা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা নিজের সাথে বা অন্যের সাথে মানব আচরণে ন্যায়বিচার, আত্মসংযম ও মধ্যপন্থা হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

মানুষের নিজের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমতা বিধান অধিখাংশ সময় সে অনুযায়ী অন্যের ক্ষেত্রে হুকুম দিতে প্রলুব্ধ করে।

এ মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমতা বিধানের কথা কোরআনে সৎ লোকদের দোয়ার মধ্যে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"হে পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর"** (সুরা বাকারাঃ ২০১)

এ অর্থে আরো অনেক আয়াত আছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভূলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না"** (সুরা কাসাসঃ ৭৭)

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী"** (সুরা ফুরকানঃ ৬৭)

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"তুমি একেবারে ব্যয়-কুষ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃতি, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে"** (সুরা বনী ইসরাঈলঃ ২৯)

মাইকেলঃ আমরা দেখি এক মানুষ অন্য মানুষের রক্ত শোষণ করছে, মানুষের নৈতিকতা খারাপ হয়ে গেছে, এমনকি আল্লাহ পাক তাঁকে যে শক্তি দিয়েছে তা মানুষের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দের পরিবর্তে দুর্ভোগ, ধ্বংস, ক্ষতি ইত্যাদির কাজে ব্যবহার করে। এ সমস্যা সমাধানে ইসলাম কি বলে?

রাশেদঃ এ দুনিয়ার অশান্তি ও শাস্তি মানুষ নিজেরা নিজেদের জন্য তৈরি করেছে, এটা শুধুমাত্র এ কারনে যে মানুষ অনর্থক একটি যন্ত্র চালাতে চেষ্টা করতেছে অথচ সে ঐ যন্ত্রের কোন অংশ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। এই মানব যন্ত্রটির গোপন রহস্যগুলো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কেউ জানেন না, তিনি এর প্রকৃতি, গতিবিধি জানেন, তিনিই জানেন কিভাবে ইহা সমতা ও সামাঞ্জস্যতা বিধান করে চলবে। অথচ এখন মানুষ এ মূর্খতা ও আহম্মকির কারনে স্রষ্টার দেয়া আইন ছেড়ে দিয়েছে ও নিজেদের মনমত করা আইন মেনে চলছে। হয়তবা যা বিনষ্ট হয়েছে তা আবার নতুন করে সংশোধণ করলে শান্তি ফিরে আসবে। নতুবা এ মহাবিপদ, ধ্বংসযজ্ঞ, দুর্ভোগ, ক্ষতি,আর্তনাদ ও ধ্বংসস্তুপ থেকে উত্তরণের কোন সমাধান নেই।

মাইকেলঃ তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ যে, ইসলামের অনুসরণ ছাড়া কোন মুক্তি নেই, নতুবা মানব জাতি দুঃখ দুর্ভোগের মাঝে বাস করবে?!

রাশেদঃ ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে, দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যাক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে এটা স্পষ্ট। মানুষের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্বশীলতার অনুভূতি জাগ্রত না হলে অবাধ্যতা ও খারাপ কাজ থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারবেনা। যদি মানুষ বিশ্বাস করে যে, সে যা খুশি তা করতে পারবে, কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেনা, এমন কোন শক্তি নাই যা তার কাজের শাস্তি দিবে তখন তার অবাধ্যতা ও খারাপ কাজের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এটা ব্যক্তির জন্য যেমন ঠিক তেমনি পরিবার, জাতি, সমাজ ও পৃথিবীর সব প্রাণীর ক্ষেত্রেও ঠিক। কেননা আমরা সকলে পরীক্ষার সম্মুখীন, আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এক আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরীক্ষা।

আমি, তুমি ও অন্যান্য সকলে যাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন, সকলেই এ পরীক্ষার মুখামুখি, সকলেই আমাদের বিবেক, বদান্যতা, অনুভূতির কাছে করণীয় ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের সকলকে সিদ্ধান্ত নিতে হবেঃ সে কি তার প্রকৃত মালিকের সাথে সত্যিকারে ওয়াদাপূরণকারী, নাকি খিয়ানতকারী?

আমি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আনুগত্য এবং ওয়াদাপূরনের পথে চলব, যারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে গেছে তাদের আনুগত্য থেকে আমিও দূরে সরে যাব... এটাই আমার জন্য সুরক্ষা।

মাইকেলঃ রেল শেষ ষ্টেশনে এসে গেছে... চল নেমে পড়ি।

আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ত



আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ত

তাদের পূর্বনির্ধারিত সময়মত বন্ধুরা একত্রিত হলে মাইকেল কথা বলার অনুমতি চেয়ে বলতে শুরু করলঃ

আজকে আমি এক প্রাচ্যবিদের উত্তেজনাপূর্ণ একটি বই পড়েছি, তিনি তাতে ইসলামী শরিয়ত নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। আমি এগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চাই।

রাজিবঃ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাশেদঃ সম্ভব হলে এক এক করে উল্লেখ কর, যাতে আমরা আলোচনা করতে পারি।

মাইকেলঃ ঠিক আছে, আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি উত্তেজনাপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করছি; বইটিতে যা আছে তার বাইরেও এ বিষয়ে রাজিবের কাছে কোন প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞেস করতে পারো।

রাশেদঃ ঠিক আছে, আলোচনা শুরু কর।

মাইকেলঃ বইটিতে উল্লেখ আছে যে, ইসলামী শরিয়ত রোমান আইন থেকে সংগৃহীত, কিছু কিছু বিস্তারিত ব্যাখ্যায় সেটার সাদৃশ্য রয়েছে।

রাশেদঃ এবার আমাকে বলতে দাও, এ কথাগুলো অনেক পুরাতন, বর্তমানের অনেক প্রাচ্যবিশেষজ্ঞগণ আর একথা বলেন না। ইসলামী শরিয়ত ও আইন বিশেষজ্ঞ রাশিয়ার এক বড় প্রাচ্যবিদের সাথে একদা আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম, তার নাম প্রফেসর "লিউনিড সুকিয়ানান", তিনি বলেনঃ "পাশ্চাত্য গবেষকরা এখন আর এ ধারণা পোষণ করেন না যে, ইসলামী শরিয়ত রোমান আইন থেকে সংগৃহীত, সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছু পশ্চিমা গবেষকের কাছে এ ধারণা ছিল। এখন পাশ্চাত্যের আইন গবেষনা বিনা দ্বিধা ও নিঃশর্তে স্বীকার করে যে, ইসলামী শরিয়তের আইন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত নয়।

ইহা প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস অন্যান্য আইনের মূল উৎস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন আমি তোমাদেরকে অনেক বার বলেছি যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর বিধিবিধানগুলো সৃষ্টির উপর স্রষ্টার অধিকার সম্পর্কিত। , তদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন আদেশ নিষেধ করা হয়েছে। আর স্রষ্টার অধিকার হলো, মানুষ তার আনুগত্য হতে বের না হওয়া; কেননা সে তার রাজ্যে তারই গোলাম। এজন্যই ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস হলো ওহী, যা কোরআন ও হাদিসকে বুঝায়। আমরা সকলেই জানি যে, ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন, পার্থিব অর্থে কোন লেখা পড়া করতে জানতেন না। কাজেই এ রকম একজন ব্যক্তির পক্ষে - সংগ্রহ তো দূরের কথা - সে সব আইন জানারই কোন সুযোগ ছিলনা, আর বিশেষ করে সেটা যদি হয় অন্য ভাষায়।

এটাই প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ ডেভিড দি স্যান্টিল্যানা (David de Santillana)বলেছেনঃ "প্রাচ্য এবং পশ্চিমের দু'টি আইনের (ইসলাম ও রোমান আইন) মূল উৎস এক খোঁজা একটি বৃথা চেষ্টা মাত্র। কেননা ইসলামী শরিয়ত নির্দিষ্ট সীমারেখা ও স্থায়ী মৌলিক বিষয়াবলী ও নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত, যাকে অন্য কোন শরিয়ত বা আইনের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা ইহা ধর্মীয় শরিয়ত, যার চিন্তা ধারা আমাদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নতর।"

অন্যদিকে দু'টি আইনের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার মূল কারণ হলো মানব জাতির সমস্যার মধ্যে সাদৃশ্য হওয়া, অতঃপর এ সমস্যা সমাধানে সাদৃশ্য পাওয়া ; যা কখনো কখনো হয়ে থাকে, সমস্যা ও সমাধান একই ধরনের পরিবেশে হওয়ার কারণে। অথবা এটা হয়ে থাকে মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতির বিষয়গুলোতে , যেমনঃ রাসুল সাঃ বলেছেনঃ "দাবীকারীকে প্রমাণ দিতে হবে, আর অস্বীকারকারীকে শপথ করতে হবে"।

মাইকেলঃ তবে ইহুদি ও খৃষ্টান আইন থেকে ইসলামী শরিয়ত সংগৃহীত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা ইসলামের আগেই এদুটো আসমানী ধর্ম।

রাশেদঃ এ ব্যাপারে একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য গবেষকের কথা দ্বারাই তোমার কথার জবাব দিব, জার্মান প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ জোসেফ শাখত (Joseph Schacht) বলেনঃ "ইসলামী শরিয়ত একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উন্নত নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত, যাকে আমরা ধর্মীয় আইন বলতে পারি, বরং অন্য দুটি শরিয়ত যাকে আমরা দ্বীনি আইন বলে থাকি তা ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক দিক থেকে ইসলামী শরিয়তের কাছাকাছি।সে দুটি হলো ইহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্মের আইন কানুন। তবে এ দুটি ধর্ম ইসলামী শরিয়তের বিধিবিধানের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। কেননা অন্যদুটি ধর্মের চেয়ে ইসলামী শরিয়তে অনেক শাখা-উপশাখা ও বৈচিত্র্য রয়েছে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বিচার-বিবেচনা এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের পর আইনের এমন বিষয়গুলো প্রবর্তিত হয়েছে যেগুলো একই ধরনের হওয়াটা দুষ্কর।"

বরং তিনি এর উল্টো সম্ভাবনাও পেশ করেছেন, তিনি বলেছেনঃ "অন্যদিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আইনের বিভিন্ন শাখা উপশাখায় ইসলামী শরিয়ত অনেক প্রভাব ফেলেছে।... এছাড়াও ইসলামী শরিয়ত ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্মের সেসব অনুসারিদের আইন-কানুনের মাঝেও অনেক প্রভাব ফেলেছে যারা ইসলামের উদারতা পেয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করেছে।...আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে, প্রাচ্যের খ্রিষ্টানদের বড় দুটি দল ইয়াকুবিয়া ও নাস্তোরিয়ানরা ইসলামী শরিয়তের আইন থেকে কোন আইন গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন সংকোচ করনা। এমন সকল বিষয়ে তারা ইসলামী আইন সংগ্রহ করে যেগুলোর ব্যাপারে ধারণা করা যায় যে তা মুসলিম বিচারকের দৃষ্টিতে আসতে পারে।"

রাজিবঃ তাহলে এবার তুমি যদি ইসলামী শরিয়ত ও অন্যান্য শরিয়তের মাঝে পার্থক্যগুলো আলোচনা করতে।

রাশেদঃ সবগুলো পার্থক্য উল্লেখ করা কঠিন, বিশেষ করে তুমি নির্দিষ্ট একটি শরিয়তকে ঠিক না করলে। তবে আমি ইসলামী শরিয়তের বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করব, তুমি তখন সে বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে অন্যান্য শরিয়তের পার্থক্য করতে পারবে।

রাজিবঃ অসুবিধে নেই,

রাশেদঃ ইসলামী শরিয়তের মূল বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নরূপঃ

১। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানঃ -যেমন আগে আমি উল্লেখ করেছি- এর মৌলিক উপাদানগুলো দুটি মূল উৎস কোরআন ও হাদিস থেকে নির্যাসিত। আর মানুষের ভূমিকা হলো জীবনের বাস্তবতায় উক্ত দুই উৎস থেকে বিধি- বিধান উদ্ভাবন করা। আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ায় এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলোঃ এর বিধি-বিধানের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

২। স্থায়িত্ব এবং নমনীয়তা বা যুগের সাথে মিল রেখে চলাঃ এর মৌলিক, সামষ্টিক ও অকাট্যভাবে সাব্যস্ত বিধিবিধানগুলো স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল, এতে কোন ধরণের পরিবর্তন হবেনা, এ আইনগুলো সংরক্ষিত যা অন্য কোন বিধি বিধানে বিলীন হয়ে যাবেনা।

আর নমনীয়তা বা যুগের সাথে মিল রেখে চলার বৈশিষ্ট্য হলোঃ এর শাখা-উপশাখা ও যেসব বিধান প্রবল ধারণাপ্রসূত দলিল দ্বারা সাব্যস্ত সেগুলো যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমের বিধান হয়ে থাকে। অর্থাৎ ইসলামী শরিয়ত সেকেলে,বরং যুগের প্রতিটি নতুন সমস্যায় তার সমাধান রয়েছে।

৩। ব্যাপকতাঃ (সময়, স্থান, মানুষ ও বিধানের দিক থেকে) সময়ের ব্যাপকতা মানে এর বিধি বিধান সব যুগে সব সময় প্রযোজ্য। স্থানের ব্যাপকতা মানে ভৌগলিক কোন সীমারেখা নির্ধারিত না করে যে কোন জায়গায় এ শরিয়তের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা যায়। আর মানুষ বলতে, এর বিধানাবলীতে সব মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এর বিধানের ব্যাপকতা বলতে, মানব জীবনের সব প্রয়োজনের সমাধান এতে রয়েছে;যেহেতু ইহা মানুষের জীবনের সব ধাপে, সব বিষয়ে বিধান প্রনয়ন করেছে এবং মানুষের জীবনের সর্বস্তরে এর বিধিবিধান চলে, চাই সে ভ্রূণ হোক, শিশু হোক, যুবক হোক, বা বৃদ্ধ হোক। ইহা মৃতকেও সম্মান করে। মানুষের সাথে তার স্রষ্টার সম্পর্ক এবং মানুষের নিজের সাথে এবং অন্যদের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও বিধান করে দিয়েছে।

৪। বাস্তব সম্মতঃ ইসলামী শরিয়তের বিধি বিধানগুলো আদিষ্ট লোকদের বাস্তবতাকে গুরুত্বসহকারে দেখে আদেশ নিষেধ করেছে। ইহা যেমন মানুষের শারীরিক আত্মিক, বিবেক জ্ঞান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়গুলো লক্ষ্য রেখেছে, তেমনিভাবে এগুলো বাস্তবায়নে ব্যক্তি ও সমষ্টির শক্তিকে অবমূল্যায়ন করেনি। অর্থাৎ তাদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী আদেশ নিষেধ করেছে।

৫। মধ্যমপন্থা ও সমতা বিধানঃ ইসলামী শরিয়ত সবক্ষেত্রে সুস্থিতি ও সমতা বজায় রেখে চলে, অতি বাড়াবাড়ি ও অতি ছাড়াছাড়ির মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে চলে। ফলে ইহা শক্তি ও স্থায়ীত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যেমনঃ ইসলামী শরিয়ত ব্যক্তি মালিকানাকে কতিপয় শর্তাবলী ও নিয়ম নীতির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিমালিকানা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে, আর পুঁজিবাদে কোন ধরণের শর্তাবলী ছাড়াই স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ইসলাম এ দুয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করেছে। ইসলাম বীরত্বকে উৎসাহিত করেছে, ইহা ভীরুতা এবং উম্মত্ততা ও অদূরদর্শিতার মাঝামাঝি। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে আদেশ দিয়েছে। তবে কৃপণতা ও অপচয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করতে বলেছে।এমনিভাবে ইসলামের সব বিধি বিধান বাড়াবাড়ি এবং উদাসীনতা ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি।

৬। দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিদানের মাঝে সমন্বয় সাধনঃ কোন আইন লঙ্ঘন করলে অন্যান্য ধর্ম ও আইনের মত ইসলামী শরিয়ত ও দুনিয়াবী শাস্তির বিধান করেছে। তবে মানব রচিত আইন মানুষকে আখেরাতের শাস্তি দিতে পারেনা। পক্ষান্তরে ইসলামী শরিয়ত ইহার বিধান লঙ্ঘনকারীর ব্যাপারে আখেরাতে শাস্তির অঙ্গিকার করেছে।ফলে ইহা দুটি পরিণাম একত্রিত করেছে।

৭। মানুষের স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং যেসব বিষয়ে মানুষের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে সে সব বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ করেনি।

মাইকেলঃ রাশেদ! তুমি সব সময় তোমার ধর্মের ভাবমূর্তি ও রূপকে সুন্দর করতে বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে চেষ্টা কর।

রাশেদঃ আসলে ব্যাপারটা ধর্মীয় কট্টরতা নয়। তাহলে তুমি বিখ্যাত জার্মান কবি গ্যাটের কথাকে কিভাবে বিবেচনা করবে? তিনি বলেছেনঃ "পাশ্চাত্যের আইন ইসলামী আইনের তুলনায় অসম্পূর্ণ। আমরা ইউরোপের সবাই এখনও আমাদের সব চিন্তাধারা ও ধারণাসমুহ নিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) যেখানে পৌছেছেন সেখানে পৌঁছতে পারিনি। আর কেউই তার উপরে উঠতে পারবেনা"। গ্যাটে কি মুসলমান হওয়ার কারনে একথাগুলো বলেছেন?!

রাজিবঃ ইসলামী শরিয়তের বৈশিষ্টের শেষ পয়েন্টটি আরো স্পষ্ট করতে আলোচনার দরকার আছে!

রাশেদঃ বিজ্ঞানের সাথে ইসলামী শরিয়তের বিরোধ নেই, এ ব্যাপারে তোমাকে উদাহরণ দিচ্ছিঃ ইসলামী শরিয়ত যেসব বিষয় বিশেষ গুরুত্বসহকারে আদেশ করেছে তার মধ্যে খাওয়ার জন্য প্রাণী জবাই করার নির্ধারিত পদ্ধতিতে জবাই করতে বলেছে। তাছাড়া পশুকে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করেছে, আবার জবাই করার জন্য কতিপয় শর্ত দিয়েছে। আমি শুধু জবাই করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

ইসলামী পদ্ধতিতে পশু জবাই করতে হবে জীবিতাবস্থায়, ঘাড়ের দুই শিরার মাঝে, জবাইকৃত পাণীর ঘাড় দেহ থেকে ছিন্ন করা যাবেনা। কেননা এতে জবাইয়ের পরে পেশীগুলো নড়াচড়া করতে থাকে, ফলে পশু স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করতে পারে, যা যথাসম্ভব রক্ত মুক্ত করে (পূর্ণ রক্ত শূন্য করে)। অন্যদিকে অনৈসলামী পদ্ধতিতে জবাইয়ে পশুকে আল্লাহর নাম না নিয়ে হত্যা করা হয়, ভুল পদ্ধতিতে জবাই করা হয়, যেমনঃ গ্যাস দ্বারা শ্বাসরোধ করে হত্যা, বৈদ্যুতিক আঘাতে মৃত্যু, গুলি করে হত্যা ইত্যাদি পদ্ধতিতে জবাইয়ে পশুর মাংসপেশী নড়াচড়া করতে পারেনা। এ কারনে শরীরে রক্ত জমাট হয়ে থাকে। এ জমাট রক্ত বিভিন্ন জীবাণু জন্ম দেয়, ফলে এ মাংস ভক্ষণে জমাটকৃত রক্ত মানুষের শরীরে বিষাক্ত উপাদান সৃষ্টি করে। এছাড়াও এসব পদ্ধতিতে জবাই করলে পশু বেশি ব্যথা অনুভব করে।

আমাকে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় বলতে সুযোগ দাও, সেটা হলোঃ জবাইয়ে সময় বিসমিল্লাহ বলার শর্ত, যদিও বাহ্যিক বা বস্তুগত দৃষ্টিকোণে পশুকে খাদ্যে পরিণত করার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু ইসলাম সব কিছুকে আল্লাহর একত্ববাদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। ইসলামী শরিয়ত বড় কয়েকটি বিষয় (তথা আল্লাহ, মহাবিশ্ব, মানুষ ও এ সবের শেষ পরিণতি) মোতাবেক ধর্মীয় একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। এ সব দৃষ্টিকোণে মানুষ আল্লাহর

সৃষ্টিকূলের একটি সৃষ্ট জীব, তাই এসব প্রাণীর স্রষ্টার অনুমতি ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির উপর আক্রমণ বা সীমালঙ্ঘন করার অধিকার তার নেই; এমনকি যদিও এগুলো তাদের জীবনধারণের জন্য হোক। এজন্যই জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর অনুমতি নেয়া হয়। মুসলমান এসব কাজ তার স্রষ্টার অনুমতি নিয়ে করে, যিনি তার জন্য এসব জিনিস হালাল করেছেন। মুসলিম তার রবের সামনে সর্বদা নতঝানু ও আত্মসমর্পণকারী।

মাইকেলঃ আমি স্বীকার করছি যে, ইসলামী শরিয়তের পরিচয়, ইহার বাস্তব প্রকৃতি ও বিধানাবলীর রহস্য বুঝতে আরো অনেক গভীর পড়াশুনা ও অধ্যয়নের দরকার আছে।

সভ্যতার বাস্তব প্রকৃতিসমূহ



সভ্যতার বাস্তব প্রকৃতিসমূহ

রাজিব বন্ধুদেরকে তার সাম্প্রতিক কালের ধারনকৃত কিছু ছবি দেখিয়ে বলতে লাগলোঃ

আমার এক বন্ধুর আমন্ত্রণে তুরস্ক ভ্রমণের সময় এ ছবিগুলো ধারন করেছি। এ প্রাচীন দেশটির প্রাচীন নিদর্শন ও সভ্যতার দৃশ্যাবলী আমাকে বিস্মিত করেছে। আমার বন্ধু ইসলামী সভ্যতার কতিপয় নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে হতবাক করেছে , যা আমাকে আমার দেশ ভারতে যা দেখেছি সেখানে ফিরে নিয়ে গেছে।

মাইকেলঃ কিন্তু আমার কাছে ইসলামী সভ্যতার ভিন্ন ধরনের তথ্য রয়েছে, যা ইসলামী সভ্যতার অন্যরূপ প্রকাশ করে।

রাশেদঃ আমার মনে হয় আগে আমাদেরকে সভ্যতার অর্থ কি তা নির্ধারণ করতে হবে, এরপর আমরা চাইলে ইসলামী সভ্যতাকে মূল্যায়ন করব।

মাইকেলঃ আমার মনে হয় আমরা এর অর্থের ব্যাপারে সবাই একমত!

রাশেদঃ ঠিক আছে, প্রথমে এর অর্থ নির্ধারন করি, যদি সত্যিই সবাই এর অর্থের ব্যাপারে একমত হয় তাহলে সে অর্থেই সবাই আলোচনা চালিয়ে যাব।

মাইকেলঃ সভ্যতা হলো, মানুষের বস্তুগত ও চিন্তা-গবেষণাগত ক্রিয়াকলাপের ফলাফল (যা নির্দীষ্ট একটা সময়ের মাঝে কোন একটি সমাজ তার আবিষ্কার ও অগ্রগতির মাধ্যমে প্রকাশ করে।

রাজিবঃ মাইকেলের কথার সাথে একটু যোগ করতে চাচ্ছি, তাহলো, সভ্যতা হলো, সভ্যতা এমন সামাজিক নিয়মনীতি, যা মানুষকে অধিক সাংস্কৃতিক ফলাফল লাভে সাহায্য করে। সভ্যতা চারটি উপাদান নিয়ে গঠিতঃ অর্থনৈতিক উৎস, রাজনৈতিক নিয়ম নীতি, নৈতিক আচারানুষ্ঠান এবং বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার অনুসরণ।

আর সভ্যতা প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্প কলা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যেমন প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ও সমাজ বিজ্ঞান ।আর শিল্পকলা যেমন, স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য ও এমন কিছু শিল্প যা অগ্রগতিতে অবদান রাখে । অতএব,শিল্পকলা ও বিজ্ঞান যেকোন সভ্যতার জন্যপরস্পর সম্পূরক দুটি চালিকা শক্তি।

রাশেদঃ প্রথমে আমার বন্ধু মাইকেলের কথার উপর কিছু মন্তব্য করতে চাই। সে যা উল্লেখ করেছে সে অর্থে যখন আমরা গ্রহণ করব, তখন একটি জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রথমেই সভ্যতা হলো মানুষের ক্রিয়াকলাপ। এ লক্ষণীয় বিষয় থেকে একটি ফলাফল দাঁড়ায় যে, কোন দিক বাদ না দিয়ে মানবের গঠনের সবদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তা না হলে সভ্যতাটি অসম্পূর্ণ হবে, বা তাকে আমরা আদৌ সভ্যতা বলতে পারবনা, এটা একটি।

দ্বিতীয়তঃ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলো মানব সমাজে একটি অন্যটির থেকে ভিন্ন হতে পারে। যেসব মৌলিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ গঠিত হবে সভ্যতা তারই প্রতিচ্ছবি। সুতরাং সভ্যতার সংস্কার ও বিনষ্টের মাপকাঠিতে সেসব মৌলিক মূল্যবোধগুলো সঠিক না ভুল, সেগুলো মানুষের মানবিকতার সাথে মিল রাখে কিনা এবং পরিবেশের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্য কিনা? সেগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। আর এতেই আমাদের সামনে অন্যান্য সভ্যতার সাথে বিরাট পার্থক্যের কারণ এবং বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ায় মানবতার চরম বিপর্যয়ের কারণ প্রকাশ পাবে।

মাইকেলঃ আমার মনে হয় ইসলামী সভ্যতার যেসব অন্ধকার দিক আছে সে গুলো আমরা উপস্থাপন করব বলে তা থেকে জনাব রাশেদ ভেগে যেতে চাচ্ছে।

রাজিবঃ আমার মনে হয়, তোমার কথা দ্বারা বোঝা যায় যে, রাশেদের উচিত ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যাবলী এবং অন্যান্য সভ্যতার মাঝে এর পার্থক্য উল্লেখ করা।

রাশেদঃ ভাল কথা। মানুষ, মহাবিশ্ব ও জীবন এগুলোর ব্যাপারে ইসলামী ধ্যান ধারণা নিয়ে ইসলামী সভ্যতা গঠিত।আমি ইসলামী সভ্যতার কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করব, তবে আমাকে এসব বৈশিষ্ট্যাবলীর বিপরীতে সমসাময়িক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুরূপ বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনা করতে দাও।

ইসলামী সভ্যতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী হলো নিম্নরূপঃ

যে ইসলামী ধ্যান-ধারণায় ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করে এ ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাতে মানব হলো সৃষ্ট জীবও প্রতিপালিত। এ পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি, আল্লাহর পথ ও পদ্ধতির রক্ষক, স্বাধীন ও নিজের সব কিছু নিজেই নির্বাচনকারী। অতএব, এ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সে ভাল কাজ করতে আদিষ্ট। এমনিভাবে সে ইহকাল ও পরকালে তার স্বেচ্ছায় কৃত কর্মকান্ডের দায়-দায়িত্ব বহনকারী।

অন্যদিকে সমসাময়িক পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিকোণে মানুষ হলো মহাবিশ্বের মালিক, স্বাধীন, মুক্ত। নিজের ও মহাবিশ্বের পরিচালনায় সে নিজে যা সীমিত করে তা ছাড়া কোন সীমাবদ্ধতা ও নিষেধাজ্ঞা নেই। তার সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যৌনক্ষুধা নিবারণ ও আত্মতৃপ্তিই । এ ক্ষেত্রে সে অন্যান্য প্রাণীর মত।পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিকোণে মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে নিজে যেসব সীমারেখা দিয়েছে সেগুলো ছাড়া তার আর কোন হিসেব নেই। এমনিভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিকোণে মানুষের সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো নগণ্য ও পার্থিব।

ইসলামী ধ্যান-ধারণায় মহাবিশ্বও মানুষের ন্যায় সৃষ্ট ও প্রতিপালিত। তবে মানুষের সেবায় তা নিয়োজিত। তাই মানুষ আল্লাহর দেয়া বিধানানুযায়ী তার সাথে তাল মিলিয়ে চলে, তা মানুষের সাথে সম্পূরক হয়ে কাজ করে এবং এতে তার সাথে মানুষ শান্তি অনুভব করে।

আর পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিকোণে মানুষ ও মহাবিশ্বের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ লেগেই আছে, এদের মাঝে মিল নেই, ফলে এদুয়ের মাঝে সর্বদা প্রচন্ড দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ লেগেই থাকে।

ইসলামী ধ্যান-ধারণায় জীবন হলো মানব ও জগতের স্রষ্টার মালিকানা। এটা পরকালীন স্থায়ী জীবনের জন্য স্টেশন স্বরূপ। মৃত্যুর পর সব মানুষের দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাবে, মরণের পর আমাদের জন্য আরেকটি জীবন অপেক্ষা করছে। মানবএবং জগত ও জীবনের স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষ এ পৃথিবীর জীবন আবাদ করতে আদিষ্ট। এ জীবন হলো আখেরাতের জন্য

শস্যক্ষেত স্বরূপ। দুনিয়ার জীবনের কর্মকান্ডের হিসেব ও প্রতিদান আখেরাতে পাবে।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিকোণে জীবন শুধু দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ। সে সভ্যতা আখেরাত, হিসেব, প্রতিদান ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেনা। ফলে মানুষের সব সুযোগ সুবিধা এ জীবনেই শুধু ভোগ করবে।

এসব আলোচনা থেকে আমরা এ ফলাফলে পৌঁছতে পারি যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কখনও ইসলামী সভ্যতার সাথে মিলেনা। এদুটো সভ্যতা পরস্পর বিপরীতমুখী।

মাইকেলঃ রাশেদ! তোমার কথার উপর দু'টি দ্রষ্টব্য উল্লেখ করতে আমাকে সুযোগ দাও।

প্রথমতঃ তুমি পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করোনি, তা হলোঃ ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্ম। যেমন তুমি জীবনের ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিকোণ বলেছ যে, আখেরাত, হিসাব ও প্রতিদানে বিশ্বাস করেনা, এটা ঠিক নয়। উক্ত ধর্ম দু'টি আখেরাত বিশ্বাস করে, যদিও এ বিশ্বাসের বিস্তারিত ধরণ অন্য ধর্ম থেকে ভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ তুমি কথা বলেছ যেসব মূল ভিত্তির উপর ইসলামী সভ্যতা গড়ে উঠেছে সেগুলোর সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্যের উপর, অথচ তোমার আলোচনা ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্টাবলীর ধারে কাছেও যায়নি, যা রাজিব তোমার কাছে জানতে চেয়েছে।

রাশেদঃ প্রথম পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আমি তোমার সাথে দ্বিমত পোষণ করব। সভ্যতা গড়েউঠার মূল ভিত্তি সমূহ আর সে সভ্যতা প্রকাশকারী সমাজের উপাদানসমূহের মাঝে পার্থক্য আছে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্মের অনেক প্রভাব রয়েছে, তবে এ কথা বলা যাবে না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা এ দুটি ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, বরং এর উল্টোটা বলা যায়। এ সভ্যতা সাধারনভাবে ধর্মের বিপরীতে, বিশেষ করে গীর্জার আধিপত্যের বিপরীতে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ তা শুধু যুক্তি ও পার্থিবসর্বস্ব। আর এটাই ধর্মনিরপেক্ষবাদের মধ্যে স্বচ্ছ হয়েছে, যারা জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করার কথা বলে। আমার মনে হয় তোমরা আমার কথার সাথে একমত।

আর দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণের সাথে আমি একমত। কিন্তু আমি একটা কথা সংযোগ করব যে, এ সব মূল ভিত্তি ইসলামী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যাবলীর সারাংশ। আর সে বৈশিষ্টগুলো হলোঃ

ইসলামী সভ্যতায় ভারী শিল্পসমূহ মানুষের তৈরি। এর উদ্দেশ্য হলোঃ এর উপাদানের প্রতি লক্ষ্য রাখা, মানবিক পরিতৃপ্তি অর্জন, মহাবিশ্বের সাথে ঐকতান বাস্তবায়ন ও সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছা।

একদিকে ধর্ম ও দুনিয়া অন্যদিকে ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক সৃষ্টি করা। এই মূল ভিত্তির উপর নির্ভর করে আচার-ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সৃষ্টি করা।

মানুষের জ্ঞানের মূল উতসগুলোর মাঝে সমতা ও সামঞ্জস্য স্থাপন করা। সমস্ত উপাদান দু'রকমঃ বস্তুগত ও অদৃশ্যমান। বস্তুগত জিনিস মানুষের নাগালের মধ্যে, সে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন অনুভূতির মাধ্যমে সেখানে পৌঁছতে পারে, যেগুলোর একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। স্বভাবজাত অনুভূতির পশ্চাতে রয়েছে ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি। আবার ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির পশ্চাতে রয়েছে বিবেকের অনুভূতি। অতঃপর বিবেকের অনুভূতি মানুষকে অদৃশ্যের বিষয়গুলো বোঝার জন্য কিছু প্রাথমিক সহায়ক সূচনায় পৌঁছায়, যাতে সে ওহীর মাধ্যমে আসা অদৃশ্য বিষয়গুলো বুঝতে পারে, এবং সেগুলো মেনে নেয় ও নিজেকে আত্মসমর্পণ করে।

অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত। অর্থাৎ অন্যান্য জাতি ও সভ্যতা হতে প্রাপ্ত ফলাফল যেগুলো ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তির সাথে মিল সেগুলোকে গ্রহন করে ও অন্যান্য জাতি ও সভ্যতার সেসব ফলাফল থেকে উপকৃত হওয়ার পথ খুলে রেখেছে ও তাদের নিকট ইসলামী সভ্যতা প্রকাশ করেছে।

রাজিবঃ রাশেদ আমি দুঃখিত, মাইকেল বলেছে তার নিকট ইসলামী সভ্যতার অন্য দিকের তথ্য আছে, তাকে সুযোগ দাও যাতে তার কথা শুনতে পারি ও ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে তার ধারণা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারি।

মাইকেলঃ এ সব খারাপ দিকের অন্যতম দিক হল, যেসব দেশ এসব সভ্যতা গড়ে তুলেছে সেগুলো তরবারির শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ দেশগুলো জোর ও সহিংসতার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।

রাশেদঃ হে বন্ধু, তলোয়ার সভ্যতা তৈরি করতে পারেনা। কেননা সভ্যতার অন্যতম শর্ত হলোঃ স্থিতিশীলতা। আর এটা যুদ্ধাবস্থার সাথে বিরোধপূর্ণ। এমনিভাবে, সামরিক বিজয় মানেই চিন্তা-গবেষণা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বিজয় নয়। তুমি তাতার, মোঘল ও এরকম অন্যান্যদের ইতিহাস নিয়ে একটু ভেবে দেখ, যাদের প্রচুর সামরিক শক্তি ছিল, কিন্তু এ শক্তি দ্বারা তারা সভ্যতা গড়তে পারেনি।

তবে তোমার উদ্দেশ্য যদি হয় যে, ইসলাম জিহাদের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, তবে আমি তোমাকে বলব, বিশ্বের অনেক ভূখন্ডে মুসলিম সেনাবাহিনী পৌঁছেনি অথচ ইসলাম প্রসারিত হয়েছে এবং ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা অনেক বড় একটা বিষয় যা বিস্তারিত আলোচনার দরকার। আমি শুধু কিছু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও গবেষকের সাক্ষ্য এখানে উল্লেখ করব। আমেকিকার লেখক (The New World of Islam) বইয়ের গ্রন্থকার লোথ্রোপ স্টাডে (Lothrop Stoddard) বলেন, "আরবজাতি কখনও রক্তপাত, লুটপাট ও ধ্বংস পছন্দ করতনা। বরং তারা এর বিপরীত ছিল। তারা প্রতিভাবান, মহৎ চরিত্র ও অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকুল ছিল, পূর্ববর্তী সভ্যতা হতে প্রাপ্ত শিষ্টাচারের নেয়ামতের প্রতি খুবই সদব্যবহারকারী ছিল। যেহেতু বিজয়ী ও বিজিতদের মাঝে পারস্পরিক বিবাহ-শাদি ও চিন্তার আদান-প্রদানের বিস্তৃতি ঘটে তাই তাদের মাঝে দ্রুত সংমিশ্রন ঘটে, আর এ সংমশ্রন হতে একটি নতুন সভ্যতা জন্ম লাভ করে, যা "আরব সভ্যতা" নামে অভিহিত"।

ফরাসি অগ্রজসেনা হেনরি ডি কাসট্রি (Cte.H.de Castries ১৮৫০-১৯২৭) বলেনঃ আমরা মনে করি, বর্তমান যুগে ইসলাম ধর্মকে পর্যবেক্ষন করে দেখা যাচ্ছে যে, যারা ধারণা করছে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে তাদের এ ধারনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। যদি মুহাম্মদের ধর্ম সহিংসতা ও জোরপূর্বক প্রসারিত হত তবে মুসলমানদের বিজয়াভিযান শেষ

হওয়ার সাথে সাথে সে প্রসার থেমে যেতো, কিন্তু আমরা দেখি এখনো আল কোরআন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তার ডানা ছড়িয়ে আছে।”

ফরাসি ঐতিহাসিক গোস্তাভ লি বন (Gustave Le Bon ১৮৪১-১৯৩১) যে কথা বলেছেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামী সভ্যতার প্রভাবের ব্যাপারে এর চেয়ে সত্য কোন কথা আমি পাইনি, তিনি বলেছেনঃ

“স্পষ্ট প্রভাববিস্তারকারী আরবজাতির মত কোন জাতি ইতিহাসে পাইনি। আরবদের সাথে যে জাতিরই কোন ধরণের সম্পর্ক ছিল তারা কিছু সময়ের জন্য হলেও তাদের সভ্যতায় গহন করেছে”।

পরিশেষে তোমাদেরকে বলব, বর্তমান সভ্যতায় কিভাবে মানবিক বৈশিষ্ট্যাবলী ধ্বংসের মাধ্যমে মানুষকে ধ্বংস করে মানবজীবনকে হুমকির সম্মুখীন করা হয়েছে তা নিয়ে তোমাদের ভাবা উচিত। এর ফলে, মানবতার প্রয়োজনেই ইসলামী সমাজ গঠন স্বভাবতই অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে।

মুসলমানদের সূর্য মানবতাকে উদ্ভাসিত করেছে



মুসলমানদের সূর্য মানবতাকে উদ্ভাসিত করেছে

অভিবাদনের পর রাজিব ও রাশেদ লক্ষ্য করল মাইকেল প্রথমে কথা বলতে চাচ্ছে, রাশেদ তাকে কৌতুকের ছলে বললঃ

কি হে মাইকেল, আজ কি তুমি কোন তীক্ষ্ম তীর (সমালোচনা) প্রস্তুত করে এনেছ, তোমার নিক্ষিপ্ত তীর হতে বাঁচার জন্য আমি মনিটরের পর্দা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব!!

মাইকেলঃ না, না, নিশ্চিন্ত থাক। এবার কোন উদ্বেগ ছাড়াই তুমি তোমার পর্দায় চোখ রাখতে পারবে.... বাস্তবেই। ইতিপূর্বের সংলাপগুলো আমাকে মানবতার উন্নতিতে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তুলেছে। অতঃপর আমি "একহাজার একটি আবিষ্কার ও রহস্যময় লাইব্রেরি"নামক এ ফিল্মটি পেলাম।ফিল্মটি মাত্র ১৩ মিনিটের, কিন্তু এ বিষয়ে খুবই আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত। এতে আধুনিক মানব সভ্যতার উন্নতিতে ইসলামী সভ্যতার অবদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ফিল্মটি বিশটিরও বেশি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে।

ফিল্মটি ছোট গল্পের ধরনে তৈরি। এতে দেখা যায়, একজন গ্রন্থাগারিক কতিপয় প্রাপ্তবয়স্ক যুবক যুবতীদেরকে তাদের স্কুল কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা সফরে লাইব্রেরি ভ্রমণের সময় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। এ ভ্রমণে তারা একটি যুগ আবিষ্কার করে যা "অন্ধকার যুগ" নামে খ্যাত। ছবিতে "স্যার বেন কিংসলি" (Sir Ben Kingsley) গ্রন্থাগারিকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। যিনি পরবর্তীতে মুসলিম বিজ্ঞানী "আল জাযারী" Badi'al-Zaman Abū al-'Izz ibn Ismā'īl ibn al-Razāz al-Jazarī (1136–1206) এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি যুবকদেরকে সামনে সে যুগের কতিপয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিত্ব ও অবদান তুলে ধরেন। তাদেরকে সপ্তম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্পর্কে পরিচিত করেন। এ সময়কালকে দীপ্তময় ঐতিহাসিক যুগ বলে গণ্য করা হয়, যার যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয়নি।

রাশেদঃ ছবিটির সারাংশ কি? এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই বা কি?

মাইকেলঃ ছবিটির লক্ষ্য হলো, ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের সৃষ্টির মূল কারন ও চেতনা ছিল সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সাংস্কৃতিক সাফল্যসমূহ, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন ধর্মের বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকদেরসামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবদিগন্তের পথ উন্মোচন করে।ছবিটি দেখাতে চেষ্টা করে যে, এ ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনেকটাই বিস্মৃত।

রাজিবঃ মাইকেল তুমি যা বলেছ তাতে আমার আরো বিস্তারিত জানার আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দিলে।

মাইকেলঃ এখানে আরো বিস্তারিত আছে, যেমনঃ আল-জাযারী Badi'al-Zaman Abū al-'Izz ibn Ismā'īl ibn al-Razāz al-Jazarī (1136–1206)ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী, রসায়নবিদ ও আবিষ্কারকের মধ্যে একজন। তিনি হস্তী ঘড়ি (The elephant clock) আবিষ্কার করেন, যা পরবর্তীতে রূপ কথায় পরিনত হয়। এ ছাড়াও তিনি আরো অনেক যন্ত্র আবিষ্কার করেন যেগুলো আমরা এ ধরার বুকে সর্বত্র আমাদের নিত্য নৈমত্তিক জীবনে ব্যবহার করে থাকি। যেসব মেকানিক্যাল যন্ত্র পুরাতন মডেলে তৈরি হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, কিভাবে কৃষিবিপ্লব সৃষ্টিতে বায়ু ও পানি শক্তিকেকাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের আরেকজন হলেনঃ স্পেনের চিকিৎসক "আল -যাহরাবি" (Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi (936-1013) যিনি হাজার বছর পূর্বে শত শত ঔষধ ও অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম আবিষ্কার করেন। তার আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলো আজও আধুনিক হাসপাতালগুলোতে রোগীদের জীবন বাঁচাতে ব্যবহৃত হয়। সার্জারি কাজে এগুলোর ব্যবহার এখনও স্বীকৃত।

আরেকজন হলেনঃ হাসান ইবনে হাইসাম (Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham (965 in Basra – c. 1040 in Cairo) যিনি সর্বপ্রথম চোখ কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা দেন। এ সিনেমাটিতেসূক্ষ্ম ছিদ্রের ক্যামেরারঅনেক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই, এতে আমরা জানতে পারি, কিভাবে ইবনে হাইসাম ক্যামেরা ও চলচ্চিত্রের কাজের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন।

রাজিবঃ মাইকেল তুমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোগ করেছ। তবে তুমি একাই শুধু এ বিষয়ে গুরুত্ব ও অনুসন্ধান করোনি, আমিও এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করেছি। জার্মানী লেখিকা সিগ্রিড হানকের (Sigrid Hunke (1913-1999) উদ্দীপনাময় একটি বই পেয়েছি, যার শিরোনাম হলোঃ "আল্লাহর সূর্য পাশ্চাত্যের উপর আলোকিত" ("Allah's sun over the Occident")

মাইকেলঃ তাতে নতুন কি পেয়েছ?

রাজিবঃ আমি অনেক কিছুই লক্ষ্য করেছি, যেগুলো আমি কখনো আশা করিনি। তুমি কি জান ইউরোপীয় ভাষা সমূহে অনেক শব্দ আছে যার মূল হল আরবী।

মাইকেলঃ আসলেই অদ্ভুত! তুমি যা বলছ সে ব্যাপারে তুমি কি সিরিয়াস?!

রাজিবঃ আমি ঠিকই বলছি, তোমার সাথে ঠাট্টা মশকরা করছিনা। যেমনঃ ইংরেজি ভাষা ও অনুরূপ ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় ব্যবহৃত(Coffee)শব্দটি আরবী "কাহওয়া" (قهوة) শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এ আরবী শব্দ থেকেই উৎপত্তি হয়েছে এ পানীয় পান করার স্থানকে বুঝানোর সব শব্দাবলী। ইংরেজি (Rice) শব্দটি আরবী (أرز) শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এমনিভাবে (Sofa) শব্দটি আরবী (صُفَّة) শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে যার অর্থ হল মসজিদের পাশে বসার ছায়াময় স্থান। বরং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত অনেক শব্দাবলীও পেয়েছি যার উচ্চারন আরবী উচ্চারনের সাথে হুবহু মিল আছে, যেমন আলকোহল (Alcohol) শব্দটি।

বইটি আমাকে অনেক অজানা বাস্তবতা জানিয়েছে। লেখিকা সারাংশে বলেছেনঃ "সমগ্র ইউরোপ আরব ও আরবীয় সভ্যতার কাছে ঋণী। ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশের ঘাড়ে আরবদের ঋণ অনেক বড়। অনেক আগেই ইউরোপের একথা স্বীকার করা উচিত ছিল। কিন্তু গোঁড়ামি ও বিশ্বাসের ভিন্নতা আমাদের চোখকে অন্ধ করে দিয়েছে এবং তার উপর আবরণ ফেলে রেখেছে"।

রাশেদঃ রাজিব, যেসব বাস্তবতা ও সত্যতা তোমার দৃষ্টি আকর্ষন করেছে ও যা তোমার নিকট অজানা ছিল বলেছিলে, সেগুলো জানতে আমার আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দিলে।

রাজিবঃ যেমন, আমার জানা ছিলনা যে, যিনি সর্বপ্রথম গ্যালিনাসের (Aelius Galenus or Claudius Galenus (AD 129–c. 200/c. 216) ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন ও সমালোচনা করেছেন,অতঃপর রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক বর্ননা দিয়েছেন তিনিস্পেনের মাইকেল সারভেটাস (Michael Servetus (29 September? 1509 or 1511 – 27 October 1553) বা ইংল্যান্ডের উইলিয়াম হার্ভ (William Harvey (1 April 1578 – 3 June 1657) নন, বরং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবী বংশোদ্ভূত একজন এ তথ্য দিয়েছেন, তিনি হলেনঃ ইবন আল নাফীস (১২১৩-১২৮৮) (Ala-al-din abu Al-Hassan Ali ibn Abi-Hazm al-Qarshi al-Dimashqi)। তিনি মানব ইতিহাস ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ মহা আবিষ্কার করেন যা উইলিয়াম হার্ভের ৪০০ বৎসর পূর্বে ও মাইকেল সারভেটাসের ৩০০ বছর পূর্বে ছিল। আমার জানা ছিলনা যে, একজন আরব মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে হাইছাম (Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham (965 in Basra – c. 1040 in Cairo) সর্বপ্রথম ইউক্লিড (Euclid of Alexandria) ও টলেমির (Claudius Ptolemy (c. AD 90 – c. AD 168) ভুল শুধরিয়ে দেন। যারা দাবী করেছিলেন যে, যেসব জিনিস দেখতে চাওয়া হয় সেসব জিনিসের দিকে তাকালে চোখ শুধু রশ্মি বিকিরণ করে। অতঃপর ইবনে হাইছাম এসে এ দাবীকে ভুল প্রমাণিত করল। কেননা দেখার জন্য চোখে হতে কোন রশ্মি বিকিরিত হয়না, বরং দৃশ্যমান জিনিসের দিকে তাকালে তার প্রতিচ্ছবির রশ্মি চোখে এসে পড়ে, ফলে মানুষ দেখতে পায়।

আমার জানা ছিল না যে, আরব মুসলিম বিজ্ঞানী আবু রায়হান আল বিরুনি (৯৭৩- ১০৪৮) Abū al-Rayhān Muhammad ibn Ahmad al-Bīrūn

সর্বপ্রথম সূর্যের চারপাশে এবং নিজের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তনের তথ্য আবিষ্কার করেন। নিকোলাউস কোপের্নিকুস (Nicolaus Copernicus (1473 – 1543) বা অন্য কেউ প্রথম এটা আবিষ্কার করেননি, যা বলা হয়ে থাকে। এ বিখ্যাত প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ আরো উল্লেখ করেন যে, মুসলিম ডাক্তার আল-রাযী (আবু বকর মোহাম্মাদ ইবন যাকারিয়া আল রাযী বা আল-রাযী (৮৪১ - ৯২৬) কে সব ঐতিহাসিকগণ সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হিসেবে গণ্য করেন। কেননা বসন্ত ও হাম সম্পর্কে তার গবেষণা সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সঠিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটিকে পর্যবেক্ষণ ও উপচর্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনন্য ক্ষমতাসম্পন্ন কাজ হিসেবে ধরা হয়। তার গবেষণা তথ্য ইউরোপে এতোই খ্যাতি লাভ করে যে ১৪৮৭ সাল থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে তার এ বই ইংরেজি ভাষায় চল্লিশ বার মূদ্রিত হয়। লেখিকা আরো উল্লেখ করেন যে, আরবদের যে যুগবর্তমান ইউরোপিয়ানদের কাছে অন্ধকার যুগ হিসেবে পরিচিত ছিল, সে যুগেই আরবরা মেডিকেল এনেসথ্যাশিয়া জানত, যাকে আধুনিক যুগের আবিষ্কার মনে করা হয় । অন্যদিকে বাস্তবতা ও ইতিহাসের সাক্ষ্য হল এনেসথ্যাশিয়ায় স্পঞ্জের ব্যবহার আরবদের আগে কেউ করেনি। এ বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে ,আমাদের এ সংলাপে যার সব কিছু উল্লেখ করা অসম্ভব।

রাশেদঃ যারা ঐতিহাসিক সত্যতাকে অস্বীকার করে বা মানবসভ্যতার জন্য আরব ও মুসলমানরা নতুন কিছু সংযোগ করেনি বলে দাবী করে, তোমার উল্লেখিত বিষয়গুলো তাদের সেসব দাবীকে খন্ডন করে। বিশেষ করে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। অথচ মানবজাতি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের পদ্ধতি আরব ও মুসলমানদের হাতেই জেনেছে। আমাকে এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করার সুযোগ দাওঃ

ফ্রান্সের প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ ক্লাউড কাহেন (Claude Cahen (1909, Paris – 1991) বলেনঃ “মুসলিম বিজ্ঞানীরা – যদিও তাদের চিন্তা গবেষণা দূরে রাখা হয়- গ্রীস বিজ্ঞানীদের তুলনায় অনেক কম বিমূর্তন, তবে তাদের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রতি বিশেষ আকর্ষণ এর অভাব পূরণ করে দেয়। পরবর্তী বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে তাদের এ আকর্ষণ ও ঝোঁক স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আরব বিজ্ঞানীরা যেসব বিষয় গবেষণা করে আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এ কারনেই এ গবেষণাগুলো তাদের জীবদ্দশায় ছিল এবং তাদের পরেও অবশিষ্ট আছে।

আবু বকর মোহাম্মাদ ইবন যাকারিয়া আল রাযী (৮৪১ - ৯২৬) (যিনি অনেক বড় বিজ্ঞানী ছিলেন) বিজ্ঞানের অব্যাহত অগ্রগতির কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। মধ্যযুগের অনেক বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের কাছে এটা একটা অভূতপূর্ব মূলনীতি। “ ইতালির গবেষক লোরা ভেসিয়া ভাগলিরি (Laura Veccia Vaglieri (1893 - 1989) প্রশ্ন করেনঃ আরবরা কি রজার বেকন (Roger Bacon, O.F.M. (c. 1214–1294) এর অনেক আগেই পরীক্ষামূলক গবেষণার পথ সৃষ্টি করেনি? রসায়ন শাস্ত্রে অগ্রগতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গ্রিক বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা প্রবর্তন, পদার্থবিজ্ঞানের নানা থিউরি আবিষ্কার ইত্যাদি কি আরবদের অবদান নয়?”.....

আমেরিকার দার্শনিক ও ঐতিহাসিক উইলিয়াম জেমস ডুরান্ট (William James Durant (November 5, 1885 – November 7, 1981) বলেনঃ “আরবদের জ্ঞান বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক গবেষণার পদ্ধতিতে অগ্রগতি সাধন করেছে। ইহা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উপাদান ও শ্রেষ্ঠ অবদান। রজার বেকন যখন ইউরোপে এ তথ্য ঘোষণা করেন তার পাঁচশত বছর আগেই স্পেনের মুসলমান বিজ্ঞানী আবু মুসা জাবির ইবন হাইয়ান (Abu Mūsā Jābir ibn Hayyān ৭২১ - ৮১৫) এ তথ্য ঘোষণা করে বিশ্ববাসীকে আলোর পথ দেখান। পরবর্তী পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র মুসলমান বিজ্ঞানীদের দেয়া আলোতেই আলোকিত হয়েছিল”।

মানবজাতির জন্য আরব ইসলামী সভ্যতা যেসব আবিষ্কার ও অবদান রেখেছে তার সামান্য মাত্র এখানে পেশ করেছি।

মাইকেলঃ এসব আবিষ্কার নিঃসন্দেহে অনেক বড় সফলতা যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু একথাও ভুলে গেলে চলবেনা যে, এসব সভ্যতা পূর্ববর্তী সভ্যতা থেকে উপকৃত হয়েছে, যেমনঃ গ্রীক সভ্যতা।

রাশেদঃ বন্ধু! এটাই জ্ঞান বিজ্ঞান উন্নতির স্বাভাবিক নিয়ম। ইহা সাধারনতঃ মানবজাতির সাফল্যের ধারাবাহিকতা। একেই বলে সভ্যতার চক্র। ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদ আল্ডো মিলী এ কথাই জোর দিয়ে

বলেছেনঃ "আরবদের এ সব জ্ঞান বিজ্ঞান পূর্ববর্তী সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতার মাঝে একটা ধারাবাহিকতা ও সংযোগ সৃষ্টি করেছে। আমরা যদি আরবদের জ্ঞান- বিজ্ঞানের দিকে লক্ষ্যপাত না করি ও তাদের এসব না বুঝি তবে আদি সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতার সব কিছু ব্যাখ্যায় দুর্বোধ্য একটা শূন্যতা দেখা দিবে।"

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর, "আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতিঃ ইসলাম, চীন ও পশ্চাত্য" (The Rise of Early Modern Science: Islam, china, and the West) বইয়ের প্রণেতা ডঃ টুবি হাফ মনে করেনঃ যেসব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে ইসলামী আরব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ও তা পাশ্চাত্যের লোকদের কাছে মধ্যযুগের ইউরোপীয়ানদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ভাষান্তরের মাধ্যমে পৌঁছেছে, পাশ্চাত্যের চিন্তা-গবেষণার উন্নতিতে অনেক তার অনেক প্রভাব রয়েছে।

তবে আমাকে একটা কথা বলতে দাওঃ ইসলামী আরব সভ্যতার ফলাফল ও সাফল্য অন্যান্য সভ্যতা থেকে অনেকটা আলাদা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যা অন্যান্য সভ্যতায় পাওয়া যায়না। এগুলোর উল্লেখযোগ্য হলোঃ

ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বীন থেকে কখনো আলাদা হয়নি। বরং দ্বীনই এগুলোর পিছনে মূল কার্যকরী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মুসলমানদের জ্ঞান বিজ্ঞান কখনো গোপন ছিলনা। বরং তারা নানা ভাবধারার মানব জাতির মাঝে তা প্রচার প্রসার করতে আগ্রহী ছিল। তাই মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউরোপ থেকে আগত সকল ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

নিঃসন্দেহে আমি সে সভ্যতা নিয়ে গর্ববোধ করি।

মানুষ যখন শূদ্র (সমাজচ্যুত)



মানুষ যখন শূদ্র (সমাজচ্যুত)

রাজিব ও রাশেদ মাইকেলের আগে সংলাপ কক্ষে উপস্থিত হয়েছে, তাদের মাঝে আলোচনা চলছিল, রাজিব এ বলে কথা শুরু করলঃ

একটি বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই, এ বিষয়ে ইসলামের ধারণা ও মতামত কি তা জানতে ইচ্ছা করে, কেননা এ বিষয়টি ও তা সম্পর্কে ইসলামের মতামতের সম্পর্ক রয়েছে।

রাশেদঃ হ্যাঁ, বল।

রাজিবঃ আমার দেশ ভারতে এক শ্রেণীর লোক আছে যাদেরকে বলা হতো ‘ শূদ্র’ (সমাজচ্যুত), বর্তমানে তাদেরকে হারিজান বা ভগবানের পুত্র বলা হয়, ভারতের ঐতিহাসিক নেতা মহাত্মা গান্ধী তাদেরকে এ নামে অভিহিত করেন। যদিও ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) নামে ডাকতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, তথাপি বাস্তবতা ও জরিপে দেখা যায় যে, “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) গোষ্ঠী এখনও ভারতের গ্রামাঞ্চল ও ছোট ছোট শহরে বিদ্যমান রয়েছে।

রাশেদঃ কিন্তু এ “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) গোষ্ঠীর কি সমস্যা?

রাজিবঃ এটা শুধু সমস্যাই নয়, বরং এটা মর্মান্তিক (ট্রাজেডি) ব্যাপার। মানবিক ট্রাজেডি যা সব ধরণের মানবাধিকার লজ্ঝনের শামিল।

এসময় মাইকেল তার বন্ধুদের সাথে যোগ দিল। তাদেরকে অভিবাদন জানাল...

রাশেদঃ মাইকেল তোমাকে স্বাগতম, একটু আগে রাজিব আলোচনা শুরু করেছে, রাজিবের আলোচনা পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে তুমি বিষয়টি বুঝতে পারবে.... রাজিব তুমি আলোচনা চালিয়ে যাও...

রাজিবঃ হিন্দু ধর্মানুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। সর্বোত্তম শ্রেণী হল ব্রাহ্মণ, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এরা ভগবান ব্রহ্ম তার মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, এদের মধ্য থেকে শিক্ষক, পুরোহিত ও বিচারক হবেন। এদের পরের স্তরে হল “ক্ষত্রিয়” যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্রষ্টার বাহু থেকে। রাজ্যশাসন, রাজ্যরক্ষা এবং জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা তাদের দায়িত্ব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অনুসারে যারা এরূপ গুণ ও কর্মের অধিকারী তারাই ক্ষত্রিয়। এদের পরে “বিষ্ণু” তাদেরকে ভগবানের রান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এরা কৃষি ও ব্যবসা করবে আর সম্পদ যোগাড় করবে ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে ব্যয় করবে। সর্বনিম্ন শ্রেণী হল ‘শূদ্র’, এদেরকে ভগবান পা থেকে সৃষ্টি করেছেন। জাত নিগ্রোদের সাথে, এদেরকে “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) জাতি বলা হয়। এদের কাজ হল উপরোক্ত সম্মানিত তিন শ্রেণীর লোকদের সেবা করা, এদের পেশা হল ছোট খাট ও নোংরা কাজ করা।

রাশেদঃ তুমি কি বুঝাতে চেয়েছ তা আমি বুঝেছি...

রাজিবঃ দুঃখিত, তুমি এখনো বুঝতে পারনি।

মাইকেলঃ এর চেয়েও কি খারাপ অবস্থা আছে? এ স্তরভেদ কি এখনও বিদ্যমান রয়েছে?

রাজিবঃ হ্যাঁ, আমি রাশেদকে বলেছি যে, এ স্তরভেদে “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) জাতির সাথে খারাপ আচরণ এখনও বিদ্যমান, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। এদের সাথে আচরণ দেখে মনে হয়না যে এরা মানব জাতির কোন স্তরে আছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে হিন্দু শাস্ত্রের আইন মোতাবেক সর্বনিম্ন শ্রেণী হলো “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) জাতি। এদের আইনের মধ্যে একটা হলঃ যে কেউ “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) জাতিকে দ্বীনের বিষয়ে কিছু শিক্ষা দিলে সেও ঐ “শূদ্রর” সাথে জাহান্নামে যাবে। “শূদ্ররা” শহরের বাহিরে বসবাস করবে, ভাঙ্গা পাত্র ব্যতিত অন্য কোন ভাল পাত্র ব্যবহার করতে পারবেনা। তারা কুকুর ও গাধা ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মালিক হতে পারবেনা। মৃত্যু ব্যক্তিদের পোশাক ছাড়া অন্য পোশাক তারা পরিধান করতে পারবেনা। সর্বদা খালি পায়ে হাঁটবে, নারীরা লৌহের অলঙ্কার ব্যবহার করবে, তাদের যাবতীয় সম্পর্ক তাদের মাঝেই সীমিত থাকবে, তারা নিজেদের মাঝে বিবাহ শাদীতে আবদ্ধ হবে (অন্য কোন শ্রেণীর সাথে বিবাহ শাদী বৈধ নয়)। তাদের আইনে আরো বলা হয়েছেঃ

-যা এখনও ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান- কোন “শূদ্র” যখন দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলবে তখন তার মুখে গরম তেল নিক্ষেপ করা হবে!! এর চেয়েও আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এখন ও গ্রামেগঞ্জে “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) জাতিদের জন্য সকাল নয়টার আগে ও বিকাল তিনটার পরে বাহিরে বের হওয়া নিষেধ; কেননা সে সময় তাদের ছায়া লম্বা হয়, আর ব্রাহ্মণরা “শূদ্রদের” ছায়া অতিক্রম করলে নাপাক হয়ে যাবে। আর গোসল করে সে নাপাকি দূর করা পর্যন্ত ব্রাহ্মণরা তাদের খাবার ও পানীয় গ্রহণ করতে পারেনা!!....

মাইকেলঃ কান্ডহীন ব্যাপার! এসব কি এ যুগেও আছে?! ভারতীয় সমাজে তাদের সংখ্যা শতকরা কত হবে?

রাজিবঃ “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) জাতিরা ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪৫%, অর্থাৎ ৮০% হিন্দুর মধ্যে তারা ৪৫%, অন্যদিকে হিন্দুদের অন্যান্য তিন শ্রেণী হল ১১% ।

রাশেদঃ কিন্তু তুমি বলেছ যে, গত শতকের চল্লিশের দশকে ভারত সরকার “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) জাতিকে এ নামে ডাকতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তাহলে তো তাদের সাথে এ সব আচরণও করা নিষেধ। আর এগুলো আইনের মাধ্যমে হওয়া উচিত।

রাজিবঃ তোমার কথা সঠিক, কিন্তু সমস্যা হলো পবিত্র জাতি ও অপবিত্র জাতি হিসেবে শ্রেণী বিন্যাস ও মানব জাতির মাঝে এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পার্থক্য করা। এটাকে হিন্দু ধর্মের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গন্য করা হয়। তারা হিন্দু জাতি ছাড়া অন্যদেরকে এবং তাদের মাঝে উক্ত তিন উচ্চ শ্রেণীর লোক ছাড়া বাকিদেরকে নোংরা ও অপবিত্র মনে করে।

রাশেদঃ তাদের এ আইন অন্যায় । এতে মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমান করা হয় এবং এমন বিষয়ের ভিত্তিতে মানুষের মাঝে পার্থক্য করা হয় যাতে মানুষের হাত নেই। কিন্তু তুমি যা উল্লেখ করেছে তার সাথে ইসলামের ধারনার সাথে কি সম্পর্ক?

রাজিবঃ সম্পর্ক হলো অনেক “শূদ্র”(সমাজচ্যুত) জাতি বিশেষ করে তাদের ব্যাপারে পূর্বোল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা আইন জারি করার আগে অন্যান্য ধর্মে দীক্ষিত না হয়ে শুধু ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন; যদিও তারা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ইংরেজদের উপনিবেশে বসবাস করত এবং যদিও ইংরেজরা মানুষকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে অনেক মিশনারি পাঠিয়েছে।

রাশেদঃ সম্ভবত ইসলাম মানুষকে যে সম্মান দেয় তা তারা বুঝতে পেরেছে। যারাই ইসলামের বাস্তবতা, মানবাধিকার এবং ছোট বড়, ধনী গরিব সকলের মাঝে সমঅধিকার ও স্বাধীনতা বুঝতে পারবে তারাই এ ধর্মের অনুগত হয়ে দীক্ষিত হবে... আমার মনে হয় তারা মুসলমানদের সাথে বসবাসের কারণে এ সব কিছু বুঝতে পেরেছে (ফলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন)।

মাইকেলঃ তুমি বুঝাতে চাচ্ছ যে, ইসলাম স্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে সম্মান করে? ... স্বাধীনতা ও মানবাধিকার কোন ধর্মের মাধ্যমে জানা জায়নি, বরং এ সবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন পশ্চিমা দার্শনিক ও গবেষকরা। আর বিভিন্ন জাতি অত্যাচার, নির্যাতন, অধিকার ও স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে গিয়ে এসব আঁকড়ে ধরেছে। এসব অধিকার ইসলামে নেই। ইসলামে কোথায় ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা? আর কোথায় ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার অধিকার? কোথায় বাক স্বাধীনতা? কোথায় নারীর অধিকার? বাস্তবতাকে গোপন করে তুমি তোমার ধর্মের ব্যাপারে এত কঠোর বিশ্বাসী হইওনা....।

রাশেদঃ বন্ধু তুমি অনেক দীর্ঘ আলোচনার পথ উন্মুক্ত করলে। কিন্তু আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম তুমি সুনিশ্চিত বিজয়ীর ভাষায় কথা বললে, যেন পশ্চিমা সমাজ মানবাধিকারে অনুসরনীয় (মডেল) পর্যায়ে পৌঁছে গেছে.... যদি তারা এ স্থানে পৌঁছেই যায় তবে তুমি ঐ সব দণ্ডবিধির কি ব্যাখ্যা করবে যা ইউরোপের বিভিন্ন চিন্তাবিদ, লেখক ও ঐতিহাসিকের বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছিল, শুধু মাত্র হলোকস্ট (জার্মান বাহিনী কর্তৃক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের উপর চালানো গণহত্যা) হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তাদের সন্দেহ বা মৃত্যু সংখ্যা আরো অনেক কম বলে মতামত দেয়ার কারণে। এগুলো কি তথ্য ও গবেষণার মাধ্যমে সত্যতায় পৌঁছতে বাঁধা নয়? স্বাধীন চিন্তা গবেষণা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতার পথে বাঁধা নয়? বৃটিশ রাজতন্ত্রে কেউ কি গণতান্ত্রিক দল বা জার্মানে নাৎসি দল গঠন করার অধিকার আছে? বরং বৃটেনে আমি একজন মুসলমান হিসেবে আইনগতভাবে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারব? যদিও আমার ধর্ম এ ব্যাপারে আমাকে অধিকার দিয়েছে। সরকার কি এ সব অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না?

মাইকেলঃ এ সব স্বাধীনতা ও অধিকার মূলত মানবাধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। এ সব অধিকার স্থিতিশীল, সংগঠিত এবং আইন ওবিধিবিধানের মাধ্যমে লিখিত, তাই সকলকে তা মানতে হবে। হলোকস্ট হত্যাকান্ডের ব্যাপারে সন্দেহ করা ইহুদী বিদ্বেষের সাথে যুক্ত। ইহা জাতিবিদ্বেষ যা শুধুমাত্র ঘৃণা ছড়াবে। এমনিভাবে ইহা ভ্রাতৃত্ব ও সমঅধিকারের বিপরীত। ইহা চিরস্থায়ী ও ধর্মীয় মহাপবিত্রতা যা রূপান্তর বা অস্বীকার করা যায়না, যদিও এতে অন্যের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধ হয়। এমনিভাবে তোমার উল্লেখিত ঐ সব দেশে দল গঠনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং একাধিক বিবাহ বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকারের আওতায় পড়ে না । যেহেতু এগুলো আবেগ এবং ব্যক্তি বিবেকের সীমানা বহির্ভূত। কেননা ইহা আইন, সামাজিক অঙ্গিকার ও যে সংবিধানের উপর অধিকাংশ লোক একমত তা লঙ্ঘন করার নামান্তর। এছাড়াও এতে অন্যের অধিকারের উপর সীমালঙ্ঘন(যদিও মহিলা রাজি থাকে)। তবে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য নারী রাজি থাকলে তার সাথে যৌন সম্পর্ক করা বৈধ।

রাশেদঃ খুবই সুন্দর..... তাহলে আমি যেগুলো অন্যায়, অধিকার ও স্বাধীনতার বাঁধা বলে মনে করি সেগুলোকে তুমি মনে করছ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত এবং এতে কোন জুলুম নেই। আর ইহাই হুবহু ভারতের হিন্দু ধর্ম গুরুদের দ্বারা হচ্ছে যা আমাদের বন্ধু রাজিব উল্লেখ করেছ। তুমি কি মনে কর তারা একে অন্যের অধিকারের উপর সীমালঙ্ঘন মনে করে? অবশ্যই না...।

রাজিবঃ তোমার কথায় মনে হচ্ছে তারা যে শ্রেণী বিন্যাসের অনুশীলন করে তা সঠিক ও অন্যান্য শ্রেণীর থেকে তারা মর্যাদাপূর্ণ।

রাশেদঃ মোটেই না...... তবে আমার উদ্দেশ্য হলো যে, আমরা অধিকার ও স্বাধীনতাকে মূল্যবোধ এবং সাধারণ আইনের কাঠামো হতে আলাদা করতে পারিনা।আমরা যখন কারো অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বিবেচনা করব তখন মূল্যবোধ ও মৌলিক নীতির দিকে দেখব, মানুষ কি অনুশীলন করে বা কিভাবে তা বাস্তবায়ন করে তা লক্ষ্য করব না। যখন আমরা এ ব্যাপারে একমত হলাম তখন দেখব যে, মানবাধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলামের ভাবধারা ও পশ্চিমা ভাবধারার মাঝে ব্যাপক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্য মূলত মানুষের মূল উপাদান এবং অধিকার ও স্বাধীনতার অর্থের ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে হয়েছে। কেননা, মানুষ, জগত ও জীবনের ব্যাপারে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। আর ইহাই আমার বন্ধু মাইকেলের ব্যাপারে হয়েছে যখন সে দ্বীন, ভ্রাতৃত্ব, সমতা ইত্যাদি বাদ দিয়ে পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থার চিন্তাধারায় অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিয়েছে। আর এগুলোকে স্থায়ী ও মহাপবিত্র বলেছে। অথচ ইসলামে এ সব ভাবধারার ভিন্ন অর্থ রয়েছে।

আমরা যখন ইসলামে মানবাধিকারের কথা আলোচনা করব তখন দেখব ইহা ধর্মীয় ভাবেই সমাজের সকলের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা পূরণ করেছে। ইসলাম অধিকারের জন্য সাধারণ নিয়মনীতি, দয়া ও ভাল আচরণ ইত্যাদি সীমারেখা তৈরি করেছে, এছাড়াও আইনি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। বরং ইসলামে অধিকার শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, অন্যান্য প্রাণীর জন্যও রয়েছে অধিকার।

মাইকেলঃ তোমাদের ধর্মে প্রাণীদের জন্য অধিকার আছে তা আমি জানতাম না।

রাশেদঃ যেসব প্রাণী ক্ষতি করেনা বা যেগুলোর ক্ষতি করার সম্ভাবনা নেই এমনকোন প্রাণীকে কষ্ট দেয়া ইসলামে নিষেধ। নিজেদের আনন্দ ও খাম খেয়ালীর জন্য প্রাণী হত্যা করা নিষেধ, যেমনটা শুটিং বা কুস্তি খেলার সময় হয়ে থাকে। খাওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজে প্রাণী জবাই করতে নিষেধ

করেছে। মুসলমান যখন প্রাণী জবাই করবে তখন তার স্রষ্টার অনুমতিতে ও তার নামে এবং তার দেয়া পদ্ধতিতেই জবাই করবে। এছাড়াও পশু জবাইয়ের সময় অনেক নিয়মকানুনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, যেসব নিয়মের প্রতি খোদার বিধান থেকে বিমূখদেরকে মানুষ জবাই করার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখতে দেখা যায়না । যেমনঃ পশুর সামনে ছুরি ধারালো না করা, এক পশুর সামনে অন্য পশু জবাই না করা.... তুমি কি মনে কর, আর কোন ধর্ম প্রানীকে এমন অধিকার দিয়েছে যা মানবাধিকারকে পাকাপোক্ত করে??!

রাজিবঃ আমার মনে হয় অন্য এক সময় এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

ইসলামে মানবাধিকার



ইসলামে মানবাধিকার

রাশেদ তার কম্পিউটার অন করে যখন চ্যাটরুমে প্রবেশ করল তখন মাইকেলের ম্যাসেজ পেলঃ "আগামী বৈঠকে উপস্থিত হয়ো... আমাদের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ন আলোচনার বিষয় আছেঃ অন্যের সাথে লেনদেন, অবদমন, চিন্তা-গবেষণার স্বাধীনতা.... বিদায়"।

রাশেদ বন্ধুদেরকে রুমের মধ্যে পেয়ে অভিবাদন জানাল। অতঃপর বলতে লাগলঃ

মানবাধিকার বিষয়টি অনেক ব্যাপক, মাইকেল যা বলেছে শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এজন্যই আমি একটা সামষ্টিক সীমারেখা নির্ধারন করেছি যাতে ভিন্নতা সত্বেও আমরা সহজেই বুঝতে পারি।

মাইকেলঃ কিছু উদাহরণ দিতে বাঁধা নেই, যেমন আমি আমার চিঠিতে উল্লেখ করেছি। যাতে আমাদের আলোচনাটা কার্যকরী ও বাস্তবায়নের উপযোগী হয়।

রাশেদঃ ঠিক আছে, কোন অসুবিধে নেই।

রাজিবঃ তুমি গত আলোচনায় একটা মূলনীতি বলেছিলে, এটা এখানে ব্যবহার করা যায়। তা হলো যখন আমরা এ সব অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্লেষন করব তখন আমরা সেসব মূল্যবোধ ও মূলনীতির দিকে তাকাবো যার উপর ভিত্তি করে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোকজন এগুলোর বাস্তবায়ন ও অনুশীলন কিভাবে করে সেদিকে তাকানো যাবেনা।

রাশেদঃ ঠিক বলেছ.... স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের মূল্যবোধের অর্থে সে চিন্তাধারার প্রভাব থাকে যে চিন্তাধারা হতে তা উৎসারিত হয়। আর সে অর্থ তার সামাজিক মূল্যবোধের অনুগত হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে মাইকেলকে আমি জিজ্ঞেস করিঃ তুমি কি আমাদের সামনে পশ্চিমা সমাজের চিন্তা-গবেষণার পটভূমি ও মূল্যবোধের নিয়মকানুনগুলো আলোচনা করবে, যার উপর ভিত্তি করে পশ্চিমা ভাবধারায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

মাইকেলঃ সংক্ষেপে বলা যায়ঃ চিন্তা গবেষণা ও মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যসমূহের কাঠামো, যার উপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে গুলো হলো নিম্নরূপঃ

১- শুধু মাত্র আকল বা বিবেকই হলো অধিকার ও স্বাধীনতার মূল মাপকাঠি। যদিও এ আকল দ্বীনের কিছু মূল্যবোধ গ্রহণ করে - যেমন মুক্তিবাদিরা প্রটিষ্ট্যানটদের মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত- একমাত্র আকলই এসব মূল্যবোধ গ্রহন ও বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে বিচারক।

২- ধর্মনিরপেক্ষতা (জীবন ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন রাখা) হলো একমাত্র পদ্ধতি যা এসব অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংগঠিত করবে।

৩- (স্বাধীনতা) ও (সমঅধিকার) হলো সমাজের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, সমাজের অন্যান্য মূল্যবোধগুলো এর অধীনে এবং এর সাথে সংগঠিত হবে। এদুটো হলো (স্থায়ী) ও (মহাপবিত্র) জিনিস, এগুলোতে হাত দেয়া যাবেনা।

৪- ব্যক্তি জীবনে সুখ শান্তির জন্য তাকে মূল্যায়ন ও তার স্বার্থসমূহকে অনুমোদন করা হবে যতক্ষণ সমাজের ভূমিকা ও স্বার্থের সাথে বিরোধ না হয়।

রাশেদঃ চমৎকার, স্পষ্ট ও সুনির্ধারিত উপস্থাপনা। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে বোঝা গেলো,গীর্যা থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন করার পর পশ্চিমা সমাজে মূল মাপকাঠি হলো সবকিছুকে বিবেকের কাছে সোপর্দ করা, সাথে রয়েছে ,গবেষনামূলক ইন্দ্রিয়ানুভূতি । এসব মৌলিক উৎস থেকে অধিকার ও স্বাধীনতা উৎসারিত হয়। একথাও স্পষ্ট যে, যেসব পদ্ধতিতে এসব অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা।

আমরা একথাও বলতে পারি যে, এসব মৌলিক উৎসের উপর ভিত্তি করে (স্বাধীনতা) ও (সমঅধিকার) এদুটো হলে পশ্চিমা সমাজে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ। এর ফলেপশ্চিমা সমাজের ভাবধারা অনুযায়ী এ মূল্যবোধ দুটোর বাস্তবায়ন সর্বাগ্রে। তাই সমাজের অন্যান্য মূল্যবোধগুলো এগুলোর অধীনস্থ বা এগুলোর কারনে সীমাবদ্ধ হবে বা এগুলোর সাথে সংগঠিত হবে। এ কারনেই (স্বাধীনতা) ও (সমঅধিকার) হলো (স্থায়ী) ও (মহাপবিত্র) জিনিস যার কোন সংস্কার করা যাবেনা। এদুটোর হেফাযতের জন্য অন্যান্য মূল্যবোধ ও অধিকার বিসর্জন দেয়া হবে।

ইসলামী পটভূমি ও ব্যবস্থাপনায় এ শব্দাবলী ও পরিভাষাগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা।

রাজিবঃ তাহলে দুয়ের মাঝে তুলনা করতে হলে যে সব চিন্তা গবেষণা ও মূল্যবোধের পরিধির উপর ভিত্তি করে ইসলামে (মানবাধিকার) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে গুলো আলোচনা করা দরকার।

রাশেদঃ ইসলামে ও ইসলামী সমাজে নিয়মকানুন ভিন্নতর, সেগুলো নিম্নরূপঃ

১- (শুধু বিবেক) ও (গবেষনামূলক ইন্দ্রিয়) এর বিপরীতে ইসলামে (ওহী) হলো মূল্যবোধ ও মূলনীতির সর্বপ্রথম মৌলিক ভিত্তি, যা থেকে স্থায়ী ও পবিত্রতম জিনিসগুলো নিসৃত হয়, তবে বিবেক ও ইন্দ্রীয় জ্ঞানের ভূমিকাকে তার নিজস্ব ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসেবে অবজ্ঞা করা হয়না।

২- (ধর্মনিরপেক্ষতার) বিপরীতে ইসলামে (শরিয়ত) ও দ্বীনের সাথে দুনিয়ার কাজ কর্মের সামাঞ্জস্যতা হলো একমাত্র পদ্ধতি যার উপর ভিত্তি করে সমাজ চলে।

৩- (স্বাধীনতা) ও (সমঅধিকারের) বিপরীতে ইসলামে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর জন্য (ইবাদত বন্দেগী) ও মানুষের মাঝে (ন্যায় বিচার)। (ন্যায় বিচার মানেই সমঅধিকার নয়, যা অনেক মানুষ ধারণা করে) । এদুটো হলো ইসলামী সমাজের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, এগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে ও সংস্কার করা যাবেনা। এদুটোর অবস্থান সর্বাগ্রে,সমাজের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতাকে এর অনুগত , এর মাঝে সীমাবদ্ধ এবং এর সাথে সংগঠিত করা হয়।

৪- (ব্যক্তি স্বাধীনতার) বিপরীতে আমরা দেখি, ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ রয়েছে। একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন ও অন্যায় না করে পরস্পরের মাঝে সঙ্গতি ও ঐকতান করা।

রাজিবঃ আমরা সম্ভবত কিছু মতভেদপূর্ণ অধিকারের ক্ষেত্রে এদুটো মূল্যবোধের মাঝে তুলনা করতে পারি যাতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

মাইকেলঃ আমরা "বিশ্বাসের স্বাধীনতা" নিয়ে ইসলামী ও পশ্চিমা চিন্তা ধারার মাঝে তুলনা করতে পারি। যেসব মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এদুটো সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসবের উপর ভিত্তি করে এ দুটোর তুলনা হবে।

রাশেদঃ বিশ্বাসের স্বাধীনতা বা (ধর্মীয় স্বাধীনতার) মাঝে তুলনা করা আসলেই একটা ফলপ্রসূ ব্যাপার। বিষয়টি মূলত (দ্বীনের) ব্যাপারে ব্যাখ্যার ভিন্নতা ও দ্বীনের সাথে এদুটো সমাজ ব্যবস্থার মূল্যবোধের সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত।

পশ্চাত্যে মানুষ যে কোন ধর্মের বিশ্বাসী হতে পারে, বা ধর্ম অস্বীকারকারী বা নিজ ধর্মত্যাগকারী হতে পারে। কেননা এসব (বিশ্বাসের স্বাধীনতার) মধ্যে পড়ে, আর এটা ব্যক্তি অধিকার, এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়।

কিন্তু একই সময় আমরা পশ্চাত্য সমাজে দেখি যে, যদিও কোন মুসলমান তার ইচ্ছামত ধর্ম বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু সে অনুসরনীয় ধর্মের বাস্তবায়ন স্বাধীনভাবে করতে পারেনা। অর্থাৎ পশ্চাত্য সমাজ মুসলমানকে তার ধর্ম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অনেক রাষ্ট্রে শরিয়ত অনুযায়ী জবাই করতে নিষেধ করা হয়, এমনিভাবে দ্বিতীয় বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়। কোন কোন দেশে মুসলিম মহিলাকে তার ধর্মের নির্দেশনা অনুযায়ী পোশাক পড়তে দেয়া হয়না, অথচ এসব অধিকার অনুশীলন করা মুসলমানের ধর্মের অংশ হিসেবে ধর্তব্য... তোমার কাছে এ সবের কি কোন ব্যাখ্যা আছে?

মাইকেলঃ কেননা এসবের অনুশীলন আবেগ ও ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা বহির্ভূত, তাই এগুলো (বিশ্বাসের স্বাধীনতা) অধিকারের মাঝে পড়েনা। এছাড়াও এগুলো আইন লঙ্ঘন ও সামাজিক চুক্তি ও যে সংবিধানের উপর অধিকাংশ লোক একমত তার বিরোধীতার শামিল। এজন্যই ধর্মকে জীবনের সব কর্মক্ষত্র থেকে আলাদা করা হয়েছে।

তবে আমি তোমাকে একটা বিষয় নিশ্চিত করতে পারি, তাহলো আইনত কোন মুসলমান বৈবাহিক সম্পর্কের বাহিরে অন্য যে কোন নারীর সাথে সংসার ও জীবন যাপন করতে পারবে যতক্ষণ তারা রাজি থাকে, আর এ সম্পর্ক স্ত্রীর বিছানায় না হয়।

রাশেদঃ তবে এ সম্পর্ক আইনীভাবে বৈধ হলেও তাদের ধর্ম অনুযায়ী অবৈধ।

আমি জানি তোমরা এসব বিধিনিষেধকে অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য মর্যাদাহানিকর মনে করনা। কেননা তোমরা এসবের মাঝে ও দ্বীনের মাঝে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওনা। বরং এগুলোকে তোমরা তোমাদের স্থায়ী ও পবিত্রতম নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন সীমাবদ্ধতা ও মনে কর।

এর কারণ হলো, (ধর্ম বিশ্বাস ও দ্বীন) এর ধারণা পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে মিশে গেছে যা জীবন থেকে দ্বীনকে আলাদা করেছে। এ নীতি অনুযায়ী দ্বীনের সাথে সমাজের কোন সম্পর্ক নেই। তবে তা ব্যক্তি অনুভূতি ও বিবেক যা তার অন্তরের ভিতরে বাস করে। এগুলোকেও জীবন যাপনের অনুশীলন থেকে আলাদা করা উচিত যেমন তুমি ইতিপূর্বে বলেছ।

রাজিবঃ এখন আমি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পেরেছি।

রাশেদঃ ইসলামী ভাবধারায় সমাজে আল্লাহর দাসত্ব ও দ্বীনদারিতার সীমারেখায় (বিশ্বাসের স্বাধীনতা) গ্যারান্টিযুক্ত। এর ফলে ইসলামী সমাজ যারাই সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাজত্বকে স্বীকার করে তাদেরকে এর তার ছায়াতলে গ্রহণ করে। আর যারা তার সাথে বিদ্রোহ করে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে ও তার রাজত্ব থেকে বের করে দেয়। এর ফলে ইসলামী সমাজে একাধিক দ্বীনের অস্তিত্বকে গ্রহন করে।

তাই ইহুদি ও নাসারাদের সাথে একত্রে বসবাস করতে অনুমতি দিয়েছে ও তাদের ব্যক্তি জীবনে সব ধরণের স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে অন্যান্য ধর্ম যেমন মূর্তিপূজা ও নাস্তিকতাকে সুযোগ দেয়নি, কেননা ইহুদি ও নাসারারা হলো আসমানি ধর্মের অনুসারী তারা আল্লাহর দাসত্ব ও ফয়সালাকে সর্বোসাকুল্যে মেনে নেয়।

তবে এ দুটো ধর্মে এমনসব বিচ্যুতি এবং বিকৃতির ফলে ইসলামের সাথে এর সজ্ঘর্ষ ও বিরোধ বাঁধে যা আল্লাহর দাসত্বের সাথে বিরোধপূর্ণ, তাই তাদেরকে (বিশ্বাসের স্বাধীনতার) ক্ষেত্রে কিছুটা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদেরকে এ ধর্ম প্রচারের অধিকার দেয়া হয়নি। বিকৃতির ফলে তাদের ইবাদতের চিহ্ন প্রকাশ করতে দেয়া হয়না। এদেরকে বাক স্বাধীনতার দেয়া হলে সমাজের আইন কানুন লঙ্ঘন করা হবে ও চিরস্থায়ী ও পবিত্রতম মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হবে।

মাইকেলঃ কোন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করতে চাইলে ইসলামের নিষেধের কারন কি?

রাশেদঃ এ বিষয়টিও পূর্বে যা উল্লেখ করেছি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামে মুরতাদের ব্যাপারটি (বিশ্বাসের স্বাধীনতা)এর ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। যে শুরুতে ইসলামে প্রবেশ করেনা তাকে ইসলাম কখনও শাস্তি ও তিরস্কার করেনা। কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হয়না।

আল্লাহ তায়া'লা এ ব্যাপারে বলেছেনঃ **"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে"। (সুরা বাকারাঃ ২৫৬)।**

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেছেনঃ **"বলুনঃ সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক"। (সুরা কাহাফঃ ২৯)।**

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেছেনঃ **"তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে" (সুরা কাফিরুনঃ ৬)**

আবার একই সময়ে আমরা দেখি যারা দ্বীন ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তাদেরকে নিষেধ করেছে ও শাস্তির কথা বলেছে।

আমরা মুরতাদ সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বুঝতে পারি এভাবে যে, যারা ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তারা সমাজের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ ও মূলনীতিকে দোষারোপ ও অপবাদ দেয় যার উপর ভিত্তি করে সমাজ গঠিত হয়েছে। অথবা অন্য কথায় বলতে পারি, ইহা এ ধর্মের

সত্যতার ব্যাপারে প্রকাশ্য অপবাদ দেয়া। অথবা মানব জাতির এ ধর্মের প্রয়োজন নেই । আর এ সব কিছু সে সমাজে গ্রহণ করা হবেনা যে সমাজ এ ধর্মের সত্যতা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

আর ইহাই হুবহু পশ্চিমা সমাজে সংঘটিত হয়ে থাকে যখন কেউ স্বাধীনতার নামে স্থায়ী ও পবিত্রতম জিনিসের বিরোধিতা করবে তখন স্বাধীনতাকামীরা তাৎক্ষনিক প্রতিউত্তর দিবে। তাদের বিখ্যাত শ্লোগান উঁচু করবেঃ (স্বাধীনতা বিরোধীদের জন্য স্বাধীনতা নাই)। কেননা এভাবে তারা স্বাধীনতাকে নিঃশেষ করবে, অর্থাৎ তারা সমাজের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ ও মূলনীতিকে ধ্বংস করবে যার উপর ভিত্তি করে সমাজ গঠিত হয়েছে।

মাইকেলঃ রাশেদ তোমার সুন্দর ব্যাখ্যার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এ সংলাপে আমি খুবই আনন্দিত, আশা করি আমাদের আলোচনা চলতে থাকবে...

অনুগ্রহপূর্বক একটু খেয়াল কর!!



অনুগ্রহপূর্বক একটু খেয়াল কর!!

মাইকেলঃ দশ মিনিট পেরিয়ে গেল রাশেদকে এখনও দেখা যাচ্ছেনা.... আশ্চর্যের ব্যাপার!!

রাজিবঃ ঠিকই... এতে আমাদের অন্যান্য কাজ ও সময়ের মধ্যে প্রভাব ফেলবে।

একটু পরে রাশেদ সংলাপের রুমে প্রবেশ করল, বন্ধুদেরকে সালাম বিনিময় করে বলতে লাগলঃ

বিলম্ব হওয়ায় দুঃখিত। একটা কাজে আমাকে দেরি করে ফেলল, কাজটি বাদ দেয়া ঠিক মনে করিনি।

মাইকেলঃ রাশেদ আমাকে ক্ষমা করবা, ইহা আরব ও মুসলমানদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তোমাদের কাছে সময়ের কোন গুরুত্ব নেই, যদিও আমার কথাটা একটু কষ্টদায়ক!

রাশেদঃ তুমি যা বলেছ তা অনেকটাই সঠিক। বাস্তবিকেই আমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি আর অন্যকে আমাদের ব্যাপারে এ খারাপখারাপ ধারণা দেই...। কিন্তু এসব খারাপ আচরণকে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত করার ব্যাপারে তোমার ভ্রান্তিকে আমি শুদ্ধ করে দিব।

মাইকেলঃ তাহলে ইসলামের কারণে না হলে কি কারণে?কিন্তু আমি তো এমন আচরন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তোমাদের দেশের লোকদের মাঝেই দেখছি।

রাশেদঃ এখানে আমাদের ও তোমাদের জাতির মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছেঃ সংস্কৃতি ও পরিবেশ। প্রকৃতপক্ষ্যে ইহা পরিবেশের কারনে হয়ে থাকে আর ইসলাম এ ধরণের আচরণের ব্যাপারে দায়ী নয়।

রাজিবঃ কিভাবে? তোমাদের সংস্কৃতিতে দ্বীন কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনা?

রাশেদঃ এটা সঠিক, তবে বর্তমানের মুসলমানেরা দ্বীনের শিক্ষা সঠিকভাবে পালন করেনা, এটা হয়ত দ্বীন না জানার কারনে বা দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীনতার কারনে। যখন মানুষের উপর দ্বীনের প্রভাব ও বিশ্বাস কমে যায় তখন সে তার চারদিকের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

মাইকেলঃ আমরা যে ব্যাপারে কথা বলতেছি সে ব্যাপারে পরিবেশের প্রভাবের কারন কি?

রাশেদঃ আমি তোমাকে স্পষ্ট করে বলছিঃ যেমন তোমরা আদিকাল থেকেই প্রচন্ড ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বাস করে আসতেছ, বেঁচে থাকার বিধিমালা তোমাদেরকে এ আবহাওয়ার সাথে খাপ খেয়ে থাকতে অত্যাবশ্যকীয় করেছে। ফলে তোমরা শীতকালীন সময়ের জন্য খাবার সংগ্রহ করে রাখ, ঠাণ্ডা মোকাবেলায় জ্বালানি সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখ। এমনিভাবেই পরিবেশ তোমাদেরকে চিন্তাভাবনা ও নীতি নির্ধারন করা ছাড়াই সময়ের সুক্ষ্ম হিসেব অনুযায়ী আচরন করতে বাধ্য করছে।

আর আমাদের দেশ নাতিশীতোষ্ণ বা পরিমিত গরমের অঞ্চল, যেখানে বছরের প্রায় সময়ই আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকে। এমনিভাবে এখানে রয়েছে প্রচুর পরিমানে ধন সম্পদ। ফলে জীবন যাপনের জন্য মানুষকে খুব কম পরিশ্রম করতে হয়। আর ইহাই বসবাসকারীদের আচার আচরণে প্রভাব ফেলে। ফলে তারা কোমলতার দিকে বেশি ঝুঁকে, অন্য কথায় বলতে পারঃ অলসতা ও শ্রমবিমুখতা -গরম আবহাওয়া তাদেরকে এরূপ হতে সাহায্য করে- জীবন ধারনের জন্য সময়ের সূক্ষ্ম হিসাবের প্রয়োজন অনুভব করেনা।

রাজিবঃ সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায় মানুষের উপর পরিবেশের অনেক প্রভাব রয়েছে, এসব প্রভাবের মোকাবিলা করতে এর চেয়ে বেশি শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টিকারীর প্রয়োজন। তাহলে ইসলাম কেন পরিবেশের এসব খারাপ প্রভাব পরিবর্তন করেনি? এটাকে গুরুত্ব না দেয়ার কারনে নাকি এগুলো পরিবর্তন করতে ইসলামের সামর্থ নেই?

রাশেদঃ ইসলাম এগুলো পরিবর্তন করতে না পারার পিছনে অনেক গুলো কারন আছে যা এখানে আলোচনা করার জায়গা না। তবে সাধারনভাবে একথা বলা যায়, যে সমাজইসলামকে জীবন যাপনের মাপকাঠি হিসেবে নিয়েছে ইসলাম সে সমাজ সুসংগঠিত করতে সক্ষম। যেমনি ভাবে ইহা ইসলামের অনুসারীদেরকে যে কোন সময় সুসংগঠিত ও সুসজ্জিত করেছে। এ বিষয়ে অনেক আলোকিত উদাহরণ আছে।

মাইকেলঃ তুমি কি কিছু মডেল পেশ করতে পারবে?

রাশেদঃ অনেক মডেল আছে, তন্মধ্যেঃ

হযরত ইমারা ইবনে খুজাইমা ইবনে সাবেত (রাঃ) ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি আমার পিতা খুজাইমা কে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি কেন জমিনে চাষাবাদ করেননা? আমার পিতা তাকে বললেনঃ আমি বৃদ্ধ মানুষ, হয়ত আগামীকাল মরে যাব। উমর (রাঃ) তাকে বললেনঃ আমি আপনাকে চাষাবাদ করতে কঠোরভাবে আদেশ দিতেছি। ইমারা (রাঃ) বললেনঃ আমি উমর (রাঃ) কে আমার পিতার সাথে নিজ হাতে রোপন করতে দেখেছি।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি বেকার ব্যক্তিকে ঘৃণা করি, যে দুনিয়া ও আখেরাত কোনটারই কাজ করেনা।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু হাতেম আল রাজি (রাঃ) -তার পিতার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে- বলেনঃ " আমার পিতা কখনো কখনো খেতেন আর আমি তাকে পড়ে শুনাইতাম, তিনি হাঁটতেন আর আমি তাকে পড়ে শুনাইতাম, আবার তিনি কখনো টয়লেটেযেতেন তখনো আমি তাকে পড়ে শুনাইতাম, ঘরে কোন কিছুর জন্য আসলে তখনো তাকে আমি পড়ে শুনাইতাম। "

রাজিবঃ কিন্তু ইসলামের কি শিক্ষায় কি দৃঢ়ভাবে সময়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যাতে এর অনুসারীরা যে কোন সময়ে সে নির্দেশনার অনুসরন করতে পারে?

রাশেদঃ হ্যাঁ, ইসলামে কোরআন ও হাদিসে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেউ কোরআন, ইসলামের নবীর জীবনী ও সাহাবা ও তাবেঈনদের জীবনী দেখলে বুঝতে পারবে যে, তারা সব সময় সময়ের গুরুত্বদানকারী ও নিয়মাবনুর্তী ছিলেন। এর উদাহরণ হল আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কোরআনে অনেকবার সময়ের শপথ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"শপথ ফজরের, শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার"** (সুরা ফজরঃ ১-২) আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ **"শপথ রাত্রির, যখন সে**

আচ্ছন্ন করে” (সুরা আল লাইলঃ ১)।

আল্লাহ তায়া’লা আরো বলেনঃ “**কসম যুগের (সময়ের)**” (সুরা আসরঃ ১)।

তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি তার নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম যাতে মানুষ বছর ও সময়ের গণনা ও হিসেব করতে পারে।

ইসলামের অধিকাংশ ইবাদতে সময়ের গুরুত্ব বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কেননা ইসলামের সব ইবাদতই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। শুরু ও শেষ হিসেবে। বরং ইবাদত সহি ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সময়কে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এজন্যই ইসলামী শরিয়ত এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য সময়ানুবর্তীতাকে শর্ত করে দিয়ে সময়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ “**নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে**”।(সুরা নিসাঃ ১০৩) ।

নামাজ যা দ্বীনের খুঁটি, রাত দিনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এর ওয়াক্ত নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট আলামতে করা হয়েছে। এমনিভাবে ইসলামের অন্যান্য রুকুনগুলোঃ রোজার রয়েছে বাৎসরিক নির্ধারিত সময়। এ সময় মুসলমান নির্দিষ্ট সময়ের অনুসরন করে। এমনিভাবে যাকাত, যা আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি, যা সময়ের সূক্ষ্মতা ও নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। হজ্জের ব্যাপারেও একই কথা।

কোরআন যেমনিভাবে গুরুত্ব দিয়েছে তেমনিভাবে সময়ের গুরুত্বের ব্যাপারে রাসুলের (সাঃ) সুন্নতেও অনেক উদাহরণ রয়েছে, । কারো সাথে সময়ের অঙ্গিকারের ব্যাপারে রাসুল (সাঃ) খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। ইহা রাসুলের (সাঃ) এ হাদিসের অন্তর্ভূক্তঃ “মুসলমানগন তাদের শর্তের উপর অটল থাকবে” । তাই কারো সাথে দেখা করার সময় নির্ধারন করা মানে প্রত্যেক লোক নিজের জন্য নির্ধারিত সময় মানার শর্ত করে নেয়া। যদি সে উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে তবে সে নিজের জন্য যা শর্ত করেছে তাই ভঙ্গ করল। আর ওয়াদা ভঙ্গ করাকে রাসুল (সাঃ) মুনাফিকের আলামতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ মুনাফিকের আলামত তিনটিঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে আর তার কাছে আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে”। অতএব অযথা বিলম্বকারী ও এপয়েন্টমেন্ট ভঙ্গকারী ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসেবে গন্য হবে। ।

মাইকেলঃ তবে সব সংস্কৃতি ও সভ্যতায় সময়ের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, ইসলাম এ ব্যাপারে বাড়তি কি গুরুত্ব যোগ করেছে?

রাশেদঃ ইসলাম সময়ের সদ্ব্যবহার ও শৃঙ্খলা করতে তিনটি প্রধান মাত্রা সংযোগ করেছে। প্রথমতঃ মেয়াদ, যা মানুষের সব জিনিসের মধ্যে সময় সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, ইহা তার জীবন। সে একে আগ-পর করতে বাবাড়াতে পারেনা। সময় চলে গেলে আর ফিরে আসেনা। এজন্যই ইসলাম সময়কে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সঠিকভাবে কাজে লাগাতে বলেছে। বরং একে এ জীবনের পরের জীবনের সাথে বেঁধে দিয়েছে। পুনরুত্থান, কিয়ামতের দিনে হিসেব নিকাশ ইত্যাদির সাথে সময়কে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। এমনিভাবে ইসলাম মুসলমানকে খুব কঠিন মূহুর্তেও সময়কে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করেছে। যেমন রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ যদি কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছে এমন সময় তোমাদের কারো হাতে চারা থাকে, তবে সে যদি সক্ষম হয় তখনও যেন উক্ত চারা যেন বপন করে দেয়”।

দ্বিতীয় মাত্রা হলোঃ অত্যাবশ্যকীয় করাঃ ইসলাম সময়ের সুষ্ঠ বিনিয়োগ ও শৃঙ্খলাকে শুধু গুরুত্বই দেয়নি বরং একে মুসলমানের ইচ্ছা অনুযায়ী না রেখে অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছে। কেননা মানুষের জীবন হল সময়ের সমষ্টি মাত্র, যা শুধু তার মালিকানা নয়, বরং ইহা তার রবের পক্ষ থেকে তার সন্তুষ্ট কর্মে ব্যয়ের জন্য দান করা হয়েছে। এভাবেই ইসলাম সময়কে মানুষের জন্য মূলধন হিসেবে দিয়েছে। তার মূলধন কিভাবে বিনিয়োগ ও ব্যয় করে সে হিসেব নেয়া হবে। রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দা চারটি জিনিসের হিসেব না দিয়ে এক পা ও নড়তে পারবেনাঃ তার জীবন সম্পর্কে তা কিভাবে ব্যয় করেছে....”। রাসুল (সাঃ) আরো বলেছেনঃ “দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষই উদাসিন থাকেঃ সুস্বাস্থ্য ও সময়”। তিনি আরো বলছেনঃ “ পাঁচটি জিনিস চলে যাওয়ার আগেই সুযোগ গ্রহণ করঃ মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবন, রোগের আগে সুস্বাস্থ্য, ব্যস্ততার আগে অবসর সময়, বৃদ্ধ হওয়ার আগে যৌবন বয়স ও দারিদ্রতার আগে সচ্ছলতা – কে কাজে লাগাও-“। নিঃসন্দেহে বলা যায়, যার মূলধন বেশি হবে তাকে বেশি হিসেব দিতে হবে, (অর্থাৎ যার বয়স বেশি হবে তাকে বেশি হিসেব দিতে হবে)। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ “আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি,যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল”। (সুরা ফাতিরঃ ৩৭)।

রাসুল (সা:) বলেছেনঃ “আল্লাহ তায়া’লা যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি তাকে ষাট বছরে পৌঁছিয়েছেন তার ওজর পেশ করার সুযোগ রাখেননি”।

হযরত হাসান বছরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ “হে আদম সন্তান! তুমি কতিপয় দিনের সমষ্টিমাত্র। যখনই তোমার থেকে একদিন চলে যাবে তখনই তোমার কিছু অংশ চলে যাবে”। এ (কিছু অংশ) আবার ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডে বিভক্ত। যখনই এক মিনিট বা এক সেকেন্ড চলে যাবে তখনই কিছু অংশ চলে যাবে। অতএব সময়ই জীবন।

তৃতীয় মাত্রাটি হলঃ এ মহামূল্যবান বস্তুর প্রতি প্রেরণা ও এর প্রতিদান। সময় হল বাহ্যিক পরিবর্তনশীল বস্তু , কেউ এর উপর বলপ্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, এজন্যই ইসলাম মুসলমানের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রেরণা দিয়ে দিয়েছে যা তাকে সেসব প্রেরণা ও উৎসাহে শীর্ষে নিয়ে যায়। আর এখানেই আসে বিবেকের রক্ষণাবেক্ষণের ভূমিকা, যেহেতু তা কোন কিছু গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে মূল পরিচালিকা শক্তি। ইসলামে ব্যক্তির বিবেকের নিয়ন্ত্রণ মানে স্রষ্টার কাছে হিসেব দেয়ার ভয় ও ভাল কাজে সাওয়াব পাওয়ার আশা । আর ইহাই মুসলমানকে ব্যক্তি ও জাতির কল্যানে সময় ব্যয় করতে আহবান করে।

মাইকেলঃ এ ধর্ম খুবই অদ্ভুত!... মানব জীবনের সব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে। মানুষের জন্য কোন বিকল্প পথই রাখেনি, এমনকি তার ব্যক্তি জীবনেও।

রাশেদঃ আসলে ব্যাপারটা এ রকম নয়। ইসলাম মানুষের জন্য বৈচিত্র্যময় ও একাধিক পথ খুলে রেখেছে, সে তার ইচ্ছানুযায়ী কোন একটিকে গ্রহণ করতে পারে। তবে এ জীবন বিধান ছাড়া অন্য কোন জীবন বিধান গ্রহণ করার পথ খুলে রাখেনি। ইহা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ, মহাবিশ্ব ও জীবন -যা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি- তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলাম সময়কে শুধু বস্তুগত বিনিয়োগের দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ দুনিয়াবী কার্যপরিচালনা ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে দেখেনা, বরং এর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উঁচু ও মহৎ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ দুনিয়াবী বা বস্তুগত ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী হওয়ার আগে সে একজন অনুগত মুসলমান,যে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে ও তাঁর কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করে, তার প্রত্যেক কথা ও কাজে তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুভব করে। সুতরাং ইসলামে সময়ের বিনিয়োগ ও সুবিন্যাস শুধু একটি ভাবনা নয় যাতে শুধু অধিক মুনাফা ও উৎপাদন হয় বরং ইহা আরো উঁচুভাবনার বিষয়; যেহেতু সময়ই হল আত্মিক লক্ষ্যবস্তু যা হিসাব-নিকাশ ও শাস্তির দিন তথা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা প্রতি লক্ষ্য করে চলে।

রাজিবঃ মুসলমানের চরিত্র সম্পর্কে আমার আরো কিছু কথা আছে। তবে পরবর্তী সাক্ষাতে তা আলোচনা করা ভাল মনে করি। আবার দেখা হবে।

আমাকে একটু বলতে সুযোগ দাও!!



আমাকে একটু বলতে সুযোগ দাও!!

তিন বন্ধুর নির্ধারিত সময়ের আগেই রাশেদ প্রস্তুতি নিয়ে তার কম্পিউটারে রাজিব ও মাইকেলের অপেক্ষা করছিল। একটু পরেই এক এক করে তাদের দুজনকে দেখা গেলো। অভিবাদন বিনিময়ের পরে রাশেদ বলতে লাগলঃ

রাজিব তুমি গতকালকের আলোচনায় বলেছিলে সময়ানুবর্তীতা ছাড়াও মুসলমানদের আচার আচরণ সম্পর্কে তোমার আরো কিছু কথা আছে।

রাজিবঃ হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করছি তোমরা অন্যের সাথে আচরনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা ছাড়াও আচার আচরণের অন্যান্য দিকেও ভ্রুক্ষেপ করনা।

রাশেদঃ কিভাবে? তুমি কি আমার মধ্যে খারাপ আচরণ বা সীমালঙ্ঘনের কিছু পেয়েছ?

রাজিবঃ না, স্যরি, আসলে আমি বিশেষ করে তোমাকে উদ্দেশ্য করিনি। মূলত এটা বাস্তবিকে অনেকের মধ্যে পাওয়া যায়। আমি একটি রেষ্টুরেন্টে নোটিশ বোর্ডে লেখা দেখেছিঃ "কুকুর ও আরবদের প্রবেশ নিষেধ"! লেখাটি আমার কাছে খুবই খারাপ লাগায় মালিকের সাথে কথা বললাম। তাকে এ লেখার কারন জিজ্ঞেস করলাম। যদিও তার এ ধরণের আচরণে অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়, তথাপি সে কিছু যৌক্তিক কারন উল্লেখ করেছিল। সে বললঃ তার রেষ্টুরেন্টটি খুবই উন্নতমানের, আমির, মন্ত্রী ও বড় বড় ব্যক্তিত্ব এখানে আসে। ইতিপূর্বে সে কিছু আরব যুবকদেরকে এখানে আসতে অনুমতি দিত, কিন্তু তারা হোটেল ও কর্তৃপক্ষের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করত।

একবার একদল আরব যুবক কর্মচারীদের নিষেধ সত্বেও টেবিলগুলো তাদের ইচ্ছামত সরিয়ে ফেলল।এতে হোটেলে বিশৃঙ্খলা ও ঝামেলা দেখা দেয়।

আরেকবার তদের নিজেদের মাঝে ঝগড়া বাঁধে, তারা উঁচু স্বরে চিৎকার ও চেঁচামেচি করতে থাকে।

কেউ কেউ থালার ভেতর হাতের বিশ্রীভাবে আঙ্গুলি ডুবিয়ে দিত, যা অন্যদের কাছে ঘৃনার উদ্রেক করত ।

এমনকি তাদের কেউ কেউ কাঁটা চামুচ ও ছুরি দিয়ে পিঠ চুলকাতো।

সে আরো বললঃ তাদের এ সব খারাপ আচরনের ফলে সে অনেক বড় বড় গ্রাহক হারিয়েছে, তাই আরবদেরকে হোটেলে প্রবেশে নিষেধ করার সিদ্ধান্ত নেন।

রাশেদঃ তুমি যা বলেছ তা অনেকটাই সঠিক। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে তোমাদেরকে যা বলেছিলাম যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি, ফলে অন্যকে আমাদের সম্পর্কে খারাপ ভাবার সুযোগ করে দেই। তবে এ সব খারাপ আচরনকে ইসলামের সাথে সম্পর্ক করার ব্যাপারে তোমাদেরকে আরেকবার সংশোধন করে দিচ্ছি।

মাইকেলঃ তুমি তাহলে এসব আচরনের ক্ষেত্রেও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা বলবে?

রাশেদঃ হ্যাঁ, পরিবেশের প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। এছাড়াও এ ধরনের যুবকদের লালনপালনে ত্রুটির ব্যাপারটাও এখানে উল্লেখ করতে হবে।

মাইকেলঃ আমি লালনপালনে ত্রুটির ব্যাপারটি বুঝেছি, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পরিবেশের দ্বারা প্রভাবের ব্যাপারটি বুঝিনাই।

রাশেদঃ ব্যাপারটি বুঝার জন্য আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছিঃ যেমন ধর তোমরা যে দেশে বাস কর তা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও বরফময় অঞ্চল, শীতকাল অনেক দীর্ঘ ও কনকনে ঠাণ্ডা। বৃষ্টিপাত, বরফ ও ঠাণ্ডা বাতাস আরো শীত বাড়িয়ে দেয়। এ ধরণের আবহাওয়ায় মানুষ পূর্বপ্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে বসবাস করতে পারেনা। এ জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী গৃহ নির্মান করা জরুরী। এ সব কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে খুব সুক্ষ্মভাবে সুন্দর করে কাজ করতে হয়। যেমন ছাদ, জানালা ইত্যাদি সুক্ষ্মভাবে তৈরি করতে হয় যাতে পানি বা ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে না পারে। আবার বছরের অন্যান্য ঋতুর সাথেও মিল রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়। এ সব কিছু মানুষের আচার আচরনের মধ্যে সুক্ষ্মতা, শৃঙ্খলা ও পরিকল্পনার গুণাবলী নিয়ে আসে।

অন্যদিকে আমাদের দেশে এ সব কঠিন আবহাওয়া ও পরিস্থিতি পাওয়া যায়না। বেঁচে থাকার জন্য মানুষ এ ধরণের আচরনের প্রয়োজন বোধ করেনা। যখন এসব প্রভাবের কথা বাদ দেয়া হবে তখন অনেকের মধ্যে বিশৃঙ্খলার দোষটি দেখা দিবে। আবার একথাও ভুলে গেলে হবেনা যে, আমাদের পরিবেশ অনেকটাই উষ্ণাঞ্চলে অবস্থিত, যা শুষ্কতা বহন করে, এতে মানুষের অনুভুতিতেও শুষ্কতা নিয়ে আসে।

রাজিবঃ তাহলে এমন মানুষকে কি আমরা পরিবেশের অনুগত হিসেবে ছেড়ে রাখব? তাকে কোন আখলাক চরিত্র ও শৃঙ্খলা শেখানো হবেনা? তাকে কি আমরা এমন সুযোগ দিয়ে রাখব, যেন সে মানুষের সাথে অসুন্দর আচরন করে বিশৃঙ্খল ভাবে জীবন যাপন করে ?

রাশেদঃ আসলে ব্যাপারটি এ রকম নয়। আমি শুধু এ সব আচরনের আসল কারনগুলো উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছি।

রাজিবঃ আমরা যখন পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য বা মুসলমান জাতির মাঝে পরিবেশের কারনে অনেক ভিন্নতা পাই তাহলে দ্বীনের মাঝেও পরিবেশের কারনে বিভিন্ন পার্থক্য পাওয়া স্বাভাবিক। তাহলে ইসলাম কেন এ সব খারাপ আচরনের কারন হবেনা?!

রাশেদঃ ইসলাম মানুষের জীবন ও তার সময়কে সুশৃঙ্খল করেছে, যাতে তার সব কাজ আল্লাহর ইবাদত হয়ে যায়। (ইবাদতের প্রশস্ত অর্থে, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি)। অনেকেই জানেনা যে, শিষ্টাচারের তত্ত্ব অনেকটাই ইসলাম ধর্ম দ্বারা সাব্যস্ত, যা মুসলমানের মাধ্যমে স্পেনে পৌঁছেছিল। স্পেন পরাজয়ের পর মুসলমানদের থেকে এ জ্ঞান অন্যান্যরা গ্রহন করে। অনেক দেশই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়, যেমনঃ ফ্রান্স, স্পেন, বৃটেন। তারা এটি সামনে এগিয়ে নেয়, অন্যান্য দিকে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সংযোগ করে, ফলে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।

মাইকেল (হেসে) তোমরা মুসলমানেরা ধর্মীয় গোঁড়ামির কারনে যে কোন ভাল কাজ তোমাদের ধর্মের দিকে সম্পৃক্ত করে দাও... আমি তোমাকে এ দাবীর পক্ষ্যে দলিল পেশ করতে বলবনা, কেননা আমি জানি এটি অনেক দীর্ঘ আলোচনার বিষয়, তবে আমি এ ব্যাপারে তোমাকে ইসলামের বিধি বিধান ও আইনগুলো পেশ করতে অনুরোধ করব।

রাশেদঃ ইসলাম মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির আখলাক চরিত্র ও আচার ব্যবহারের সুষ্ঠ বিধান করেছে। কোরআন ও হাদিসে শিষ্টাচার সম্পর্কে অনেক বিধি বিধান আছে যা দ্বারা মানুষের সাথে আচার আচরনের শিল্প (শিষ্টাচার) রচনা করা যায়।

মাইকেলঃ দোস্ত, এটা সাধারণ কথা, তোমার কথার সত্যতা প্রমানে উদাহরণ পেশ কর।

রাশেদঃ আমার কথা আরো স্পষ্ট করতে উদাহরণ পেশ করব। যেমন, আমরা স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে রাসুল (সাঃ) এর আচরণ ও ব্যবহার দেখতে পাই।

আমরা যখন কোন ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর জন্য গাড়ির দরজা খুলে দিতে দেখি তখন আমরা তাকে অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র মনে করি। কিন্তু রাসুল (সাঃ) দুহাত জমিনে বিছিয়ে বসে তার স্ত্রীকে তার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উটে সাওয়ার হতে সাহায্য করতেন।

তিনি (সাঃ) স্ত্রী, শিশু ও খাদেমগনের সাথে পূর্ন দয়া, মায়া, ধৈর্য্য ও ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আচরণ করতেন। একদা রাসুল (সাঃ) জমিনে সিজদারত ছিলেন, তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন, তাঁর এক নাতী এসে তাঁর পিঠে চড়লেন, এতে রাসুল (সাঃ) ততক্ষণ নড়াচড়া করলেন না যতক্ষণ না ছোট শিশুটি তাঁর পিঠ থেকে নেমেছে।

ইসলাম কোমলতা ও নম্রতার দিকে আহবান করেছে। রাসুল (সাঃ) এ গুনের অধিকারী ছিলেন। রাসুল (সাঃ) একজন মহান নবী ও ইসলামী রাষ্টের প্রধান হওয়া সত্বেও তিনি খুবই নম্র ছিলেন। খাদেমদের সাথে রাসুল (সাঃ) এর অধিক নম্রতার কারনে তিনি নিজের কাপড় নিজেই ধৌত করতেন। তিনি তাঁর খাদেমকেসাধ্যের অধিক কাজ দিতেননা। কেউ সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করতেন। তাঁর খুবই মনুষ্যত্ব বোধ ছিল, এমনকি অমুসলিমদের সাথেও। একদা তাঁর পাশ দিয়ে এক ইহুদির জানাযা যাচ্ছিল, এতে তিনি দাঁড়ালেন। তাঁর আসে পাশে সবাই আশ্চর্যান্বিত হলে তিনি বললেনঃ মৃত্যু ব্যক্তির সম্মানের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে ধর্ম ভেদে কোন পার্থক্য নেই।

বরং ইসলাম মানুষের হাঁটার পদ্ধতিকেও তাঁর আচরণ ও চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আল কোরআন মানুষের হাঁটার নিয়ম নীতি নির্ধারিত করে দিয়েছে। আর তা হলো চলার সময় মাথা এত বেশি উঁচু না করা, যাতে মানুষের উপরে অহংকার প্রকাশ পায়। আবার এতো নীচু ও নাহওয়া যাতে নিজেকে হীন মনে হয়।

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "**অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর**"। (**সুরা লোকমানঃ ১৮-১৯**)।

রাজিবঃ আমি কি সে রেস্টুরেন্টের মালিকের সাথে দেখা হলে তার কাছে ইসলামের এ চিত্র তুলে ধরব, যার ব্যাতিক্রম সে উক্ত যুবকদের মধ্যে দেখেছে?

রাশেদঃ তোমাকে ইসলামের কিছু নিয়ম নীতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কে বলি, যা সে সব যুবকেরা বা অন্যেরা সেখানে বা অন্য কোনখানে যে খারাপ আচরণ করছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

এ সব শিষ্টাচারের মধ্যে রয়েছেঃ অন্যের সাথে দেখা হলে সালাম বা অভিবাদন করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। সমাজে সালাম ব্যাপকভাবে বিস্তার ছাড়াও ইসলাম সালামকে ভালবাসার অন্যতম কারন বলে আখ্যায়িত করেছে। সালামের জবাব দেয়াকে ওয়াজিব করেছে, ইহা শুধু সামাজিক শিষ্টাচারই নয়। এমনিভাবে ইসলাম খাবার গ্রহণকারীকে সালাম দিতে নিষেধ করেছে, যখন তার মুখে খাবার থাকে। এমনিভাবে ঘুমাতে শুরু করছে এমন ব্যক্তিকে সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তির সামনে আওয়াজ নিম্ন করার ব্যাপারে সতর্ক করেছে।

প্রয়োজন ছাড়া আওয়াজ উঁচু করাকে ইসলাম অপছন্দ করে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "**এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর**" (**সুরা লোকমানঃ ১৯**)।

বরং যে ব্যক্তি ঘরের বাহিরে তার সাথীকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করে তাকে বেআক্কেল বলেছে।

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ "**যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ**" (**সুরা হুজরাতঃ ৪**)।

রাসুল (সাঃ) কাউকে চিৎকার করে ডাকেননি, তিনি কখনও স্বর উঁচু করেননি।

ইসলাম সবখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে আহবান করেছে। সভা, খাবার টেবিল, ঘর, ঘরের বাইরে সবখানে পরিষ্কার থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। আহার ও পানের ক্ষেত্রে কতিপয় আদব কায়েদা নির্ধারন করে দিয়েছে। মানবজাতি এর আগে খাবারে জিনিস পত্র যেমনঃ চামুচ, কাঁঠি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতনা। তাদের কাছে খাবারের থালা বাসনও পর্যাপ্ত ছিলনা। রাসুল (সাঃ) তিন আঙ্গুলের অধিক আঙ্গুল ব্যবহার করে খেতে নিষেধ করেছেন, খাবার গ্রহণকারীকে হাত দিয়ে প্লেটে ঘাঁটাঘাঁটি করতে নিষেধ করেছেন, বরং তার সামনে থেকে খেতে বলেছেন। এক নিঃশ্বাসে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন, বরং তিন বার শ্বাস নিয়ে পানি পান করতে বলেছেন। খাদ্য পানীয় দিয়ে পেট পুরোপুরি ভর্তি করতে নিষেধ করেছেন। খাবারের সময় সামাজিক ও আবেগের মাত্রার দিকে খেয়াল রেখেছেন। খাবারকে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া মায়ার অসিলা করেছেন। মেহমানের সাথে খাবারের সময় কিছু খোশ গল্প করতে উৎসাহিত করেছেন যাতে সে খাবারের সময় লজ্জা না পায়। রাসুল (সাঃ) নিজ হাতে স্ত্রীদেরকে খাবার খাইয়ে দিতেন। তিনি (সাঃ) বলেছেনঃ "উত্তম সদকা হলঃ ব্যক্তি তার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা খাবার খাইয়ে দেয়"। তাঁর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) গ্লাসের যেখানে মুখ দিয়ে পানি পান করেছেন তিনি সেখানে মুখ দিয়ে পানি পান করতেন। ইসলাম খাবার ও আল্লাহর ইবাদতের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলতে নির্দেশ দিয়েছে।

মাইকেলঃ রাশেদ আমাকে একটি কথা বলতে দাও, তোমাদের দ্বীন ও তোমাদের আচার আচরনের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এ ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের চেয়ে তোমাদের দ্বীনের শিক্ষার অনেকটা কাছাকাছি।

রাশেদঃ দুঃখজনক হলেও তোমার কথা সত্য।

কোরআনের চরিত্র



কোরআনের চরিত্র

মাইকেল ও রাশেদের উদ্দেশ্যে রাজিব কথা শুরু করলঃ

গত আলোচনায় আমরা কিছু মুসলমানের আখলাক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তাই এখন আমাদেরকে ইসলামী আখলাক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে হয়। তোমরা কি বিষয়টিকে সংলাপের উপযোগী মনে করনা?

মাইকেলঃ হ্যাঁ। আমি কিছু কিছু মুসলমানকে দেখে আশ্চর্য হই, তাদের মধ্যে একদিকে কিছু উন্নত আখলাক দেখি, আবার অন্য দিকে এমন কিছু আখলাক দেখি যা উন্নত চরিত্রের সাথে মিলেনা।

রাশেদঃ এর দু'টো কারনঃ একঃ আখলাক সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, দুইঃ নির্ধারিত আখলাকের ব্যাপারে তাদের ব্যবস্থাপনা ও অভিব্যক্তির পরিসর। ব্যক্তি চরিত্র পরিবেশ ও বেড়ে উঠার মাধ্যমে ফুটে উঠে, এছাড়াও উত্তারাধিকারী সূত্রেও প্রাপ্ত হয়। এদিকেই ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ইঙ্গিত করেছেন, বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণায় এটাই প্রমাণিত।

রাজিবঃ যদি তুমি সে ইঙ্গিতটা একটু স্পষ্ট করে বলতে।

রাশেদঃ এ ইশারা দু'টি হাদিসের সারাংশ থেকে পাওয়া যায়ঃ প্রথমতঃ রাসুল (সাঃ) এক সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমার মধ্যে দু'টি গুন আছে যা আল্লাহ ও তার রাসুল পছন্দ করে। ধৈর্যশীলতা ও নম্রতা। সাহাবী বললেনঃ হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) আমি কি এদু'টো অর্জন করেছি নাকি আল্লাহ তায়া'লা আমাকে স্বভাবগতভাবেই দান করেছেন? রাসুল (সাঃ) বললেনঃ বরং আল্লাহ তায়া'লা তোমাকে স্বভাবগতভাবেই দান করেছেন। এ হাদিসে প্রমাণ করে যে, ধৈর্য্যশীলতা ও নম্রতা এমন গুন যা স্বভাবগতভাবেই ব্যক্তি জিনের গঠনের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ "জ্ঞান অর্জন হয় শিক্ষার মাধ্যমে আর ধৈর্য্যশীলতা অর্জন হয় আত্মার কঠোর নিয়ন্ত্রন ও বিনয়ের মাধ্যমে। যে কল্যান তালাশ করে তাকে তা দান করা হয়, যে অকল্যান থেকে পানাহ চায় তাকে তা থেকে রক্ষা করা হয়।" এ হাদিস প্রমাণ করে যে, ধৈর্য্যশীলতা (যা পূর্বের হাদিসে সাহাবীর ক্ষেত্রে ছিল উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া) অর্জন করা যায়। এটা অবশ্যই সামাজিকবেড়ে উঠার দীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

মাইকেলঃ ইহা অনেক দার্শনিক চিন্তা গবেষণার ব্যাপার। কিন্তু এ সব দার্শনিক দিক বাদ দিয়ে বললে বলা যায় যে, প্রথমতঃ মানুষের মাঝে আদর্শিক অনুভূতিসমূহ স্বভাবজাত, যা ভাল গুনাবলীকে পছন্দ করে আর খারাপ অভ্যাসসমূহকে ঘৃণা করে। এটা যদিও মানুষের মাঝে শ্রেণীভেদে তারতম্য রয়েছে তথাপি কোন ভেদাভেদ ছাড়াই ইহা সকল মানুষের মাঝে সাধারনভাবে বিরাজমান। কিছু ভাল গুনাবলীকে ভাল মনে করা আর কিছু খারাপ কাজকে খারাপ ভাবা সব যুগেই ছিল। যেমনঃ সত্যবাদিতা, আমানতদারীতা, ন্যায়বিচার, ওয়াদাপূরণ, অঙ্গিকার রক্ষা ইত্যাদি সব মানুষই ভাল চরিত্র মনে করেন, ইহার প্রশংসা সব যুগেই সকলে করে থাকেন, পক্ষান্তরে মিথ্যাচার, জুলুম, ধোকাবাজি ও খিয়ানতকে কোন মানুষই ভাল মনে করেন না। এমনিভাবে সমতা, দয়া, বদান্যতা, প্রশস্ত হৃদয় ও উদারতাকে সকলেই ভাল মনে করেন।

অতএব, আমরা কি বলতে পারব যে, ইসলাম এসব বিষয়ে অন্যান্য মানুষের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে? কেউ কি বলতে পারবে যে, ইসলাম চারিত্রিক গুনাবলীর ব্যাপারে অন্যান্য পদ্ধতি থেকে আলাদা মত পোষণ করে?

রাশেদঃ তুমি যে সব বাস্তবতা উল্লেখ করেছে সে গুলোকে ও উত্তম চরিত্রের গুনাবলী ও ঘটতির যেসব কথা বলেছ তা যদিও আমার জানা আছে তবুও তোমার কথার সাথে আরো একটু যোগ করতে চাই, শুধু ইসলামেই নয় অন্যান্য ধর্মেও চারিত্রিক অনেক রীতিনীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। কেননা চরিত্রের ক্ষেত্রে ভাল ও খারাপের সীমারেখা নির্ধারনে এবং খারাপ থেকে ভাল যাচাই বাচাইয়ের পদ্ধতি নির্ধারন সম্পর্কে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। কেননা আইন কানুন ও ইহার চর্চার ক্ষেত্রে সব মানুষের বিবেচনা শক্তি সমান হয়না। এসব ভিন্নতার কারনেই বিশ্বমন্ডল, ইহার অবস্থান, মানব জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ইত্যাদির ব্যাপারে ধারনারও মতানৈক্য দেখা দেয়।

যেমন, অনেক চারিত্রিক রীতি নীতির মতে আমিত্ব ই হলো চরিত্রের মূল। ইউরোপিয় রেনেসাঁ যুগে টমাস হব্স (Thomas Hobbes)ও বারুখ স্পিনোজা (Baruch Spinoza) বিভিন্নভাবে প্রমাণ করেছেন যে, স্বত্বার স্থায়িত্বকে রক্ষা করাই হল কল্যান। এমনিভাবে ফ্রয়েড তার প্রথমদিকের লেখালেখিতে একটি দর্শন পেশ করেন, যা এখনও অনেক পশ্চিমাদের কাছে আচার আচরনের মাপকাঠি ও ধরন হিসেবে বিবেচিত- আত্ম পরিতৃপ্তি (self gratification) লাভ এর অর্থ সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে, বরং এটাকে আত্মিক অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন; যেখানে আত্মমর্যাদা ও বদান্যতাকে দ্বিতীয় স্তরে রেখেছেন, যা আত্মতৃপ্তি অর্জনে নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

ব্যক্তিগত এ চারিত্রিক দিকের বিপরীতে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে যা সমষ্টি ও সমাজকে প্রাধাণ্য দেয়, যেখানে ব্যক্তি স্বার্থকে একেবারে উপেক্ষা না করে সামাজিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

মাইকেলঃ যদি আমরা বলি, ইসলাম অন্যান্য রীতিনীতি থেকে চমৎকার আলাদা কিছু চারিত্রিক রীতি-নীতির অধিকারী, তবে তা কোন ভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে? এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য কি?

রাশেদঃ আমি ইতিপূর্বে আলোচনায় উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, মানব জীবনের সব বাস্তব দিক এ জীবন বিধানে রয়েছে। এমনিভাবে এটি এমন একটি বিধান যা বিশ্বাসের ধারনাকে শামিল করে যে বিশ্বাস অস্তিত্বের ধরন ও সেখানে মানুষের অবস্থান ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে। এমনিভাবে মানুষের অস্তিত্বের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নির্ণয় করে। এটি এমন একটি জীবন বিধান যা বিশ্বাসের ধারনা থেকে সব ধরনের বাস্তব সম্মত রীতিনীতি শামিল করে। ইহা মানব জীবনের জন্য একটি স্পষ্ট বাস্তব সম্মত পথ দেখিয়ে দেয়। যেমনঃ আখলাকি নিয়ম কানুন ও তার উৎস, রাজনীতি ও তার ধরন-বৈশিষ্ট, সামাজিক নিয়মকানুন ও এর মূলভিত্তি , কাঠামো , অর্থনীতি ও তার দর্শন, রূপরেখা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ও সম্পর্ক।

ড. এম এইচ ডুরানী ইহাই তার বক্তব্যে স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন, যিনি ইংল্যান্ডে একটি গীর্জায় পাদ্রী ছিলেন। তিনি বলেনঃ

ইসলামে জীবন বিধান, আইন, চারিত্রিক নিয়মনীতি সব কিছুই আছে। ব্যক্তির উপর আবশ্যকীয় ধর্মীয় ইবাদাতের পেছনে আখলাকি উদ্দেশ্য রয়েছে। এর উদ্দেশ্য, তাকে চারিত্রিক ও আত্মিক দিকে সংগঠিত করা। এ ছাড়াও তার জ্ঞান-বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করা, এমনিভাবে তাকে শক্তিশালী করা, যাতে তার সাথে বসবাসকারী অন্যের প্রতি সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করতে পারে। ইসলামই একমাত্র তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধর্ম, ইহার অনুসারীকে অচৈতন্য ও রহস্যময় গোপনীয় কোন কিছু বিশ্বাস করতে বলা হয়না যেমনটা করা হয় খৃস্টান ধর্মে। কেননা ইসলাম আত্মিক ও পার্থিব জীবনের উভয় দিককেই সমানভাবে গুরুত্ব দেয়। প্রত্যেকটাকে তার স্থানে রেখেছে। তার দর্শন এমন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা মানবের আচার আচরনের সকল দিককে শামিল করে।

রাজিবঃ ইসলাম যেহেতু চারিত্রিক নিয়মনীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তাই ইসলামের নিয়মনীতির গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা দরকার।

রাশেদঃ ইসলামের চারিত্রিক নিয়মনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে নিম্নরুপঃ

মূল বিশ্বাসঃ যা বুঝায় মানুষ আল্লাহর সৃষ্টজীব। তার স্রষ্টা তার ভাল মন্দ সব কিছু সম্পর্কে সবচেয়ে অবগত। তিনি তাকে অনর্থক ছেড়ে দেননি। বরং তাদের কাছে তার পথ প্রদর্শক হিসেবে অনেক নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। মানুষ মৃত্যুর পর পুনুরুত্থিত হবে, যেখানে তার দুনিয়া জীবনের ভাল মন্দ সব আমলের হিসেব নেয়া হবে। এ আখলাক পশ্চিমা আখলাক থেকে ভিন্ন যা দ্বীন থেকে সরে গেছে, আর বিজ্ঞান ও জীবন থেকে গীর্যাকে আলাদা করেছে।

স্থায়ীত্বঃ ইসলামের আখলাক চরিত্রের মূল নীতিগুলো স্থায়ী এবং মানুষ, জীবন ও জগতের মূল ধারনা থেকে উৎসারিত। যুগের পরিবর্তনে ইহার মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয়না। যদিও মানব জীবনের নানা ঘটনা ও পরিস্থিতি পরিবর্তীত হয়। যেমনঃ সততা, আমানতদারিতা, ধৈর্য্য ইত্যাদি গুনাবলী সব যুগেই ভালো গুণ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। অন্যদিকে মিথ্যা, পরচর্চা, পরনিন্দা ইত্যাদি সর্ব যুগেই খারাপ দোষ হিসেবে বিবেচিত হয়। এগুলো থেকে মানুষ দূরে থাকে, জীবন ধারার পরিবর্তনের কারনে এগুলো মানুষের মাঝে পরিবর্তিত হয়না।

বাস্তবতার সাথে মিলঃ অনেকের ভুল ধারনা ইসলামের চারিত্রিক নিয়মকানুনগুলো বাস্তবতার সাথে মিল নেই, প্রকৃত পক্ষে ইহা মানব জীবনের সব বাস্তবতা ও তাদের সামর্থের সাথে মিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষই ইহা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। এটা এমন এক চরিত্র যা ব্যক্তির জীবনকে সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করে। কোন অসুবিধে ও বাঁধা ছাড়াই জীবনকে সামনে এগিয়ে নেয়। ইহা এমন আখলাক যা মানুষের স্বভাবের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। বরং মানব স্বভাবের পরিপূরক ও সামাঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব ইসলামে আখলাকের বিষয়টি মানব জীবনের বিধি বিধান , যা ইহুদি ধর্মে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং আত্মিক দিক যা খৃস্টান ধর্মে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে উভয়টাকেই শামিল করে। ভারতীয় লেখক পেগি রাডারিক এ ব্যাপারে বলেনঃ

“ইসলামের আখলাকি শিক্ষাদীক্ষায় আদর্শ ও বাস্তবতা উভয় দিকই বাস্তবায়িত হয়। এর কল্যানে মানুষ আল্লাহকে জানতে পারে, সে খোদাভীরু হয়, আবার অন্যদিকে প্রত্যাহিক জীবনের সব ধরনের কাজ কর্ম করতেও আগ্রহী হয়।”

নিয়মানুবর্তীতাঃ অর্থাৎ মানুষ জীবনের সব ক্ষেত্রে এসব আখলাক ধরে রাখতে অঙ্গিকারাবদ্ধ। কেননা মানুষ এ দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনে আদিষ্ট, তার রয়েছে নির্দিষ্ট বার্তা, সে বহন করে এক আমানত। আবার তার রয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা যা তার কাজকে বিচার বিবেচনা করে এবং এর উপর ভিত্তি করেই তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এজন্যই আখলাকি নিয়মানুবর্তীতা ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ে অনেক ভূমিকা পালন করে।

দায়িত্বশীলতাঃ মানুষ কখনো উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবেন না যতক্ষণ না তার মাঝে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি সৃষ্টি না হয়। দায়িত্বশীলতা বা জবাবদিহিতা মানে মানুষের থেকে যা ঘটে তা স্বীকার করে এর উপর ভিত্তি করে যে সব ফলাফল দাঁড়ায় সে ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হওয়া ও সেগুলো স্বীকার করা ও তার নিজের ইচ্ছায় হয়েছে মনে করা। ইহা ভাল কাজ হোক বা মন্দ কাজ হোক। আল্লাহর সামনে এবং তার অভ্যন্তরীণ আত্মা ও সমাজের সামনে এর জবাবদিহিতা থাকা।

ইসলামে দায়িত্বশীলতার একটা সীমারেখা রয়েছে। আর তা হলো ব্যক্তি দায়িত্বশীলতা ব্যক্তির স্বীকৃতি ও কাজের মাঝে সীমাবদ্ধ, আবার তার রয়েছে সামাজিক দায় দায়িত্ব, যখন কাজটিতে একাধিক লোক জড়িত থাকবে। এমনিভাবে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে দায়িত্বের ভাগাভাগি হবে।

তবে নিয়ম হলো কোন ব্যক্তি অন্যের কাজের দায় দায়িত্ব বহন করবেনা।

সামাজিক নিয়মকানুনের সাথে আখলাকি নিয়মকানুনের সংযোজনে আভ্যন্তরীন চেতনার উন্নতিঃ মানুষ তার আভ্যন্তরীন জগত তৈরি করে, এ জগতে তার আখলাকি নিয়মানুবর্তীতার জন্য চেতনার সৃষ্টি হয়। ইসলাম সব ক্ষেত্রে নিয়্যাতের উপর গুরুত্ব দিয়ে সে চেতনাকে উন্নত করার ব্যবস্থা করেছে। নিয়্যাত হলো,মানুষের কাজের জন্য তার নির্ধারিত আভ্যন্তরীন ইচ্ছা শক্তির উপস্থিতি। তবে ইসলাম জানে, মানুষ পরিপূর্ণ নয় এবং সে ভুলের উর্ধে নয়, সে অনেক নাজুক পরিস্থিতির স্বীকার হতে পারে ও তাতে প্রভাবিত হতে পারে। এজন্যই ইসলাম মানুষকে শুধু আভ্যন্তরীন আত্মার নিয়ন্ত্রনের উপর ছেড়ে দেয়নি, বরং ইহকালিন ও পরকালিন নানা প্রতিদান ও শাস্তির অঙ্গিকার করে তাকে আখলাকি মূলনীতির উপর থাকতে সহযোগীতা করেছে।

রাজিবঃ আসলেই এমন নিয়ম-কানুন ভাবনা ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য।

ইসলামি রাষ্ট্র... মানবতার জন্য অত্যাবশ্যকীয়



ইসলামি রাষ্ট্র... মানবতার জন্য অত্যাবশ্যকীয়

তিন বন্ধু সাক্ষাৎ করতে এলে মাইকেল ও রাজিব রাশেদের কাছে এক ধরনের আওয়াজ শুনতে পেল। তারা জিজ্ঞেস করলে রাশেদ বলল ইহা প্রচারিত সংবাদের শব্দ, সে সংবাদ শেষ পর্যন্ত শুনতে তাদের কাছে কয়েক মিনিট সময় চাইল। একটু পরে রাশেদ বলতে শুরু করলঃ

দুঃখিত, তোমরা হয়ত ইদানিং সংবাদ শোনার গুরুত্ব বুঝতেছ, বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে। বর্তমানে আমাদের দেশে কি হচ্ছে তা কি তোমরা খবর রাখ?

রাজিবঃ হ্যাঁ, ইহা খুবই উত্তেজনাময় খবর। একের পর এক দ্রুত অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে।

মাইকেলঃ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি তা হচ্ছে, ইসলামপন্থীদের উত্থান এবং রাষ্ট্র ব্যাবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী রাষ্ট্র বানাতে তাদের প্রচেষ্টা, বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক।

রাশেদঃ এতে উদ্বেগের কারন কি?

মাইকেলঃ মানুষ দ্বীনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে করে দেখেছে,এর ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এতে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। দ্বীনি রাষ্ট্রের যুগ শেষ, মধ্য যুগ থেকে এর সময় শেষ হয়ে গেছে।

রাশেদঃ কিন্তু তুমি দ্বীনি রাষ্ট্র দ্বারা কি উদ্দেশ্য নিয়েছে?

মাইকেলঃ ইহা এমন রাষ্ট্র যা পরিচালনা করবে ধর্মীয় ব্যক্তিগণ, যারা মনে করেন যে, তারা খোদার পক্ষ হতে সব কথা বলেন। দ্বীনি রাষ্ট্রের সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো ইহা সব অধিকার ও বাস্তবতা আল্লাহর নামে বাজেয়াপ্ত করে। কেননা তারা মনে করেন যে, তারা আল্লাহর পক্ষ হতে কথা বলেন। ফলে নিজেদেরকে ভুলের উর্ধে মনে করেন, এর ফলে যারা তাদের বিরোধিতা করে তাদেরকে আল্লাহর বিরোধিতার শামিল মনে করেন। এতে করে তাদের কাজের কোন হিসেব নেয়া যায়না এবং তাদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা যায়না।

রাশেদঃ দুঃখজনক ভাবে বলতে হয় এখানে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে তোমাদের সাংস্কৃতিগতভাবে একটা বিভ্রাট আছে। তুমি দ্বীনি রাষ্ট্রের যে ধরন উল্লেখ করেছে সে ধরনের ব্যবস্থাপনা আমিও অস্বীকার করি। একে বলে থিওক্রেটিক। কিন্তু থিওক্রেটিক এমন নিয়ম যাতে শুধুমাত্র নীতিমালা নয় বরং সব ধরনের শক্তি ও বাস্তবায়ন ও দ্বীন থেকে উৎসারিত হয়। ইউরোপের লোকজন গীর্যার লোকদের দ্বারা মধ্যযুগে এ ধরনের শাসনের দুর্ভোগ পোহায়েছে। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা স্বীকার করেনা। ইসলামে ধর্মীয় গুরু দ্বারা শাসন ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই। তবে সেখানে দ্বীনের নিয়ম কানুন দ্বারা মানুষের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা আছে। যে মানুষ ভুল করবে, শুদ্ধ করবে। তার হিসেব আছে, সমালোচনা করা যাবে, তাকে প্রয়োজনে শাস্তি দেয়া যাবে, যদি সে কাজে অক্ষম হয় তবে তাকে তার পদমর্যাদা থেকে অপসারণ করা হবে। এখানে মূল পার্থক্য হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা হবে ইসলামের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তবে তা বাস্তবায়ন করবে মানুষ, যে মহাপবিত্র হবেনা এবং ভুলের উর্ধে হবেনা। ইসলামে এমন কোন শাসক নেই যে ধারনা করে যে, খোদার পক্ষ হত সরাসরি তার উপর ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে; বরং জাতিকে তার উপর শাসনক্ষমতা ন্যাস্ত করতে হবে।

এছাড়া মুসলিম দেশে ইসলামী রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা ছিল, উন্নতি ও অগ্রগতিতে ভরা সফল অভিজ্ঞতাইহা ইউরোপের দ্বীনি রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতার বিপরীত ছিল।

রাজিবঃ ইসলামি রাষ্ট্র ও দ্বীনি রাষ্ট্রের মাঝে পার্থক্য বুঝলাম, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্মহীন রাষ্ট্রের মাঝে পার্থক্য কি কি?

রাশেদঃ অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমি পার্থক্যের মৌলিক ভিত্তি উল্লেখ করব। মহাবিশ্ব , জীবন ও মানুষের সম্পর্কে ইসলাম ও ধর্মহীনতার ধারনার পার্থক্যের মাঝে এ দু'ধরনের রাষ্ট্রের পার্থক্যের মূল নিহিত । ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মকানুনগুলো দ্বীন ও জীবনের সাথে মিশে আছে, এ শাসন ব্যবস্থা মুসলিমের জীবনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। সেখানে ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্র পরস্পরে পরিপূরকের কাজ করে করে থাকে।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বুঝতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে আল্লাহর এ আধিপত্যে মানুষের মূল অবস্থান কি? যখন আমরা স্বীকার করব যে, আল্লাহ তায়া'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে স্বভাবতই আমাদের উচিত হবে আমাদের সব কাজে তাকে সন্তুষ্ট করা। যখন আমরা স্বীকার করব যে, এ আসমান জমিনের একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়া'লা, তখন স্বভাবতই আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এ মালিকানায় কোন আইন থাকতে পারেনা। তিনিই একমাত্র আমাদেরকে রিজিক দান করেন, অতএব তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবেনা। যখন আমরা স্বীকার করব যে, আল্লাহ তায়া'লাই একমাত্র আমাদের ও এ মহাবিশ্বের আইনদাতা, তাহলে তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া কোন উপায় নেই।

মাইকেলঃ কিন্তু, এসব আইনের পুরাবৃত্তির কি প্রয়োজন যার ব্যাপারে অনেক ভয়ভীতি ও কথা রয়েছে ? মানুষতো নিজেই তো জানে কিভাবে সে জীবন যাপন করবে, কিসে তার সুখ-শান্তি অর্জিত হবে, তার জীবনের জন্য কি ধরনের আইন প্রযোজ্য, এরপর সে এগুলো নিজের উপর বাস্তবায়ন করবে এবং আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

রাশেদঃ আসলে ব্যাপারটি হলোঃ মানুষ কি তার পরিচালনার জন্য আইন প্রণেতা বা আইনের উৎস হতে পারে? আমরা জানি কোন যন্ত্র যদি অজ্ঞ লোক পরিচালনা করে তাহলে সে উহা নষ্ট করে ফেলবে। যেমনঃ যে লোক গাড়ি চালাতে পারেনা সে যদি গাড়ি চালায় তাহলে আমরা

নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তার এ বোকামীর কি ফলাফল দাঁড়াবে। একটু ভেবে দেখ, একটি ছোট যন্ত্র পরিচালনায় অনভিজ্ঞ লোকের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে মানুষের ব্যাপারে কি হতে পারে? যে মানুষ অনেক জটিল যন্ত্রাংশ দ্বারা সৃষ্টি, যার জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রয়েছে অসংখ্য সমস্যাবলী, যার অগনিত সমস্যাবলী হিসেব করা যাবেনা। তাহলে কিভাবে মানুষ দ্বারা মানুষের পরিচালনা সম্ভব যে মানুষ তার নিজের সম্পর্কে পূর্ণ ধারনা রাখেনা।

অন্য ব্যাপার হলোঃ যে মানুষ মানবজীবনের নিয়মনীতি নির্ধারন করবে তার দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান না হলে মানুষের মাঝে ন্যায়নীতি ও সমতা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যার কোন মানবিক স্বার্থ থাকবেনা একমাত্র সেই পারে মানুষের মাঝে সমতা বজায় রাখতে। যে ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, জাতি ইত্যাদির ব্যাপারে আকৃষ্ট হবেনা... তিনিই একমাত্র পারেন সমতা বিধান করতে। জমিনে এ পদ্ধতি ছাড়া ন্যায় বিচার সম্ভব নয়।

মানুষ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থ থেকে মুক্ত নয়। মানুষের এ দুর্বলতা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। যদি আমরা রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা যেমন ফাদার, বিভিন্ন তরীকার ভুয়া মাশায়েখ ও ধন সম্পদশালী ব্যক্তিদের দিকে তাকাই তাহলে দেখব তারা নিজেদের জন্য কিছু বিশেষ আইন কানুন করে রেখেছে, ফলে তারা দুনিয়াতে যে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তা সাধারন মানুষ ভোগ করতে পারেনা। তারা নিজেদের জন্য অনেক আইন প্রণয়ন করে, আর এগুলো এমনভাবে প্রচার করেন যে, জনগন যাতে মনে করেন এগুলো এভাবেই হওয়া স্বাভাবিক। তাহলে একটি ন্যায়নীতি ও সমান অধিকারের রাষ্ট্র কি এ ধরনের লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

আমরা যদি বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকাই যেগুলো নিজেদের শক্তিবলে অনেক জাতিকে পরাভূত করে রেখেছে তারা কোন আইন বা নিয়মের ভিত্তিতে তাদের জাতির মাঝে শক্তি প্রয়োগ করে প্রভাব ফেলে? তাহলে এমন লোকদের দ্বারা কি আইন প্রণয়ন করে ন্যায় বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?!

রাজিবঃ কিন্তু জনাব রাশেদ, তাহলে অমুসলিম সংখ্যালঘুরা কি করবে? আমরা যেমন ভারতে শত শত বিভিন্ন ধর্মের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করি। তোমরা যখন ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করবে তখন তো তাদেরকে জোর পূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে।

রাশেদঃ এ বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে খুব ভাল করেছ। এখানে আমি তিনটি কথা উল্লেখ করবঃ

প্রথমতঃ আমি আশ্চর্যান্বিত হই যখন তোমরা আপত্তি কর অমুসলিম কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে অথচ তাদের ধর্ম পৃথিবীতে তাদের ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেনি, আর তোমরা ধর্মহীন রাষ্ট্রে মুসলমানদেরকে তাদের নীতি ও বিশ্বাস বিরোধী নিয়মনীতি পালনে বাধ্য কর অথচ তাদের ধর্ম তা পালনে তাদেরকে অনুমতি দেয়না!

দ্বিতীয়তঃ ইসলামকে মূল ভিত্তি করে কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মানে অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। এসব অযথা আপত্তি এসেছে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থা থেকে যাতে বিশ্বাস, স্পর্শানুভূতি ও আবেগকে একান্তই ব্যক্তিগত বলা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম এগুলোকে এভাবে সীমিত রাখেনি; মুসলমানের জন্য ইসলাম হলো একটি আচরণবিধি ও শরিয়া, অর্থাৎ একটা পদ্ধতি ও আইন কানুন। সভ্যতার লক্ষ্যবস্তু। আর অমুসলিম ইসলামের বিশ্বাস ও তার নিদর্শানাবলী না মেনেও তার আইন-কানুনগুলোকে সভ্যতার লক্ষ্যবস্তু মনে করে মেনে চলতে পারে।এর প্রকৃত উদাহরণ হলো যেমন তোমরা বল, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যার যার উপর ছেড়ে দিয়ে মুক্তিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ ইসলামী মূল্যবোধে সমাজ প্রতিষ্ঠা করলে সংখ্যালঘুদের অধিকারকে লজ্ঘন করা হবে, বা তাদের ব্যক্তিগত ধর্মে আঘাত হানা হবে ব্যাপারটি এমন নয়। বরং ইসলাম সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ করে, তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিজেদের ধর্ম অনুযায়ী বিচার করতে নিষেধ করেনা।

মাইকেলঃ তবে আমরা এখন আর সে যুগে নেই যে যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর অভিজ্ঞতা ভোগ করা হয়েছিল। যদিও সে সময় এটা সফলতা পেয়েছিল কিন্তু বর্তমানে এটি প্রতিষ্ঠা করা মানে পশ্চাতে ফিরে যাওয়া। আধুনিক জীবন যাত্রার যুগে তোমাদের এ সব নিয়ম নীতি অসার ও গ্রহণযোগ্য নয়।

যেমন তোমরা এখনো সুদকে হারাম মনে কর, অথচ অর্থনীতির দৃষ্টিতে ইহা খুবই জরুরী, কোন আধুনিক রাষ্ট্র সুদ ব্যবস্থা ছাড়া চলতে পারবেনা।

রাশেদঃ বন্ধু তোমার এসব কথা আসলে বাস্তবসম্মত নয়। তোমরা একটা নির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতিকে একটা রাষ্ট্রের রূপরেখা ধরে নিয়েছ যা বাস্তবের সাথে কোন মিল নেই। আর অর্থনীতিতে সুদের খারাপ দিকগুলোও অস্বীকার করা যায়না।

ইসলাম সুদকে হারাম করেছে এটা ঠিক, তবে সুদ যে অর্থনীতিতে একটা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এটা ঠিক নয়।

পুঁজিবাদীরা ও একাধিপত্যবাদীরা সুদের কথা বলে, তারা বলেন এটা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। ইহা ছাড়া কোন উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে ইহা শুধুমাত্র তাদের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। অন্যদিকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা সুদ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করেন, তারা মনে করেন, এ ব্যবস্থার ফলে ক্রমাগতভাবে মানুষ অর্থনৈতিক মন্দাতে পতিত হবে। কতিপয় লোকের হাতে সম্পদ গচ্ছিত থাকায় এতে অনেক সামাজিক মারাত্মক বিপর্যয় ঘটিত হবে। এতে ধীরে ধীরে অধিকাংশ লোক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। আমরা কিছুদিন আগের ভূমি ঋণ সমস্যার দিকে তাকালেই এটা বুঝতে পারব, এর ফলে বিশ্বব্যাপী কি ধরনের অর্থনৈতিক সংকট ও বিপর্যয় দেখা

দিয়েছে। এর আগে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তন্মধ্যে গত শতাব্দির ত্রিশ দশকের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা অন্যতম। এতে আমরা বিপর্যয়ের ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছি।

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থা বিকাশের হাজার বছর আগে ইসলাম সুদ ও মজুত করণ হারাম করেছে।- আর এ দু'টোই হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল । হে দোস্ত! ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়াতেরই প্রয়োজনীয় ব্যাপার নয়, বরং ইহা সমগ্র মানবজাতির জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

অমরত্বের যাত্রা



অমরত্বের যাত্রা

মাইকেল আলাপ কক্ষে প্রবেশ করার পর পরই তার দুই বন্ধুকে অভিবাদন জানাল। রাজিব এর উত্তর দিল। পক্ষান্তরে রাশেদ এই বলে জবাব দিলঃ

তোমরা আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর, তোমাদের জন্য শক্ত প্রমান তৈরি করছি,

তোমরা কি লিভার্নো টীমের খেলোয়াড় মরিসিনিকে ইটালি লীগে পেস্কার ক্লাবের ম্যাচে পড়ে যেতে দেখেছ? স্টেডিয়ামের মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর হৃদযন্ত্র থেমে গেলে তিনি মারা যান। দর্শকরা হতচকিত হয়ে দেখছিলেন তার মুমূর্ষ অবস্থা, মুহুর্ত আগের অগ্নিঝরা উদ্যম মানুষটির হৃদযন্ত্র থেমে গেল।

মাইকেলঃ তবে এ ঘটনা থেকেও বেশি আশচর্যজনক হল, এফ এ কাপে টটেনহ্যামের সাথে মচে বল্টন টীমের খেলোয়াড় মুয়াম্বার পড়ে যাওয়া। হৃদযন্ত্র থেমে যাওয়ায় খেলোয়াড়টি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। সবাই নিশ্চিত হলো যে, সে মারা গিয়েছে; কিন্তু এক বিরল অবস্থায় তার হৃদযন্ত্র ৭৮ মিনিট বন্ধ থাকার পর পুনঃ কাজ করতে লাগল । ডাক্তারগন এটাকে ৭৮ মিনিটের মৃত্যু বলে মনে করেছেন। তাই টীমের ডাক্তার টবেন আশ্চর্য হয়ে বিবৃতি দিলেন, “ব্যপারটা অবিশ্বাস্য আমরা ধারনা করতে পারছিলামনা যে মুয়াম্বা এ ভাবে সুস্থ হয়ে যাবে”, মুয়াম্বা মরে গিয়েও আবার জীবনে ফিরে এল!

রাশেদঃ মৃত্যু একমাত্র সত্য, যা সব মানুষ স্বীকার করে ও মানে, কিন্তু, মৃত্যুর পরে কি? মৃত্যুই কি শেষ? নাকি এর পর আরো কিছুর সুচনা আছে পরকালে, যেমন অনেক মানুষ বিশ্বাস করে?

রাজীবঃ পরকালের বিশ্বাস এমন একটি মৌল বিশ্বাস,যা মানুষ তার সৃষ্টি ও পৃথিবীতে বসবাসের সুচনা থেকে ধারন করে চলছে। অনেক প্রত্নতত্ব ও ঐতিহাসিক সাক্ষী প্রমান করে যে, এ বিশ্বাস বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার মাঝে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন মিশরিয় , মায়া উপজাতি , রোমান ও মেসোপটেমিয়রাও এ বিশ্বাসের কথা জানত। আসমানি কোন ধর্মতো এ বিশ্বাস মুক্ত ছিলনা উপরন্তু ব্রহ্ম, বৌদ্ধ কনফুশিয়া, জরাদস্তিয়া ও সাবিয়ার মত মানব রচিত ধর্মগুলোতেও এ বিশ্বাস ছিল।

রাশেদঃ তোমার কথা ঠিক, এ বিশ্বাসের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছেন ইসলামের রাসুল (সঃ), যেভাবে সব নবী রাসুল তা উপস্থাপন করেছন মানুষের সামনে। এ বিশ্বাসের প্রতি ঈমান আনা সর্ব যুগে ইসলামের অন্যতম শর্ত। কারন এ বিশ্বাস ছাড়া আল্লাহ এবং তার কিতাব সমূহ ও রাসুল গণের প্রতি ঈমান আনার কোন অর্থ নেই।

মাইকেলঃ কিন্তু এ বিশ্বাসের প্রভাব তো মানুষের জীবনে সমান নয়। যেমন কম মানুষই তার চেতনা ও আচরণে তা উপলব্ধি করে।

রাশেদঃ এটা ঠিক, কারণ সবাই তা তাত্বিক ভাবে মানে কিন্তু অল্প মানুষই তা বাস্তবে রূপায়িত করে। এর প্রমান হল, আমরা ধরে নিলাম যে, যুদ্ধের সময় আকাশ আক্রমণের সাইরেন বেজে উঠল, তখন স্বাভাবিক ও সম্ভাব্য হল সড়কগুলো পথচারী ও যান চলাচল থেকে খালি হয়ে যাওয়া। যে এর বিপরীত করবে তাকে পাগল ও নির্বোধ মনে করা হবে। দুনিয়ার একটি ছোট্ট ব্যপারে যদি এমন হয় তাহলে এর চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যপারে আমাদের কেমন হওয়া উচিত? এমন ব্যপার যা মানুষ বিশ্বাস করে যে তা অবশ্যই ঘটবে, এর ব্যাপারে সতর্ক করেছেন স্বয়ং এ জগতের সৃষ্টিকর্তা। সব রাসুলের ভাষায় এর ঘোষনা দিয়েছেন। যৌক্তিক হল আল্লার এ সাইরেনের প্রতি মানুষের সাড়া আরো অধিক বড় আকারে ও মজবুতভাবে হওয়া।

মাইকেলঃ আমি মনে করি, এর কারন হল, যে বিপদের ব্যপারে সতর্ক সাইরেন বাজানো হয়, মানুষ তা দেখে ও শোনে। এমন কি তারা বাস্তবে এর মুখোমুখী না হলেও আরো বিভিন্ন অবস্থায় অথবা স্থানে তারা তা প্রত্যক্ষ করেছে কখনো এর নানা আলামত স্বচক্ষে দেখে থাকে। পক্ষান্তরে পরকাল ও আমাদের মাঝে মৃত্যু আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ তা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেনা। আর এটাই দুই অবস্থার মাঝে বিশ্বাসের পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

রাশেদঃ তোমার কথা ঠিক, তবে ধরে নেওয়া যাক যে মানুষ যেহেতু তত্ব ও এর নিশ্চয়তা শুধু অনুধাবন শক্তি দিয়েই অর্জন করেনা বরং বিবেক দিয়ে। তাদের কাছে বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণ তারা অন্তর চোখ দিয়ে দেখেনা। সুতরাং তারা যদি ব্যপারটা গভীর দৃষ্টিতে দেখত এবং চিন্তা করত তাহলে অনুধাবন করতে পারত যে, তারা চোখে যা দেখছে তা তাদের দৃষ্টির অগোচরের বিষয় থেকে বেশি নিশ্চিত নয়।

তাছাড়া এমন কিছু বিষয় আছে যা দেখা কিংবা অভিজ্ঞতা অর্জনের অপেক্ষা করা মানুষের জন্য ধংস ডেকে আনে। কারণ সেগুলো শুধু একবারই এসে থাকে। যেমন কেউ কাউকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করল যে, সে একটি উঁচু ইমারতের উপর থেকে নিজেকে নিক্ষেপ করতে পারবে কোন আঘাত ছাড়া, আর অপরজন বলল, তাহলে দেখা যাক। তখন তা হবে প্রথম ও শেষ অভিজ্ঞতা এবং এ ব্যক্তির অবসান। ফলে এ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ দাবীর সত্যতা যাচাই করা চলবেনা। বরং চিরাচরিত নিয়ম ও সমতুল্য অন্যান্য বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে সম্ভাব্য ফলাফলে পৌঁছতে হবে।

রাজীবঃ তাই আমাদেরকে এ আস্থা অর্জনের জন্য এ বিশ্বাস প্রমান করতে হবে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিয়ে।

রাশেদঃ এতে কোন আপত্তি নাই। তবে আমি বলতে চাই, এর চেয়ে বড় প্রমান হল, এ সংবাদ দাতার প্রতি আস্থা। আর তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা, যিনি সংবাদ দিয়েছেন তার রাসুলদের মারফতে। এটাই হল তার প্রতি ঈমানের দাবি।কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাদের চেয়ে বেশি জানেন এবং কি আমাদের জন্য উপকারী ও উপযুক্ত হবে এ ব্যপারে বেশি যত্নশীল।

আর তুমি যে বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রমান চেয়েছ তা অনেক। নীচে কিছু উল্লেখ করছি।

প্রথম প্রমানঃ সুচনার মাধ্যমে পুনরুত্থান সাব্যস্ত করা। এর মানে হল, আমরা যদি মানি যে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তাহলে যিনি আমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুর পর তিনি আবার আমাদেরকে জীবীত করতে সক্ষম। বরং পুনর্জীবনের সম্ভাবনা যৌক্তিক ভাবে প্রথম জীবনের চেয়ে বেশি মজবুত।

দ্বিতীয় যুক্তিঃ পদার্থ ও উপকরণ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় এবং এক স্বত্বা থেকে অন্য স্বত্বায় রূপান্তরিত হওয়া। আল কোরআন এর এমনসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে, সবাই যার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম। যেমন, সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি নির্গত করা। সুতরাং যিনি কোন পদার্থকে তার বিপরীত পদার্থ থেকে তৈরি করেন, সৃষ্টির সব পদার্থ যার অনুগত, তাঁর পক্ষে পুরনো হাড়কে পুনরুজ্জীবিত করা মোটেও কঠিন নয়।

তৃতীয় যুক্তিঃ সৃষ্ট জগতের বিবর্তন। মৃত্যু, তারপর জীবন অতপর আবার মৃত্যু, তারপর জীবন। যেমন, শুকনো জমাট দানা থেকে গজায় তাজা সবুজ চারা, ফুল ফুটে, ফল দেয়। এর পর এ তাজা চারা জমাট দানা ফলায়। আর জীবন্ত বর্ধনশীল পাখী থেকে আসে জড় ডিম, এর পর এ ডিম থেকে আবার হয় জীবন্ত সচল পাখী। সুতরাং আমরা যা জড় ও মৃত মনে করি তাতেও প্রান লুকিয়ে থাকে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীও ঠিক তেমন।

চতুর্থ যুক্তিঃ মানুষ, প্রানী ও গাছের প্রানের মাঝে লক্ষণীয় পুনরুত্থান । যেমন মানুষের স্বাভাবিক দেহ গঠিত ২৬০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি কোষে। প্রতি সেকেন্ডে তা বিবর্তিত হয়, দ্রুত সংকোচিত হয়। খাবার এ সংকোচনের ঘাটতি পুরন করে। সুতরাং মানব দেহ বিরামহীনভাবে নিজেই নিজের বিবর্তন ঘটায় প্রবাহিত নদীর মত। এ ভাবে আমাদের দেহ একটি চলমান বিবর্তনের অধীন। এক পর্যায়ে এমন একটি সময় আসে যখন দেহে পুরাতন কোন কোষ থাকেনা। এ বিবর্তনতটি কৈশোর ও যৌবনে দ্রুত ঘটে থাকে, আর প্রৌঢ়ত্বে ঘটে ধীরে। গড়ে তা দশ বছরে এক বার ঘটে।

এ থেকে বুঝতে পারি যে, বাহ্যিক জড় দেহের বিবর্তন চলমান। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ভাবে মানুষ অপরবর্তিত। তার জ্ঞান, অভ্যাস, স্মৃতি শক্তি, আশা ও চিন্তা আগের মতই থাকে। যদি দেহ বিনাশের কারণে মানুষ বিনাশ হয়ে যেত তাহলে কোষগুলো বিনাশ হওয়া এবং সেগুলোর পূর্ণ বিবর্তনের কারণে অবশ্যই সে প্রভাবিত হত । এর মাধ্যমে পরিষ্কার হল যে, মানুষের জীবন এক জিনিস, আর দেহ আরেক জিনিস। দেহের কোষগুলো বিরামহীনভাবে বিনাশ হওয়ার মাধ্যমে দেহের বিবর্তন সত্বেও জীবন থেকে যায়।।

পঞ্চম যুক্তিঃ আধুনিক বিজ্ঞানে ইঙ্গিত মেলে যে জগতের উপকরণাদিমানুষের সব কর্ম পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে। আখেরাতের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল, দুনিয়ার ভাল মন্দ সব কাজের প্রতিদান দেওয়া। তা হবে সংরক্ষিত আমল মোতাবেক। আর আমলের মধ্যে শামিল হল নিয়ত, কথা ও কাজ। বিজ্ঞান প্রমান করে যে, উল্লেখিত তিনটি বিষয় নিঃশেষ হয়ে যায়না। বরং শেষ হওয়ার পরও সেগুলো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

যে সব চিন্তা ও ইচ্ছা আমাদের মনে উদয় হয়ে আমরা তা ভুলে যাই, ঘুমের ঘোরে আমরা ওসব দেখি, কিংবা হিস্ট্রেরিয়ায় আক্রান্ত হলে অথবা উম্মাদ অবস্থায় অজান্তেই আমরা ওসব মুখে আওড়াতে থাকি। তা প্রমান করে যে, আমরা আকল বলে যা জানি ও অনুভব করি সেটাই শুধু আকল নয়। সেখানে আরো আছে এমন কিছু দিক যা আমরা অনুভব করিনা। তা হল, একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বত্তা। আর বিজ্ঞান প্রমান করেছে যে, তা আমরা মুছে ফেলতে পারিনা।

পক্ষান্তরে আধুনিক বিজ্ঞান যে বলছে, আমরা যে শব্দ শুনি তা হল বাতাসে নিহিত তরঙ্গপুঞ্জ। অকাট্য ভাবে প্রমানিত হয়েছে যে, এ তরঙ্গপুঞ্জ প্রথমবার সৃষ্টি হওয়ার পর ইথারে থেকে যায়। কয়েক শতাব্দী পরেও তা পুনরায় শোনা সম্ভব। তবে বিজ্ঞানীরা এখনো তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেনি। তা প্রমান করে যে, মানুষের সকল কথাই সংরক্ষিত থাকে।

আর আমল বিস্ময়কর ভাবে পরকাল সংঘটনের সম্ভাবনা প্রমান করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, আলো ও আঁধারে আমাদের সব সঞ্চালন ও কাজ ছবি আকারে মহাশূন্যে বিদ্যমান আছে। যে কোন সময় এসব ছবি সংকলিত করা সম্ভব। কারণ দেহ জড় হোক কিম্বা সচল হোক অবিরাম তা থেকে তাপ নির্গত হতে থাকে। তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেহের আকৃতি ও মাত্রা প্রতিবিম্বিত করে। সদ্য কিছু সুক্ষ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে দেহ থেকে নির্গত তাপের স্পন্দন চিত্রায়িত করার। কিন্তু এ যন্ত্রগুলো তাপ স্পন্দন ঘটে যাওয়ার অল্প সময়ের মাঝেই শুধু চিত্রায়িত করতে পারে।

মাইকেলঃ আমরা পরকাল সংঘটনের আবশ্যকতা মানা ও ইসলামে এর গুরুত্ব বুঝার পর প্রশ্ন হল, ইসলামে এ বিশ্বাসের ধরণ কি?

রাশেদঃ ইসলামে এ আকীদার ব্যাখ্যা অন্য অধিকাংশ ধর্মে যা এসেছে তা থেকে অনেক ভিন্ন। তবে সাধারণভাবে এ আকীদা সংক্ষেপে নিন্মরূপঃ

১- আল্লাহ তায়ালা এক দিন এ বিশ্ব এবং এতে যত সৃষ্টি আছে সব মুছে দিবেন, একেই কেয়ামত দিবস বলে।

২- এর পর তিনি তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে তার সামনে জমা করবেন। আর তাই হল হাশর বা পুনরুত্থান।

৩- এর পর মানুষ দুনিয়ার জীবনে ভাল মন্দ যা করেছে এর সব আল্লাহর আদালতে পেশ করা হবে। এতে কোন বেশ কম হবেনা।

৪- আল্লাহ সবার ভাল ও মন্দ আমল পরিমাপ করবেন। তখন যার ভাল আমলের পাল্লা ভারি হবে তাকে ক্ষমা করবেন। আর যার মন্দ আমলের পাল্লা ভিরি হবে তাকে শাস্তি দিবেন।

৫- যাদেরকে ক্ষমা করবেন তারা জান্নাতে যাবে আর যাদেরকে শাস্তি দিবেন তারা জাহান্নামে যাবে।

রাজীবঃ আসলে বিষয়টা চরম ঝুঁকির।

ইসলাম ও সন্ত্রাসঃ



ইসলাম ও সন্ত্রাসঃ

আলোচনা কক্ষে আলোচনা শুরু করার নির্ধারিত সময়ে মাইকেল, রাশেদ ও রাজীব মিলিত হল। মাইকেল দুই বন্ধুকে অভিবাদন জানিয়ে কথা শুরু করল।

মাইকেলঃ আমি মনে করি আগের সাক্ষাৎ গুলোতে রাশেদের আলোচনা তার ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। আরও খোলাসা করা দরকার। জনাব রাশেদ তার ধর্মের উজ্জল দিক গুলো উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আর অন্ধকার দিক গুলো পাশ কাটিয়ে গেছেন। আমরা স্বচক্ষে দেখছি, যে সন্ত্রাস আজ সারা বিশ্বকে আঘাত করছে তা হল বিশেষত ইসলামী সন্ত্রাস।

রাজিবঃ আমি তোমার সাথে আংশিক ভাবে এক মত। কিন্তু এ সন্ত্রাস সম্ভবত কোন ধর্ম বা জাতীর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, এমনটিই লক্ষ্য করেছি আমার দেশ ভারতে। যেখানে বিভিন্ন কারণে সহিংস ঘটনা ঘটে। সুতরাং সন্ত্রাসের এসব ঘটনার উৎস কি হতে পারে যে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি?

মাইকেলঃ এটাই আমি আলোচনায় তুলতে চাচ্ছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, সন্ত্রাস ইসলামের স্বত্বার মাঝে নিহিত। আর এ কথা তো জানা যে, ইসলাম তরবারির মাধ্যমে ছড়িয়েছে। জনাব রাশেদ আপনি কি এটা অস্বীকার করবেন?

রাশেদঃ অবশ্যই আমি তা অস্বীকার করব, এবং বাস্তবতাও তা অস্বীকার করবে।

মাইকেলঃ কোন বাস্তবতা আপনি বোঝাচ্ছেন?

রাশেদঃ ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং বাস্তব ঘটনাবলী। তবে প্রথমে আমি বলতে চাই, আমাদের উচিৎ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও স্বার্থবাজরা যে সব তথ্য প্রচার করে থাকে তা থেকে আমাদের মন-মস্তিষ্ককে মুক্ত করা।

রাজীবঃ আমি মনে করি, আমরা একটি স্বাধীন সমাজে বাস করি। এখানে আমাদের চিন্তাকে বিরূপ করার জন্য কোন ধরনের মুনশিয়ানা ও চাপ সৃষ্টি করা হয়না।

রাশেদঃ এটা ঠিক যে, আমাদের উপর কোন চাপ প্রয়োগ করা হয়না, এবং আমরা বিবেচনার ক্ষেত্রে স্বাধীন।তবে, অবশেষে আমরা সেটাই গ্রহণ করি যা প্রচার নিয়ন্ত্রক, রাজনীতিক ও স্বার্থবাজরা আমাদের জন্য উপস্থাপন করে। পশ্চিমা রাজনীতিক ও চিন্তাবিদরা ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েই চলছে। আবার তারা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দিচ্ছে এবং তারা মনে করছে যে, তথাকথিত উদার ও মুক্তমনা পশ্চিমা সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য তাদের এসব অভিযান।

মাইকেলঃ আমি ওয়াদা করছি, আমরা আগের মতই থাকব। সত্যকেই আমরা সমর্থন করব, তা যেখান থেকেই আসুক এবং যেমনই হোক।

রাশেদঃ ইসলাম যদি স্বভাবগতভাবে আক্রমণাত্মক ধর্ম হয়, এং তলোয়ারের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে, আর পশ্চিমারা নিজেদেরকে যে খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী মনে করে তা যদি সহনশীলতার ধর্ম হয়, তাহলে বন্ধু তুমি কি জান? 'তরবারি' শব্দটি কোরানে কতবার উল্লেখ করা হয়েছে আর বাইবেলে কতবার কতবার উল্লেখ করা হয়েছে?

মাইকেলঃ সঠিক বলতে পারছিনা, তবে অবশ্যই বাইবেলে যতবার উল্লেখ করা হয়েছে কোরানে এর চেয়ে বেশী উল্লেখ করা হয়েছে।

রাশেদঃ তাহলে শুনুন, আল কোরানে ১১৪টি সুরা আছে। এ সবে আছে ৬২৩৬টি আয়াত। শব্দ আছে ৭৭৪৩৯টি। 'তরবারি' বা এর কোন সমার্থক শব্দ আল কোরানে এক বারও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ আরবি ভাষায়তরবারির ৬০টির বেশী সমার্থক শব্দ আছে। পক্ষান্তরে বাইবেলে 'তরবারি' শব্দটি ২০০বারের ও বেশী উল্লেখিত হয়েছে।

মাইকেলঃ উঃ, সত্যিই বিস্ময়কর! আপনি কি ধর্মীয় বাস্তবতা বলতে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন?

রাশেদঃ বরং এটা শুধু অনেকগুলো বাস্তবতার একটি। তবে আমি এটির ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করবনা যাতে অন্যগুলো নিয়ে আলোচনার সুযোগ হয়।

রাজীবঃ এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা কি?

রাশেদঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেবাস্তবতা , তার কিছুটা তুমিও জান, বন্ধু রাজীব! সেটা হলো, বিশ্বের সবচেয়ে ঘন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল গুলো, যার শীর্ষে রয়েছে, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চল সমূহ, এ সব অঞ্চলে মুসলিম বাহিনী মোটেও প্রবেশ করেনি। তেমনিভাবে আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চলে।

এ ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে যোগ হবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য যে, ইসলামের ইতিহাসে ইসলাম গ্রহণে চাপ সৃষ্টির কোন বিশ্বস্ত তথ্য তাদের কাছে প্রমানিত হয়নি।

মাইকেলঃ আপনার উল্লেখিত কিছু ঐতিহাসিকের বক্তব্যের বিপরীতে আমি কিছু ঐতিহাসিকের বক্তব্য উত্থাপন করতে পারব, যারা এর ব্যতিক্রম বলছেন। তাহলে কোনটা সঠিক?

রাশেদঃ অনেক প্রমান আছে যা আমার কথাকে সমর্থন করবে।

একঃ যে সব অঞ্চল মুসলিম বাহিনী সামরিকভাবে বিজয় করেছে এর অনেক এলাকার মানুষ মুসলিম শাসনের ছায়ায় তাদের পুরাতন ধর্ম পালন করত। এখনো অনেকে তাদের সে সব ধর্ম পালন করে আসছে। মিশর, ফিলিস্তীন, লেবানন ,গ্রীস ও ভারতে এমনই হয়েছে। এর বিপরীত চিত্র দেখতে পাই যখন খৃষ্টান বাহিনী স্পেন, জেরুজালেম ও ফিলিপাইন দখল করেছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ভাগ্যে তখন জুটেছিল, গনহত্যা কিংবা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণে চাপ প্রয়োগ কিংবা দেশ থেকে বিতাড়ন।

দুইঃ মুসলিমদের বিজিত দেশগুলো থেকে যখন মুসলিম বাহিনীর ক্ষমতা শেষ হয়ে গেল। মুসলিম কিংবা অন্য কারোর কোন ধরণের চাপ না থাকা সত্ত্বেও সেসব মুসলিম জাতীদেরকে ইসলাম থেকে সরে যেতে আমরা দেখিনা। বরং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিমদের মত অনেক মুসলিম জাতীকে আমরা দেখিছি যে তারা সমাজতন্ত্রের অগ্নি চাপের মুখেও গোপনে ইসলামকে লালন করেছে। তারা অপেক্ষমাণ ছিল যে, কখন এ দাম্ভিক শাসন শেষ হবে, যাতে তারা ইসলামের শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে।

তিনঃ ইতিহাস আমাদেরকে এমন অনেক জাতীর কাহিনী শোনায় যারা মুসলিম দেশে আক্রমন করে তাদের সামরিক শক্তি ধংস করে অনেক ভূখন্ড জবরদখল করেছে। পরবর্তীতে মুসলমানদের সংস্পর্শে থাকার ফলে এরাই ইসলামের ছায়া তলে এসেছে যেমনঃ তাতার ও তুর্কী জাতি।

মাইকেলঃ ঠিক আছে তোমার কথা মেনে নিলাম যে, ইসলাম তলোয়ারের দ্বারা প্রসারিত হয়নি। তবে এবার আমরা ইতিহাস থেকে বর্তমান বাস্তবতায় আসি; তুমি কি আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হবেনা যে, বর্তমান বিশ্বে যে সব সন্ত্রাস হচ্ছে তা বিশেষভাবে ইসলামী সন্ত্রাসী গ্রুপের দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে?!

রাশেদঃ প্রথমেই আমাদেরকে ঠিক করতে হবে সন্ত্রাস কি? এর পর বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখব বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসের রেখাচিত্র কারা তৈরী করছে?

রাজিবঃ বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো বা সংস্থাগুলো এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারনে একমত হতে পারেনি। তবে আমরা এ ব্যাপারে একমত হতে পারি যে, নিরাপরাধ লোকদের মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের ইচ্ছা কে প্রভাবিত করা বা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোন ধরনের ফায়েদা লুফে নেয়া।

রাশেদঃ অবশ্যই সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারন না করা হচ্ছে কোন কোন দেশের পক্ষ হতে ইচ্ছাকৃত, যেন তারা এটাকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে।তবে তোমার সংজ্ঞার সাথে আমি আরেকটু যোগ করব যে, এ ত্রাস সৃষ্টিকারী-ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র যেই হোক না কেন তা সন্ত্রাস বলে গন্য হবে।

মাইকেলঃ তোমার সংযোগে কোন অসুবিধে নেই। এর উপর ভিত্তি করে যখন আমরা বিশ্বময় ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে, ২০০১ সালে আমেরিকার টুইনটাওয়ারে হামলা, মাদ্রিদে ট্রেনে বিস্ফোরণ, ইন্দোনেশিয়ার বালীতে পশ্চিমা টুরিস্টদের উপর বোমা হামলা ও ফিলিস্তিনিদের কর্তৃক ইহুদিদের উপর হামলা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মুসলমানদের দ্বারাই হচ্ছে ।

রাশেদঃ থাম থাম বন্ধু, ফিলিস্তিনিদের দ্বারা যা কিছু হচ্ছে তা হলো সে দখলদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, যার আছে সন্ত্রাসের কালো ইতিহাস। আমরা দেখেছি, কিভাবে একটা পূর্ন জাতির নিজস্ব ভূমি জবরদখল করে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। আর তাদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। যেমনঃ

আল শায়েখ প্রদেশে ৩১/১২/১৯৪৭ সালের গনহত্যা, যাতে প্রায় ৬০০ জন নিরাপরাধ লোক ঘরে বসে প্রাণ হারায়।

ইয়াছিন আশ্রম এর গ্রামে ১০/৪/১৯৮৪ সালের গনহত্যা, যাতে প্রায় অর্ধেক গ্রামবাসীর প্রাণহানী হয়।

১১/৭/১৯৪৮ সালে আল লুদ এর গনহত্যা, যাতে ৪২৬ জন লোক যারা মসজিদে জমা হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করে। ইহুদিরা ঝটিকা হামলা করে তাদেরকে হত্যা করে।

১০/১৯৬৫ সালে কাফর আল কাসেম এর গনহত্যা, যাতে নারী, শিশু মিলে প্রায় ৯৪জন লোকের প্রাণহানী হয়।

১৮/৯/১৯৮২ সালে সবরা ও সাতিলার গনহত্যা, যা লেবাননে সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধাপরাধী শ্যারোনের নেতৃত্বে লেবাননের খৃষ্টান সেনাবাহীনির সহযোগীতায় এ গনহত্যা সংঘটিত হয়। ৭২ ঘণ্টাব্যাপী ৩৫০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনী ও লেবাননী নারী, শিশু ও বৃদ্ধলোক মারা যায়। ইসলামী পরিচয় ছাড়া এ সব লোকদের আর কোন অপরাধ ছিলনা।

২৫/৪/১৯৯৪ সালে আল ইব্রাহীম মসজিদের গণহত্যা, যা একজন ইহুদি সেনা অন্যান্য সেনাসদস্য ও ঔপনিবেশিকদের সহযোগীতায় করেছিল। এতে মসজিদের মধ্যে ২৯জন মুসল্লী এবং মসজিদের বাহিরে ৫০ জন লোক নিহত হয়। ৩৫০ জনেরও অধিক মুসল্লী আহত হয়।

তবে তোমাকে আরো বিস্তারিত তথ্য দিয়ে তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো ব্যাপক করছি, ১৯৯৫ সালে ওকলাহোমায় ফেডারেল ভবনে হামলা, যাতে ১৬৮ জন লোক নিহত ও ৫০০ জনেরও বেশি আহত হয় এবং ৭/২০১১ সালে অসলো ও অটোয়া দ্বীপের হত্যাকান্ড, যাতে ৯২ জনের অধিক নিহত ও ৯০ জনেরও বেশি আহত হয় , এ সব হত্যাকান্ড খৃষ্টান উগ্রপন্থীদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল।

এমনিভাবে আমরা যদি সন্ত্রাসের সাথে কোন ধর্ম বা সভ্যতার সম্পর্ক খুঁজি তবে আধুনিক যুগের এ বাস্তবতাগুলো কে উপেক্ষা করতে পারবনাঃ ঃ

কোন মুসলিম দেশ আজ পর্যন্ত কোন পশ্চিমা রাষ্ট্রের উপর হামলা করেনি, পক্ষান্তরে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আদিকাল ও বর্তমান যুগেও পশ্চিমা দেশগুলোর সর্বদা লক্ষ্যবস্তু মুসলিম দেশ।

আমেরিকার হিন্দু সম্প্রদায় আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীদের হাতে ব্যাপক গণহত্যার শিকার হয়ে তাদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন থেকে কমে ২লক্ষে উপনীত হয়েছে। উপরন্তু তাদের উপর লুটপাট চালানো হয়।

পশ্চিমারা বিশ্বে দুটি ধংসাত্মক যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে, যে দু'টিকে বিশ্ব যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মূলতঃ এ দুটি-বিশেষ করে প্রথমটি- ইউরোপিয়ান যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় বিশ মিলিয়ন মানুষ নিহত হয়েছিল এবং তদ্রুপ সংখ্যক লোক আহত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন লোক নিহত ও ৫৩ মিলিয়ন লোক আহত হয়েছিল। আর তিন মিলিয়ন লোক নিখোঁজ হয়েছিল। এদের অধিকাংশই ছিল উপনিবেশের বাসিন্দা এবং সাধারন নাগরিক। কারণ,

নিরাপরাধ নাগরিকদেরকে হত্যা করে শত্রুর মনোবল দুর্বল করা সেসব যুদ্ধবাজদের অন্যতম প্রসিদ্ধ নীতি ছিল।

এমনিভাবে যদিও আমরা নিরাপরাধ লোকের উপর আক্রমন করা অন্যায়, এব্যাপারে একমত। তবে যেসব কারনগুলো এসব ঘটনাগুলোর সংঘটনকারীদেরকে অনুপ্রানিত করে তা আমরা অস্বীকার করতে পারবনা। তারা মনে করে এসব ঘটনা আমেরিকা ও পশ্চিমাদেরকে মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুতা ও সন্ত্রাস হতে বিরত রাখবে।বিশেষ করে ইরাক অবরোধ ও ইহুদি কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর নির্মম নির্যাতনে সহযোগীতা হতে।

রাজীবঃ তাহলে খোলাসা কথা হল, সন্ত্রাসের কোন ধর্ম নেই, তার নেই কোন সভ্যতা।

রাশেদঃ এর কোন ধর্ম নেই এ ব্যাপারে একমত, কিন্তু পশ্চিমাদের সভ্যতার ব্যাপারে দ্বিমত, বিশেষ করে তাদের সভ্যতার মাপকাঠি হলো সংঘাত ও শক্তির পূজা , যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে আগ্রাসী তৎপরতার। আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মূল ভিত্তি মিশে আছে গ্রীস ও রোমান সভ্যতার সাথে। এসব সভ্যতার চিন্তাধারায় ছিলঃ দাম্ভিকতা, শক্তির পূজা ও সংঘাতের অনিবার্যতা। এ সব চিন্তা ধারা থেকে পশ্চিমা আধুনিক সভ্যতা প্রভাবিত হয়েছে। যিশু খৃষ্টের শিক্ষা তাদের এ সব চিন্তা ধারার পরিবর্তন করতে পারেনি, যেসবের ফলে ফলে ইউরোপ ও সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের ভয়াবহ কর্মকান্ড ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলছে।

মাইকেলঃ আগামী আলোচনায় আবার দেখা হবে।

এ ধর্মের ভবিষ্যৎ



এ ধর্মের ভবিষ্যৎ

রাজীব দুই বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় থেকে -অগত্যা- কিছু দেরি করল। কম্পিউটারের পর্দায় তার চেহারা ভেসে উঠার সাথে সাথে মাইকেল বলে উঠলোঃ

স্বাগতম রাজীব, আমরা তোমার মাঝে সচারাচর সময়ানুবর্তিতা দেখে আসছি। আশা করছি, এ দেরি তোমার কোন বিপদের কারণে নয়তো।

রাজীবঃ দুঃখিত, কোন সমস্যা হয়নি। তবে একটি অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম, যা । তোমাদের সামনে তা উপস্থাপন করব বলে ইচ্ছা করেছিলাম।

মাইকেলঃ চমৎকার ! তাহলে আলোচনা হবে সারগর্ভ। তোমার অনুসন্ধান কি নিয়ে?

রাজিবঃ আসলে আমাদের আলোচনায় ইসলাম সম্পর্কে আলোচিত তথ্যাবলী আমাকে আকর্ষণ করেছে। তাই বিশ্বে এ ধর্মের বিস্তৃতি ও সংকোচনের গতিবিধি নিয়ে অনুসন্ধান করতে ইচ্ছা করেছি ।

মাইকেলঃ একই ব্যপার আমাকে ও উদ্বুদ্ধ করেছে অনুসন্ধান করতে। কিন্তু অন্যান্য দিক নিয়ে, তথা যে দিকগুলো আমাদের আলোচনায় আসে সেগুলো মূল তথ্য সম্ভার থেকে নিয়ে আরো গভীর ও বিসদ ভাবে অনুসন্ধান করতে। তবে আপনার অনুসন্ধানে কি পেলেন, জনাব রাশেদ? আপনি কি আমাদের সাথে আছেন?

রাশেদঃ হাঁ হাঁ আমি তোমাদের সাথে আছি।

রাজীবঃ আমি পেয়েছি, সব ধরনের তথ্য সূত্রই বিশ্বে ইসলাম বিস্তৃতি বৃদ্ধির দিকেই ইঙ্গিত করে। অনুসন্ধানে যানা যায়, বিশ্বে ৪২০০টি ধর্ম আছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রমান করে যে, বিশ্বে সব ধর্মের তুলনায় ইসলাম সবচেয়ে দ্রুত ছড়াচ্ছে। সব মহাদেশেই লক্ষণীয় দ্রুত ভাবে ইসলাম ছড়াচ্ছে। আমরা যদি মুসলিম বৃদ্ধির অনুপাতকে খৃষ্টান বৃদ্ধির সাথে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, জাতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে বিশ্বে মুসলিম বৃদ্ধির হার বছরে (৬.৪%) আর খৃষ্টান বৃদ্ধির হার (১%)।

আমার অনুসন্ধান ইউরোপের মাঝেই কেন্দ্রীভূত করেছি। অতঃপর দেখতে পেলাম, ইসলাম স্পেন, ফ্রান্স ও বৃটেনের দ্বিতীয় ধর্মে পরিনত হয়েছে।

জার্মানিতেও মুসলিমদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। দৈনিক 'দি ফিল্ট' এর প্রতিবেদন মোতাবেক জার্মানে ইসলামের প্রসার বর্ধনশীল।

ফরাসী স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় কতৃক একটি গবেষণা প্রমান করেছে যে, বছরে ৩৬০০ জনের বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ফ্রান্সে ২৩০০টি মসজিদ ও ৭ মিলিয়ন মুসলিম আছে। বরং মনে করা হচ্ছে যে, ২০২৫ সালে মুসলিমরা ফ্রান্সের এক চতুর্থাংশ নাগরিকে পরিনত হবে। আরো ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালে গোটা ইউরোপে ২০% নাগরিকে পরিণত হবে মুসলিমরা। অন্য একটি পরিসংখ্যান মতে ২০৪০ সালে ইউরোপে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ট হয়ে যাবে।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলে যে, দশ বছর পর হল্যান্ডের এক তৃতীয়াংশ নাগরীক মুসলিম হয়ে যাবে। একটি গবেষণা প্রমান করেছে যে, আশ্চর্যজনকভাবে সুইডিস জাতীর মাঝে ইসলাম ছড়াচ্ছে। সরকারী পরিসংখ্যান ইঙ্গিত করে যে মুসলিমদের সংখ্যা নিয়মিত বর্ধনশীল। বর্তমানে সুইডেনে মুসলিমদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারেরও বেশী।

আর মসজিদ নির্মানের ব্যাপকতা মুসলিম বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে, বিশেষত মুসলিম ধর্মপরায়নদের বৃদ্ধি। বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলে, ইউরোপে ২৫ হাযারেরও বেশী মসজিদ আছে। সাথে সাথে এসব মসজিদে রয়েছে মুসলিমদের ব্যাপক সমাগম।

এর বিপরীতে বিভিন্ন গবেষণা প্রমান করে, গীর্জায় আগমনকারিদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। 'ড্রাইসডন ব্যাংক' পরিচালিত একটি গবেষণা মনে করছে যে, আগামী কয়েক বছরে জার্মানে গীর্জার সংখ্যা কমে যাবে। শুধু "ক্রশী ঈসন"নগরেই ৩৫০ গির্জার মধ্যে ৯৬ গির্জাতেই ধর্মীয় এবাদত বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং গির্জার ভবনগুলো অন্য কাজে লাগানোর সম্ভাবন রয়েছে। এর কারণ হল গির্জায় আগমনকারির সংখ্যা কমে যাওয়া ও গীর্জা থেকে রাজস্ব আয় কমে যাওয়া।

এতে যা বুঝা গেল তা হল, খৃষ্টানদের গির্জায় আগমন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছে। ইউরোপের একটি গীর্জায় এমন দশা হয়েছে যে, তারা গির্জায় প্রত্যাগমন কমে যাওয়ায় সেথায় এবাদত করতে মানুষ জমা করার জন্য গাড়ী চালনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

মাইকেলঃ এতেই ইউরোপের কিছু কট্টরপন্থী ও ডানপন্থী দলের আক্রমনাত্বক আবস্থার কারণ বোঝা যায়, যারা ইসলামকে কোণঠাসা করে রাখে, ইসলামের মৌল বিষয়গুলো নিয়ে উপহাস করে এবং মুসলিম ও তাদের প্রতিকের উপর আক্রমণ করে। এমনকি তারা পুরো ইউরোপ থেকে মুসলিমদেরকে বেরিয়ে যেতে দাবী জানায়। কিন্তু ইসলামের এ বিস্তৃতির কারণ কি হতে পারে তোমার মতে? জনাব রাশেদ তুমি চুপ কেন? তুমি তো এমন না!

রাশেদঃ স্বভাবতই আমি তোমার কথা শুনে আনন্দিত। তাই চুপ করে আছি আরো শোনার জন্য। আমার মতে কিছু কারণ হল, ইসলামের স্বত্তাগত, আর কিছু হল, পাশ্চাত্য সমাজগত, আর কিছু বাস্তব অবস্থা কেন্দ্রিক। এসবের সমন্বয় ইসলাম প্রসারে প্রভাব ফেলেছে। তবে আমি বলতে চাই, ইসলামের জন্য তা আশ্চর্যের ব্যপার না; যা এমন এক একটি মজবুত আদি ধর্ম, সৃষ্টির শুরু থেকেই ইতিহাসের গভীরে বিস্তৃত হয়ে আছে যার শিকড়। আদম আঃ থেকে এ পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক বিস্তৃতি বন্ধ হয়নি।

মাইকেলঃ জনাব রাশেদ, কিন্তু আমরা তো জানি, ইসলাম এসেছে মাত্র চৌদ্দশ বছর আগে। এর আগে সেখানে ছিল আনেক আসমানী ধর্ম যেমন, খ্রীষ্ট ও ইহুদী ধর্ম। তুমি কি তা অস্বীকার করবে?

রাশেদঃ এখানে একটি কথা আছে, এ ব্যপারে যা সঠিকভাবে বলা উচিৎ। তা হল, আল্লাহর দীন একটাই। একাধিক নয়। কারণ, তা একটি উৎস থেকেই এসেছে। তিনি হলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি সৃষ্ট জগত সৃষ্টি করেছেন। একই দীন বিভিন্ন অবস্থা ও জাতির কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন সময় তার উপযুক্ত বিধান প্রণয়ন করেছে। অনুরুপভাবে ওহী নাজিলের সময় থেকে কালের দুরত্বের কারণে কখনো আসল দীন থেকে পদস্খলন ঘটে। তখন নতুন কোন রাসুল পাঠিয়ে দীনকে নবায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়, যিনি এ দীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে সমর্থন করবেন। এদিকেই ইংগিত করে রাসুল সঃ এর এ হাদিস," নবীগন বমাত্রিক ভাই এর মত, তাদের দীন এক তবে মা ভিন্ন ভিন্ন"। অর্থাৎ তাদের সময়কাল ও আনীত বিধি-বিধান ভিন্ন ভিন্ন। তবে মানবতা আমাদের নবীর যুগে পরিপক্কতায় পৌছায়। তাই এ রাসুলের রেসালাতে আছে এমন স্বত্তাগত উপকরণ সমূহ রয়েছে যা এই দীনকে রক্ষা করতে পারবে বিলোপ থেকে এবং প্রয়োজন হলে তাকে নবায়ন করে তার বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তাই এই দীন কখনো বিলোপ হবেনা, মানবতার শেষ পর্যন্ত এর ঐতিহাসিক বিস্তৃতি চলমান থাকবে। কারণ এটি সর্বশেষ দীন, যা মানুষের সৃষ্টিকর্তা মনোনীত করেছেন তাদের জন্য। সুতরাং স্বভাবতই যা তাদের উপযুক্ত ও স্বভাবসম্মত তাই তিনি তাদের জন্য মনোনীত করবেন। তাই সব কিছু স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করলে স্বভাবতই এর বিস্তৃতি ঘটবে।

রাজীবঃ এটা আমার জন্য এক নতুন উদ্দীপক তথ্য। জনাব রাশেদ, তাহলে এবার আপনি ইসলাম বিস্তৃতির যে কারণ আপনি উল্লেখ করছিলেন আমরা সেখানে ফিরে যাই।

রাশেদঃ হাঁ, ইসলাম যে স্বত্তাগত কারণে দ্রুত ছড়াচ্ছে তা হলো,

কাঠামোগত দিক থেকে এ দীন খুবই সাধারণ, তবে মর্মগত দিক দিয়ে অনেক গভীর, সহজবোধ্য, পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি, বিধিবিধান সহজ, বুঝতে বড় বুদ্ধি ও ধীশক্তির দরকার হয়না। এতে নেই কোন তেলেসমাতি, গোপনীয়তা, অস্পষ্টতা ও দূর্বোধ্যতা।

এটি মানবিক ধর্ম, মানব স্বভাবকেই সম্বোধন করে, তার পরিস্থিতি বিবেচনা করে, তার চাহিদা পূরণ করে, সমস্যা সমাধান করে, তার সব জিজ্ঞাসার জবাব দেয়। এ ধর্মের সকল বিষয়াদি বাস্তব জীবনের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল ও মানানসই। এমনিভাবে এ ধর্ম সব ধরণের সামাজিক অত্যাচারকে নিষেধ করে।মানুষের বর্ণ, ভাষা, জাতি ও সামাজিকভাবে শ্রেনীর ভিন্নতা সত্বেও তাদের মাঝে উৎসগত পূর্ন সাম্যতাকে জোরদার করে।

এটি একটি বাস্তব সম্মত ধর্ম যা মনুষ্যত্বের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেনা আবার তাতে নিজেকে মলিন, বিলীন ও অন্ধ করে দেয়না। এই বাস্তবতার দিক থেকেই এ ধর্ম দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়েছে, এ দুয়ের মাঝে কোন বিরোধ রাখেনি।

এটি এমন দ্বীন, যা মানব বুদ্ধিকে সম্মান করে, মানুষের চিন্তাকে মূল্যায়ন করে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া, সংলাপ ও উপকারী বিতর্কের পন্থা হিসাবে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমান ও যৌক্তিক পদ্ধতিকে শীর্ষে রেখেছে।

ইহা এমন দ্বীন যা বিজ্ঞান ও উন্নতির বিরোধিতা করেনা, বরং উৎসাহিত করে। আধুনিক বিজ্ঞানের সব প্রমাণিত তত্ত্ব চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে অবতীর্ন কোরআনের বর্ননার সাথে মিলে যাচ্ছে ।

ইহা এমন দ্বীন, যা বিবর্তনের সাথে খাপ খায়। স্থান - কালের বিবর্তনের মাধ্যমে জীবনে যেসব সামাজিক বিবর্তন ও নতুন নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, ইসলাম এসবের সাথে খাপ খাওয়ার সামর্থ প্রমান করেছে।

ইহা এমন দ্বীন, যা আসল মানবিক স্বাধীনতা দেয়। মানুষ নিজেকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি না দিলে যে স্বাধীনতা পূর্নভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়না । কারণ এর মাধ্যমে মানুষ আর কোন মানুষ বা অন্য কিছুর বান্দা বা দাস থাকেনা ।

ইহা এমন ধর্ম, যা সর্বকালে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি উম্মুক্ত।

মাইকেলঃ আমি তোমাকে পাশ্চাত্য সমাজে নিহীত কারণ গুলো বলবঃ

আমাদের পাশ্চাত্য সমাজ গত শতাব্দীর সুচনা ও এর আগ থকেই বিশেষ স্নায়ুবিক বিপর্যয়ে ভুগছে। এ বিপর্যয়ের সুচনা হয়েছে আমাদের পাশ্চাত্য সমাজে বিরাজমান নানা সংঘাত থেকে। বিশেষত গীর্জা ও বিজ্ঞান, পরস্পর বিরোধী অনেক দার্শনিক মত এবং সমাজের বিভিন্ন জাত ও শ্রেণীর মাঝে সংঘাত। এ থেকে দেখা দিয়েছে মূল্যবোধের দ্বন্ধ , হতবিহবলতা ও আত্মপরিচয়হীনতা।

অতঃপর আধ্যাত্মিক দৈন্যতা ও শুন্যতা ও অসারতা যা পশ্চিমাদেরকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যার ফলে মানবাত্মার শ্বাস রুদ্ধ অবস্থা। যেখানে মানবিক মূল্যবোধ ক্ষয়িত হচ্ছে। মানবিক বৈশিষ্ট্যাবলী অবনমিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে বস্তুর মর্যাদা ও মূল্যবোধ বাড়ছে, মানবিক সব মূল্যবোধকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ যেন যন্ত্র কিংবা যন্ত্রাংশ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, পশ্চিমাদের অনেকের মাঝে তাদের ধর্মের ব্যপারে সন্দেহ। তাদের আকিদার মাঝে নানা বিরোধ, দ্বন্দ্ব এবং ত্রূটি। যদিও তাদের অনেকে বাহ্যত ধর্মের প্রতি টান দেখায় এবং তাদের ধর্মের প্রতি অনুরাগের ভাব দেখায়। অন্যদিকে, গির্জা বৈরাগ্যের মাধ্যমে যে পবিত্রতার পথ ও পরিত্রানের যে চিত্র উপস্থাপন করে আমরা অনেকে দেখতে পাই যে তা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে মানব স্বভাবের সাথে প্রতারনামূলক ও সাংঘর্ষিক।

আর পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা যে ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক ব্যাবস্থার পচন ও সামাজিক অবক্ষয়ে এসে পৌঁছেছে তা তা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা।

রাশেদঃ আমরা যদি বাস্তবিক কারণ নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের উপর কলঙ্ক লেপন করা ও মুসলিমদের দমন করার অভিযান উল্টা প্রভাব ফেলে। এর ফলে এ ধর্মকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

একই ভাবে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত দায়ী ইলাল্লাহদের প্রচেষ্টা যেমন, মুসলিম আলেম ও অন্য ধর্মের পণ্ডিতদের মাঝে অনুষ্ঠিত সংলাপ পশ্চিমাদের সঠিক ইসলাম বুঝার সুযোগ বৃদ্ধি করে দেয়।

ইসলামী সংখ্যালঘুদের পাশ্চাত্যে থাকার প্রভাব ও আমরা অস্বীকার করতে পারবনা। যা পশ্চিমাদের জন্য কাছ থেকে মুসলিমদেরকে বুঝার সুযোগ করে দেয়। এতে করে বাস্তবে ইসলামের ধরন প্রকৃতি বুঝার এবং মুসলিমদের জীবন পদ্ধতি কাছ থেকে দেখার পথ তৈরী হয়ে আছে।

এসব কিছু আমার মাঝে একটি উজ্জল আশার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। তা হলো, আগামী যুগের ভবিষ্যৎ এ ধর্মেরই।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র



গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র

- আল কোরআন
- বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ
- ডঃ ইব্রাহীম খলীল

আমার বন্ধু কেন মুসলিম হল? কোরআনের চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে ভ্যাটিকানের মতামত

- ডঃ ইবরাহিম মুহাম্মদ ইবরাহিম

নিজস্ব পবিত্র গ্রন্থের আলোকে মানব রচিত ধর্মাবলী এবং এ ব্যাপারে কোরানের অবস্থান

- আবুল আলা মওদুদী

আধুনিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলাম

ইসলাম ও আধুনিক নগর সভ্যতা

আল হিজাব

বর্তমান যুগে শরিয়া আইনের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

ইসলামের নীতিমালা

আমরা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

ইসলামে জীবন পদ্ধতি

- আবু আব্দুল মালিক ওয়ালীদ বিন ফাহদ আল ওয়াদ'আন

যীশু খৃষ্টে বিশ্বাসীদের প্রতি পত্র

- আহমাদ দীদাত

দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম

খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের মাঝে সমীক্ষা

বর্ণবাদ সমস্যার সমাধানে ইসলাম

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রকৃত মতভেদ

ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মে আল্লাহ

বাইবেল এবং কোরান

তলোয়ারের অপবাদ

কেন মুহাম্মদ সঃ সর্বশ্রেষ্ঠ?

মুহাম্মাদ সঃ এর ব্যপারে বাইবেল কি বলে?

মুহাম্মাদ বিশ্বের সর্ব মহান

মুহাম্মদ সঃ ঈসা আঃ এর প্রকৃত উত্তরসূরি

ইসলামে ইবাদতের স্বরূপ

যীশুই কি আল্লাহ? বাইবেলের জবাব

- ডঃ আহমাদ আব্দুর রহীম আল সায়েহ

ইসলামী সভ্যতার দর্শন

- ডঃ ইসমাঈল রাজী আল ফারূকী, ডঃ লুস লামিয়া ফারুকি

ইসলামী সভ্যতার মানচিত্র

- ডঃ একরাম লামযী

খৃষ্ট ধর্মে তালাক (বাইবেলের দৃষ্টি কোন)

- এন্ড্রে নাইটন এবং অন্যরা - অনুবাদ: সামীরা আজমী আল যাইন

খৃষ্ট ধর্মে পৌত্তলিক নীতি সমূহ

- আনোয়ার মাহমুদ যানাতি

ইসলামের ব্যপার পাশ্চাত্যের মিথ্যা অপবাদ কোষ

- বার্নার্ড লুইস

ইস্তাম্বুল এবং ইসলামী খেলাফতের সভ্যতা

- জাদ করীম জাবা'ঈ

আধুনিক আরব চিন্তাধারার মধ্যে মানবাধিকার

- জামিল বিন সবীহ

পৃথিবীতে মানুষের খেলাফত অর্জন

- ডঃ গটফ্রাইড কঞ্জলনঃ মুখবন্ধ ও টীকা ডঃ মুহাম্মাদ ইমারা

ইউরোপে খ্রিস্টান ও সেকুলারিজমের গ্যাঁড়াকল – (জার্মান সনদ)

- ডঃ হুসাইন মূনিস

সভ্যতা প্রতিষ্ঠার নিয়ম ও উপকরণ নিয়ে গবেষণা

সংক্ষেপে মুসলিম উম্মার সংবিধান

- খালেদ আবুল ফুতূহ

ইসলাম ও উদারনীতি (liberalism) – আমেরিকার আসল রোখ ও বুদ্ধিবৃত্তিক মিলের সম্ভাবনা (প্রবন্ধ)

চ্যালেঞ্জ সঙ্কটের ব্যপারে কিছু পার্শ্ব কথা (প্রবন্ধ)

এই জন্যই আমেরিকাকে আমরা ঘৃণা করি! (প্রবন্ধ)

- ডঃ দাউদ দরবেশ হিলস

মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকারঃ ইসলামী শরিয়া ও আন্তর্জাতিক সনদের মাঝে পর্যালোচনা

- রোজিয়া জারুদীঃ

কবর খননকারীগন - যে সভ্যতা মানবতার কবর খুরে

- সাইগ্রেইড হঙ্ক- অনুবাদঃ ফারুক বাইদুন, কামাল দুসুকী

আরব সূর্য পশ্চিমের উপর আলো ছড়ায়ঃ ইউরোপে আরব সভ্যতার প্রভাব

- সামী আমেরী

কোরান কি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে?

- সাউদ বিন আব্দুল আজীজ বিন মুহাম্মদ আল আরীফীঃ

আকীদার মূল বিষয়গুলোর যৌক্তিক ও উদ্ধৃত প্রমান

- সাইয়েদ কুতুবঃ

ইসলাম ও সভ্যতার সমস্যাবলী

এই ধর্মের ভবিষ্যত

ইসলামী ধারণার বৈশিষ্ট্য এবং তার উপাদান

এই দ্বীন

- ডঃ আল সাইয়েদ মুহাম্মদ বাদাভী

নৈতিকতাঃ দর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের মাঝে

- ডঃ আদেল সাদেক

তালাকই সমাধান নয়

- ডঃ আদেল বিন আলী আল শাদী , ডঃ আব্দুল রাজ্জাক মাআশ

মানবতার জন্য মুহাম্মদ সঃ এর রেসালাতের প্রয়োজনীয়তা

- আব্বাস আক্কাদ

ইউরোপীয় সভ্যতায় আরবের প্রভাব

- আব্দুদ দায়েম কাহীলঃ

কোরআন সুন্নায় চিকিৎসা শাস্ত্রের চমৎকার মুজিযা

পবিত্র কুরআনের নম্বর (ডিজিটাল) অলৌকিকতার বিশ্বকোষ

- ডঃ আব্দুর রহমান হসান হাবাঙ্কা

তথ্য আহরণের নিয়ম এবং প্রমান উত্থাপন ও সংলাপের মূল নীতি

- আব্দুর রহমান আল জাযিরী

মিশনারিদের অপবাদের জবাবে অকাট্য প্রমাণাদি

- ডঃ আব্দুল আজীজ সকর

পশ্চিমা বাস্তবতায় ধর্ম ও রাষ্ট্রঃ জাতীয়তাবাদী রাষ্টে ধর্মের মর্যাদা ও ভূমিকা বিষয়ে গবেষণা

- ডঃ আব্দুল আজিজ বিন উছমান আল তাভীজারীঃ

ইসলামী শিক্ষার মধ্যে মানবাধিকার

- ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আল তুর্কীঃ

ইসলামে মানবাধিকার

- আব্দুল্লাহ নাসেহ উলওয়ানঃ

ইসলামে সভ্যতার নিদর্শন ও ইউরোপ রেনেসাঁয় এর প্রভাব

- ডঃ আব্দুল মুহসিন বিন যাইন আল মুতাইরিঃ

রাসুল সঃ এর নবুয়তের সত্যতার উপর স্পষ্ট প্রমাণাদি

- আলী ইজ্জত বিগুভিচঃ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জুড়ে ইসলাম

- ডঃ আলী মুহিউদ্দীন আল কারাদাগী

আমরা ও অন্যরা - ফিকহের মূল নীতি প্রতিষ্ঠা মূলক একটি গবেষণা

- আলী বিন নায়িফ আল শাহুদ

বিশদ ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা খন্ডন

- ডঃ ইমাতুদ্দীন খলীল

ইসলাম সম্পর্কে কে কি বলেন

- ডঃ ফাহদ বিন আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আল রুমী

আল কোরানের বৈশিষ্ট

- ডঃ মাজেন আল আরমুতী, নামীর আব্বাস মুজাফফর, কায়েদ হাশেম(সম্পাদনা)

ইসলাম পাশ্চাত্য ও মানবাধিকার

- মাইকেল হার্ট, অনুবাদঃ আনীস মানসূর

এক শত অমর মনীষীঃ শ্রেষ্ঠতম মুহাম্মাদ সঃ

- মুজাহিদ মাহমুদ আহমাদ নাসের

প্রমান উত্থাপনে কোরানের পদ্ধতি

- মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-হামদ

ইসলাম চির সৌভাগ্যের পথ

- মুহাম্মদ আবু যোহরা

ইসলামের ছায়াতলে মানব সমাজ

- মুহাম্মদ আবুল কাসেম হাজ্জ হামদ

অদৃষ্টের দ্বন্দ্ব ও মানুষ এবং দ্বিতীয় ইসলামিক বিশ্ব প্রকৃতি

- ডঃ মহাম্মদ বাশারী

ইসলামী শরীয়ায় ধর্মীয় স্বাধীনতাঃ মাত্রা ও মূলনীতি

- মহাম্মদ ত্বকী উদ্দীন হেলালী আল মাগরিবী

ঈসা আঃ বান্দা, উপাস্য ননঃ বাইবেল থেকে প্রমান

মুহম্মদ রশীদ আল আভীদ

তার শ্লীলতাহানি অবলোকন করছে তারা

- ডঃ মুহম্মদ যুহাইলী

মানবাধিকারঃ মাকাসেদে শরীয়ার অক্ষ

- ডঃ মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী

ইহুদী, খৃষ্ট ও ভারতীয় কিছু ধর্ম নিয়ে গবেষণা

- মুহাম্মদ বিন তাহের আল তানীর আল বৈরুতী

খৃষ্ট ধর্মে পৌত্তলিক বিশ্বাস

- মুহাম্মদ তাহের বিন আশূর

সংক্ষেপে ইসলামের সমাজনীতি

- ডঃ মহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সালেহ আল সাহীম

ইসলামঃ মৌলিক নিয়ম-নীতি

- ডঃ মুহাম্মদ ইমারা

ইসলাম ও মানবাধিকারঃ অধীকার নয় আবশ্যক

আল কোরআন ও বাইবেলে নবীগণঃ নিষ্পাপতা ও তাচ্ছিল্য

- মুহাম্মাদ আল-গাযালী

মানবাধিকার

- মুহাম্মদ কুতুব

ইসলামের ব্যপারে কিছু সংশয়

- মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী আল শারাভী

আল্লাহর অস্তিত্বের বস্তুগত প্রমান

- মুহাম্মদ ইয়াসীন

মুসলিম মনিষীগন কর্তক নাস্তিক ও প্রাচ্য সমালোচকদের সংশয় নিরসন

- ইউনেস্কোর সাথে যৌথ সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিনিময় কেন্দ্র

ইউরোপের উত্থানে আরব ও ইসলামের প্রভাব

- ডঃ মারওয়ান ইব্রাহিম আল কাইসী

ইসলামে মানবাধিকারসমগ্র

- নাসির বিন দাখিলুল্লাহ বিন ফালেহ আল সাঈদী

বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও আলঙ্কারিক মর্ম

- হারুন ইয়াহইয়া

উন্নতির ধোকা

সহজে ঈমান বুঝা

সব মুজিযার মুজিযা আল কোরআন

কোরআনী মুজিযা

- হ্যনজ হেইনর (Hans Heiner St. Hbdr)অনুবাদঃ আব্দুর রহমান বাদাভী

আরব সভ্যতার প্রান

- ডঃ হেবা রউজ ইজ্জত

মানবাধিকার স্বরূপের জটিলতা

- ওয়াহিদ উদ্দীন খান

কোরআনের চ্যালেঞ্জ

গুরুত্বপূর্ন বিষয়

- দঃ ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ হাসান যামযামি

কোরআন কারীমে মানবাধিকারঃ স্বরূপ ও এর প্রয়োগ

- ইয়ুসর মুহাম্মদ সাঈদ মুবাইয়াদ

ঐশ্বরিক ধর্ম এবং প্রাচীন ধর্মে পরকাল

- ডঃ ইয়াকুব বেন আব্দুল ওয়াহাব আল বাহসিনঃ

যুক্তিবিদ ও তত্ত্বীদদের নিকট প্রমান পেশ ও এর প্রাগতথ্য উপস্থাপনের নিয়মাবলী

সূচীপত্র

ভূমিকা	3
কফিহাউসের আড্ডা	8
একজন পুরুষের জন্য একজন স্ত্রী কি যথেষ্ট?	14
রক্তঝরা গোলাপ	20
নৈতিকতার পর্দা	26
নারী হল রানী	32
চিড়ধরা ভেঙে ফেলা	38
স্বাধীনতার পর নারী	44
সভ্যতার মুখোশধারী বৈষম্য	50
প্যারিসের কফিহাউসে ফ্রয়েডের সঙ্গে কিছুক্ষণ	56
দুটি পন্থার মাঝে মানবাত্মা	62
ঈমানের প্রয়োজনীয়তা	68
সত্যপথের আলো	74
তোমার ইলাহ বা স্রষ্টাকে জান!!	80
আসমানী আলো (মানুষের জন্য নবুয়্যতের প্রয়োজনীয়তা)	86
সত্য ধর্মের বৈশিষ্ট্যাবলী	92
মহামানবদেরবের সর্বশ্রেষ্ঠজন	98
শেষ কথা	104
নিরাপত্তা/ সুরক্ষা	110
আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ত	116
সভ্যতার বাস্তব প্রকৃতিসমূহ	122
মুসলমানদের সূর্য মানবতাকে উদ্ভাসিত করেছে	127
মুসলমানদের সূর্য মানবতাকে উদ্ভাসিত করেছে	128
মানুষ যখন শূদ্র (সমাজচ্যুত)	134
ইসলামে মানবাধিকার	140
অনুগ্রহপূর্বক একটু খেয়াল কর!!	146
আমাকে একটু বলতে সুযোগ দাও!!	152
কোরআনের চরিত্র	158
ইসলামি রাষ্ট্র... মানবতার জন্য অত্যাবশ্যকীয়	164
অমরত্বের যাত্রা	170
ইসলাম ও সন্ত্রাসঃ	176
এ ধর্মের ভবিষ্যৎ	182
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র	188
সূচীপত্র	197

শান্তির পথ

আমরা আপনাকে ফিরিয়ে আনব মূলের দিকে, জ্ঞানগর্ভ যুক্তির সাগরে আমরা ডুব দিব, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের গবেষণা হতে আমরা দিক নির্দেশনা নিব। আপনাকে নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন নেতা, জ্ঞানী ও বিখ্যাতজনদেরর অভিজ্ঞতা নিয়ে শান্তির পথ অনুসন্ধানে পাড়ি দিব। আমাদের সে ভ্রমণ হবে শান্তির পথ পানে,. চিন্তা-গবেষনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ভ্রমণ;মনের গভীর থেকে হবে যে ভ্রমণ। এমন ভ্রমণ, যাতে ইতিহাস ও অতীত পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যৎ আলোকিত হবে; এমন একটা মুহূর্তে যখন নানা মত ও আদর্শের মানুষ সবাই মনে করে যে, সে শান্তির সন্ধান পেয়েছে। শান্তির পথ চেনার জন্য আমরা সমাজ ও জাতির উচ্চাকাংখা ও ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে অন্তরের এলোমেলো ভাবনাকে একত্রিত করব। তাই আমাদের সাথেই থাকুন, দেখুন শান্তির পথ নির্বাচন করা, চেনা এবং তা মূল্যায়ন করার উপযোগীমাপকাঠিসমূহ । শান্তির পথ অনুসন্ধানে এ ভ্রমণ, ... সচ্চরিত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, ভালবাসা ও সম্মানবোধ ইত্যাদির পথে আমাদের এ ভ্রমণ.........

আপনি কি জানেন সে পথটা কি......? আপনি কি তা জানতে চান....?

উপন্যাস

শান্তির উপন্যাস

দিশেহারা নানা প্রশ্ন, জীবনের নানা ইচ্ছা-প্রবৃত্তির দর্শন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-ভোগবিলাস, সন্দেহ এবং আপত্তি, অসঙ্গতি ও বিলাপ ইত্যাদি জীবনের নানা দর্শন নিয়ে জর্জের ভ্রমণ। মনোমুগ্ধকারী লন্ডন, আশ্চর্যের দেশ ভারত, নীল ও পিরামিডের শহর কায়রো, সব ধর্মের পবিত্রতমস্থান জেরুসালেম এবং গীর্যার দেশ রোম প্রভৃতি স্থানে জীবনের দর্শন ও অস্তিত্বের অর্থ নিয়ে তার এসব ভ্রমণ। এতে রয়েছে বিভিন্ন ঘটনার চমৎকার বর্ণনা যাতে ধর্ম ও জীবনের দর্শনের নানা দিক মিশে আছে। আরো আছে কষ্টের সাথে সুখের মিশ্রণ, সন্দেহের সাথে বিশ্বাসের মিশ্রণ, দুঃখের সাথে আনন্দ, বিশ্বাসঘাতকতা সাথে আমানতদারিতা, আত্মিক সুখের সাথে দৈহিক সুখ, মুখের ভাষার সাথে অন্তরের ভাষার, এবং সত্য ও ন্যায়ের সাথে কুসংস্কার ও ভণ্ডামি ইত্যাদির মিশ্রণ। নানা ঘটনা, দর্শন, চিন্তাভাবনা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ধারাবাহিক জ্ঞান উপস্থাপনের মাধ্যমে জীবনের দর্শন ও অর্থ খুঁজতে এটি একটি অধ্যয়ন এবং ধর্ম ও জীবনের অস্তিত্বের দর্শন নিয়ে গবেষণা। । এ অধ্যয়ন ইতিহাসের পাতা ও বাস্তবতায় দৃষ্টিপাত করবে, দেখবে জীবনের উপর উভয়ের কি প্রভাব রয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে ঘুরে বেড়াবে.... দেখবে এতে কি জীবনের কোন অসঙ্গতি লুকায়িত আছে?! জর্জ কি এ সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে?! দেহের সাথে কি আত্মাও শান্তি লাভ করে ?এবং জর্জের জন্য কি শান্তির পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব...?!

বন্ধুত্বপূর্ণ সাইট